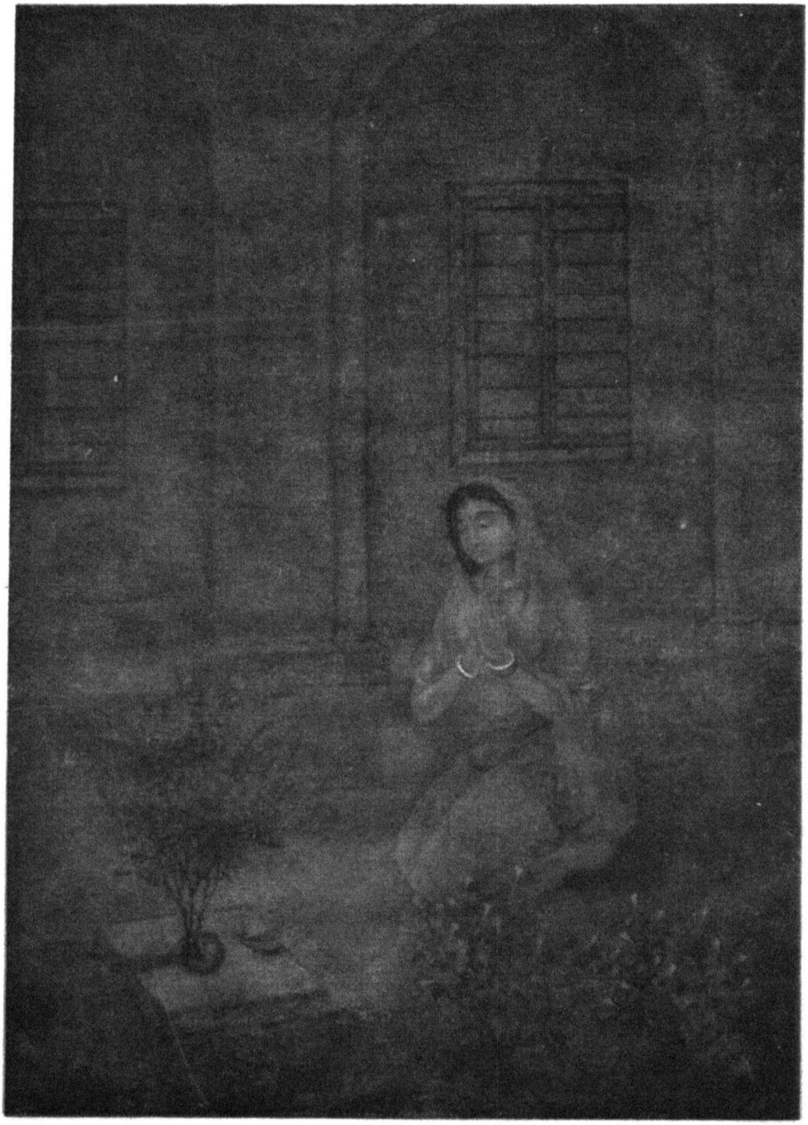
পন্থা—



তুলসীতলায়

শ্রীজ্যোতিষ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত।

পন্থা।

তৃতীয় ভাগ (নব পর্য্যায়) অষ্টাদশ বর্ষ।

১৩২১ বঙ্গাব্দ।

[stamp] 10. AUG.

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। বৈশাখ, ১৩২১। ১ম সংখ্যা।

(মোক্ষ)

শিবাষ্টকম্।

(Iconographical)

জবাকুসুম দল, রাতুল চরণতল
নখনিকর পূর্ণ শীতকর ভাতি।
অঙ্গুলি মনোহর সিত শতদল-দল
জ্যোতি বিভাসিত সুন্দর কাঁতি ॥১
পীন মীন-অঙ্গ, সুবলিত জঙ্ঘ
কর্কট প্রতিকৃতি বর্ত্তুল জানু।
সুমৃক্তিত নব রাম-রম্ভা সুবলিত
(শুরু উরু যুগল সহোদর যমল)
কৃত্তিবসন বদ্ধ সুমিলিত তনু ॥২॥
মৃগেন্দ্র কটিপর, গোমুখ তনুবর
বলী বেষ্টিত গভীর নাভি শম্বু।
বিলম্বিত শুণ্ড-যুগ করি-তুণ্ড
বিমুখীকৃত ধৃত কণ্ঠ কম্বু ॥৩॥
রজত-গৌরতনু জ্যোতি জিত কোটীভানু
নীলমণি-দ্যোতি জিত কবাট বক্ষ।
ফণিমণি মণ্ডিত ফণিরাজ গণ্ডিত
কঙ্কাল কপাল মালা শোভিত অক্ষ ॥৪॥

আজানুলম্বিত বালক দলীযুথ,
ভক্ত-কৃপা-কর বেদ-ভুজ সুন্দর।
যুগ-কমল-দ্বন্দ্ব, অঙ্গুল চম্পক ছন্দ
ধৃত অভয় বর-পরশু-মৃগবর ॥৫॥
ধুতুরাক্রান্ত গণ্ডল, স্মিত মুখমণ্ডল,
চ্যুত বীজদল জিত চিবুক চারু।
অধর বন্ধুক-জিত, নাশা শুক চঞ্চু জিত,
নিম্বপত্র দ্বন্দ্ব জিত যুগ্ম ভুরু ॥৬॥
অরুণ করুণাময়, কমল নয়নদ্বয়
আকর্ণ-লম্বিত আধ নিমীলিত।
শশি-খণ্ড-বিমণ্ডিত ভাল ধনুষাকৃত
তৃতীয় লোচন বিভূষিত ॥৭॥
মৃদুনাদ কল্লোলিত, সুর-তরঙ্গিণী স্নাত,
শিরধৃত পিঙ্গলজটাকলাপং।
নমামি মহেশং গবেশং গণেশং
মকাররূপ হর মহাপাপং ॥৮॥

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী।

———

আমাদের অষ্টাদশ বৎসর।

ওঁ অধ্যাত্মনে নমঃ হরিঃ ওঁ।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥

সেই দিব্য, অমূর্ত্ত, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে একরূপে অবস্থিত, অপ্রাণ, অমন, অজ, শুভ্র, অক্ষর হইতে পর পুরুষোত্তমের চরণকমলে আমাদের "কায়েনবাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা অনুস্মৃতি স্বভাবাৎ"—কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়গ্রাম, বুদ্ধি ও 'আমি' জ্ঞানদ্বারা,—অনুস্মৃতি ও স্বভাব কর্তৃক প্রণোদিত, গতবর্ষের কৃত কর্ম্ম-প্রসূন সকল ভক্তি-চন্দনচর্চ্চিত হইয়া অর্পিত হউক! আশা এই যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাদের কৃত কর্ম্মসকল পুরুষোত্তমের পরমপাবন শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে ও সেই পরমাকর্ষক পরমতত্ত্ব যেন আমাদের বুদ্ধির প্রেরণা করেন। ওঁ তন্নো ধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওঁ।

গত বৎসর আমরা সেই বেদনিহিত বেদবেদ্য পুরুষের প্রীতি কামনায় 'পন্থার' গতি স্বরূপ তাঁহাকে লক্ষ্য করত, চতুর্বর্গ জ্ঞানফল ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষের মধ্য দিয়া তাঁহারই মহিমা ব্যঞ্জন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া যাহা করিয়াছি তাহাতে এক শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসের আশাতীত ফল ফলিয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার নানাত্বের মধ্যে সনাতন-ধর্ম্ম সেই শ্রীপদ অঙ্কনের জন্যই প্রয়াস করিতেছে। ফলতঃ বেদ বল, অক্ষরতত্ত্ব বল, যজ্ঞ বল, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম ও গতিই বল, এ সকলে সর্ব্বভাবে সেই সর্ব্বাশ্রয় ঘন একরূপ বাসুদেবই একমাত্র লক্ষ্য ও বেদ্য। তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া দেখিলে, বেদও অবিদ্যা-প্রসূত হইয়া যায়। শুভ্র হইতেও শুভ্রতর তাঁহার জ্যোতি হৃদয়ে না ফুটিলে যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, সকলই কেবল ভেদাত্মক অহঙ্কার প্রসব করে। তাঁহার ইঙ্গিত দেখিতে না শিখিলে, জ্ঞান অজ্ঞানরূপে পরিণত হয়; তপস্যা বৃথা শ্রম ও 'খাটা খাটুনী' হইয়া যায়; ধর্ম্ম সমগ্র জগতের একত্ব সংস্থাপন না করিয়া ব্যক্তিগত অহঙ্কারের সোপানে পরিণত হয়; এবং পরাগতি নিত্যসিদ্ধ মোক্ষতত্ত্ব অবিদ্যা কল্পিত ক্রমমুক্তি ও ক্রমোন্নতি রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যে নিত্য-শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরম তত্ত্বে নিত্য অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, যে জ্যোতি মনের মননে, কামের

প্রেরণায়, ইন্দ্রিয়ের আভাসে, বুদ্ধির অধ্যবসায়ে, এক ও সমরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, যে ভগবানের প্রেমের আকর্ষণে অণুগুলি (attraction and repulsion) আকর্ষণ ও বর্জ্জনরূপ ভাষায় অস্ফুট বাক্যবিন্যাস করিবার প্রয়াস করিতেছে,—সেই স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্‌কে আমরা ভেদের মোহে ক্রিয়া, প্রযত্ন ও সাধনার শেষ ফল (last term) ভাবিয়া ফেলি। আমাদের এমন মোহ যে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে, তিনি যে সর্ব্বময়, তাঁহারই আভাস জ্ঞাপনার্থে সৃজিত পথপ্রান্তে প্রস্ফুটিত অবিদ্যা তরুর প্রসূন সকলে সমাকৃষ্ট হইয়া পরম গতির কথা ভুলিয়া যাই। কেহ যোগ, কেহ তপ, কেহ শাস্ত্রাভ্যাস, কেহবা সাধন ভজন, ইত্যাদি বাহিরের বস্তু ও ভাব গুলিকে হৃদয়ে তুলিয়া লই। 'পায়ের নূপুর পরিয়া গলায়, গলার হার মোরা পরে থাকি পায়।'

সেই পরম ভাব ভুলিয়া গিয়া "ভাব্ ভাব্ ডুমুরের ফুল" গুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করি, এবং প্রত্যেকটিকেই সেই অমেয়, পর, নিষ্কল তত্ত্বের পরিমাপক, প্রাপক ও একমাত্র ব্যঞ্জনা বলিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বগল বাজাইয়া সম্প্রদায় গঠনে প্রবৃত্ত হই। সেই অগতিরূপ গতি, সেই অবাধ্য, আনন্দের আনন্দ-স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনকে বিশিষ্ট ভোগাত্মক কর্ম্ম ও প্রযত্নের ফলরূপে কল্পনা করিয়া ক্রমোন্নতির মার্গে তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করি। যাঁহার আভাসে বিশ্ব প্রতিভাসিত, যাঁহা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্ব সকল উজ্জীবিত হইয়া সদাই যাঁহাকে পাইবার জন্য ছুটিতেছে, যিনি ইন্দ্রিয়ে, কামে, মনে ও বুদ্ধিতে নিত্য লীলা পরায়ণ, ভাই! তাঁহাকে পাইবার জন্য এত প্রয়াস,—এত কষ্ট কল্পনা কেন? যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নির্দ্দোষী ইন্দ্রিয়গণকে এত পীড়ন কেন? যাঁহার বীজ কাম,—কাম যাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য 'রূপ'সাগরে ডুবিয়া যাইতে সদাই চেষ্টিত, সেই শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য একদিকে কামের নিষ্পেষণ, ও অপরদিকে রূপভোগাকৃষ্ট হইয়া 'বেনামী ভাবে' কাম-সেবন কেন? কাম কি আর কামপতির পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত দেয় না? মন তাহার 'সর্ব্ব' সংগ্রাহক বা 'সঙ্কল্প' বৃত্তির মধ্য দিয়া, 'বিকল্প'বৃত্তির দ্বারা যে পরম বিশেষের ইঙ্গিত করে, তাহা না বুঝিয়া যেমন প্রিয় জনের মনুষ্যরূপ সামান্য ভাবের মধ্য দিয়া অভিনব উপায়ে এক বিশেষ পরিপূর্ণতার আভাস আছে বলিয়াই প্রিয়জনকে মনুষ্য বলিয়া জানিলেও তাহার ভিতরে কি এক বিশেষের ইঙ্গিত দেখিতে পাই,—এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া কেন বেচারী মনকে ও তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মকে জোর করিয়া নিরোধ করিবার চেষ্টা

করি? যে মনের সঙ্কল্পশক্তির সাহায্যে চন্দ্রকিরণচ্ছটার দ্বারা শ্রীভগবানের নখজ্যোতি কল্পনা করি ও যাহা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আধার তত্ত্বের সাহায্যে শ্রীপদের ইঙ্গিত পাই,যে মনস্তত্ত্ব এইরূপে'সর্ব্বভাব'সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে কি কৌশলে 'সর্ব্বের' অতীত ও অতিগ বিশেষের স্থাপনা দ্বারা বিরজার পরপারে স্থিত পরম বিশেষের ইঙ্গিত করে, তাহাকে অহঙ্কারের ও ভেদবুদ্ধির মন্দান্ধকারে শত্রুরূপে কল্পনা করিয়া এত মল্লযুদ্ধের প্রবৃত্তি কেন? যে বুদ্ধির সাহায্যে জগতের অনন্ত বিরুদ্ধ ভাবরাশিকে আধাররূপ একত্ব জ্ঞানে সমাহৃত করিয়া রাখি, যাহার সহায়ে আমার পুত্ররূপ আধারে পাপ ও পুণ্য এমন করিয়া মিশাইয়া দিই যে তদ্দ্বারা মূলভাব পুত্রত্বের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না,– পুত্রটি পরম ধার্ম্মিক বা পাপিষ্ঠ হইলেও 'আমার পুত্র' এই একত্ব বুদ্ধির অপলাপ হয় না, সেই বুদ্ধিতত্ত্ব বিভিন্ন বৃত্তি, নামরূপ প্রভৃতি বিভিন্নভাব গুলিকে কি আশ্চর্য্য কৌশলে এক অধিকরণ জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিয়া দিয়া বৃত্তি-খেলার অতীত এক স্থির সত্বার ইঙ্গিত করে, সেই বুদ্ধিতত্ত্ব কি আমাদের শত্রু?

আমাদিগের এই মোহের কারণ কি? যে পুরুষের অয়ন পুরুষোত্তম পুরুষকে প্রাপ্ত হইলে নাম রূপ ও হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, তাঁহারই দিকে চাহিয়া পথ চলিতে যাইয়া আমরা এই মোহে নিমজ্জিত হই কেন? দেশে 'ত' শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব হয় নাই; ব্রাহ্মণগণ ত' এখনও সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই; হিন্দু সন্তান ত' এখনও গুরু, জপ, তপ,সাধনা প্রভৃতি বর্জ্জন করেন নাই! তবে কি দোষে আমাদের সনাতন পন্থা হইতে এত অধঃপতন হইতেছে? ইহার একমাত্র উত্তর অদ্বৈত বুদ্ধির ও একত্ব জ্ঞানের অভাব, এবং ভেদ-বুদ্ধি অহঙ্কারের প্রভাব। অদ্বয় বুদ্ধি কথাটি শুনিয়া যেন ভক্তগণ চমকিয়া উঠেন না। যে 'অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব' মহাপ্রভু "ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন" নামে অভিহিত করিয়াছেন, যে অদ্বৈত জ্ঞানই শ্রীভগবানের রূপ, সেই জ্ঞানে কি ভক্তির অপলাপ হয়? অহঙ্কারে বদ্ধ জীব সর্ব্ব ব্যাপারেই আপনার বিশিষ্ট অহঙ্কারটীকে সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। আধুনিক ভক্তগণ ভুলিয়া যান যে অহঙ্কার তত্ত্বটি তাঁহাদের বিশিষ্ট অহং স্থাপনের জন্য নহে; উহা এই পরম বিশেষ অদ্বয় তত্ত্বকে দেখাইবার জন্যই রহিয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ভগবান্‌কে সুধু 'আমার' করিলেই হইবে না, তাঁহাতে 'আমি'টী পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যোগপরায়ণ যোগী তাঁহার স্থূল দেহটীকে 'আমার' না ভাবিয়া, সর্ব্বাত্মিক নিয়মের বশানুবর্ত্তী হইয়া, সাদরে দেহবুদ্ধি ভগবানের বৈশ্বানর তত্ত্বে আহুতি

প্রদান করিলে যেমন বাস্তবিক দেহটী ধ্বংস হয় না,—কেবল তাহাতে তাহার কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়া 'গতি ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী' ভগবান্‌কেই তাহার পতিত্বে বরণ করা হয় এবং যেমন সেই দেহের প্রত্যেক কার্য্যই পরম অদ্বৈত ভগবানের প্রকাশক হয়,—মহাপ্রভু যেমন সাধকরূপে আপনাকে শ্রীভগবানে সমর্পিত করিবা মাত্র তাঁহার তত্ত্বগুলির ভিতর দিয়া সেই কালশশীর প্রকাশ হইত,—সেইরূপ মিথ্যাভূত ভেদাত্মক'আমি' জ্ঞানটীকে শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে ভেদাত্মক 'আমি' জ্ঞানের তিরোভাব হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত 'আমি' জ্ঞানের অভাব হয় না। ভক্তি ভিন্ন ত্যাগ বা অর্পণ করা যায় না। সে ভক্তিতে আর ছোট 'আমি'টী রাখিবার চেষ্টা থাকে না। সত্য বটে এই প্রকৃত ভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে, জীব শ্রীমতীর ভাষায় বলে,—

ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে, কে আর আমার আছে।
রাধা ব'লে আর দাঁড়াইতে নাই জুড়াব কাহার কাছে ;—

সত্য বটে, সেই কোমল-শ্রদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হইলে, সে

করইতে কোরে ধনি মোড়সে অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনে জনু বাল ভুজঙ্গ ;—

সত্য বটে, ভগবানের চৈতন্যের স্রোতে পড়িলে তাহার ভয় হয়, বুঝি বা সাধের 'আমিটী' হারাইয়া যায় ও কত যুগের সংস্কারপুষ্ট ভেদাত্মক 'আমি' জ্ঞানটী ত্যাগ করিতে হইলে ভীতির আবেশে মধুরাদপি মধুর ভগবান্‌কে ভীষণং ভীষণানাং বলিয়া মনে হয়,—কিন্তু ঐ দুঃখ, ঐ ভয়, ভেদাত্মিকা গুণময়ী প্রকৃতির শেষ চেষ্টা মাত্র। উহা সংস্কার-জন্য। প্রায়ই এইরূপ সংস্কার-জন্য ভয় দেখা যায় : স্বেচ্ছায় ত্রিলোক বিচরণক্ষম সাধুও স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার সময়, মৃত্যুর সময়, কখনও কখনও একটু বিচলিত হয়েন। ভূতযোনি লইয়া খেলা করিতে সক্ষম ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে ভূতের ভয় পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবও এই চরম সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া সেই মিথ্যা ভীতি নাশের জন্য "নহি হম্ তুঁহু তুঁহু" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। সেইজন্য ভক্ত কবি বিদ্যাপতি বলেন,—

তিল আধ দুঃখ, জনম ভরি সুখ।
তব ধনি কাহে তুহুঁ মোড়সি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রসসাগর মুগধিনী নারী॥

এইরূপে যখন ছোট 'আমি'টী ছাড়িয়া দিবে, তখনি দেখিবে যে তোমার ভিতর

দিয়া 'জ্যোতিষামপি তদ্‌জ্যোতি' চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন এক মহান্‌ 'আমির' আবির্ভাব হইতেছে। তখন দেখিবে,—

ফুটে উঠে রূপ গগনে ভূতলে, আনন্দ স্বরূপ ফুটে জলে স্থলে।

তখন দেখিবে সমস্ত জগদ্বস্তু,—

স্বরূপ পরশি, ত্যজি নামরূপ 'কাল'রূপে যায় মিশে।
বস্তু, ক্রিয়া, ভাব নির্ব্বিশেষে তাঁর বিভব সদা প্রকাশে।

তখন বুঝিতে পারিবে—'চিরদিনে বিহি আজি পূরল আশ,
হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ।'

ইহাই ভাগবতের দ্রব্যাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও ভাবাদ্বৈত সাধনা। এ সম্বন্ধে গত বৎসরে আমরা কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই তিনটীই 'পন্থা'র একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র। 'পন্থা' কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের পত্র নহে। উহা সনাতন ধর্ম্মের সনাতন স্তরগুলি দেখাইবার জন্য প্রয়াস করিতেছে। বাস্তবিক যাঁহাকে দেখাইবার জন্য আচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, মহাপ্রভুর ভক্তিমার্গও তাঁহারই জন্য; কেবলমাত্র কথার প্রভেদ ইহাই আমাদের বিশ্বাস। সেই মহান্‌ ঘন একের প্রকাশরূপ বিশ্বের মধ্যে সর্ব্ববস্তু সর্ব্বদর্শন ও সর্ব্বপ্রকার পন্থাই সেই একের আত্মস্ফূরণ বা আত্ম-প্রকাশের কৌশলমাত্র। সেই জন্য 'পন্থা' ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্য দিয়া সেই একেকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিবে। সেই সনাতন তত্ত্বই সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র বেদ্য, গতি, ও আশ্রয়। তিনিই নরের অয়ন—নারায়ণ। তিনিই নররূপে সামান্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, ও বিশেষভাবে গুরু-কল্পতরুর মূল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে স্বকীয় শাস্ত্রযোনিত্ব ভাব সংরক্ষণ করেন। তিনিই বিদ্যা, ভারতী বা সরস্বতী-রূপে বেদ প্রসব করত ত্রয়ীরূপে বিবিধ ভেদের মোহ নাশ করেন ও অনির্ব্বচনীয় কৌশলে ভেদের মধ্যে অভেদের ইঙ্গিত করেন। তাই এস ভাই! জ্ঞানী কর্ম্মী ও প্রেমিকগণ, পন্থার লেখক ও পাঠকগণ, অদৃশ্যরূপে অধিষ্ঠিত ও প্রেরয়িতা ঋষিগণ বিবিধ শাস্ত্রের মধ্য দিয়া যাঁহাকে উপদেশ করিবার জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ও জীবহৃদয়ে গুরুশক্তিরূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, সেই দ্রষ্টাগণের উপদিষ্ট সনাতন মার্গে চলিবার জন্য প্রস্তুত হই, ও একবার প্রাণ ভরিয়া বলি,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

কিন্তু দেখিও সেই সমগ্র 'নরের অয়নকে' যেন তোমার রুচি ও সংস্কারচষ্ট

পার্থক্যের সাম্প্রদায়িক দেবতা করিয়া তুলিও না। তিনি যে ভাই সকলেরই গতি, তাঁহাকে বাদ দিয়া ত' কেহই থাকিতে পারে না। দেখিও সেই পরম কারুণিক ভগবানের, প্রকাশস্বরূপ, ব্যাসদেব প্রমুখ ঋষিদিগকে যেন সম্প্রদায়-স্থাপয়িতা গুরু বলিয়া না ভাবি। কারণ তাঁহারা ত'

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং :—

তাঁহাদিগকে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভক্তিভরে প্রণাম করি। দেখিও ভাই যেন শুষ্ক মস্তিষ্কালোচনার কচ্‌কচিতে ভারতী দেবীর বিদ্যাভাববিশিষ্ট মতের পরিপোষণের জন্য প্রয়োগ করিও না; সেই তৃষ্ণারূপিণী আনন্দরূপিণী মহামায়াকে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ও আনন্দের তৃষ্ণায় হারাইয়া ফেলিও না। সেইজন্য আমরা দ্বিতীয় স্তরে সেই সর্ব্বপ্রকাশিকা কৃষ্ণপ্রদায়িনী শিবা কাত্যায়নীদেবীর সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যাভাব দেখাইবার চেষ্টা করিব। সত্য বটে আমাদের বিদ্যা নাই, আমরা অখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারি নাই, পাণ্ডিত্য নাই; কিন্তু তাহাতেই বা গতি কি? যদি আমরা প্রত্যেক বৃত্তির মধ্য দিয়া কেবল শ্রীভগবান্‌কেই দেখিতে চাই, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব যিনি মুগ্ধ দম্পতির মধ্য দিয়া, ভেদাত্মক লৌকিক প্রণয়ের ভিতর দিয়া আপনার প্রেমময় ভাব সদাই প্রকাশ করিতেছেন, যিনি জীবহৃদয়ে অহং সংরক্ষণের প্রবৃত্তিরূপে আপনারই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন, তিনি ত' জগৎ ছাড়া কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ নহেন; তাঁহার ত' ভেদভাব নাই, তাঁহার ত' মোহ নাই, তাঁহার ত' আবরণ নাই, তিনি যে বড় সুলভ, তিনি যে নিত্য সিদ্ধ ও স্ব-প্রকাশ, তাঁহার কৃপায় বিশ্ব সদা উজ্জীবিত রহিয়াছে। তিনিই আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা; তিনিই আমাদের বিদ্যা, তপস্যা ও গতি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

বিপ্রলব্ধা।

(গীত গোবিন্দ)

১

উয়ল চিত-হর, চাঁদ গগন পর,
বিহিত সময় চলি যাতি।
সুখয়িতে মরমে, কানন পথ মে,
জীবন-কান্ত ন আতি॥

২

বিফল ভেল মঝু, নিরমল যো কছু,
এ নব যৌবন-কাঁতি॥
বঞ্চল অব যঁহু, শরণ যাব কঁহু?
পহু বিনু ফাটত ছাতি॥

৩

যঁহু সুখ-মেলন, কাময়ি কানন,
আওলু যামিনী মাহ।
মদনক শায়ক, হানল হিয় পর,
নিরদয় সো মঝু নাহ॥

৪

চেতন বিগলিত, বিকল কলেবর,
লাগব অব কতি কাজে?
বিরহ অনল হাম, সহব কোন কাম,
বিধুরে মরণহি সাজে॥

অহহ! সুভাগিনী, আজু কোই কামিনী
ভুঞ্জত মঝু পিয়-সঙ্গ?
ইহ মধু যামিনী, বিফল করল চিত
ডারয়ি গরল-তরঙ্গ॥

৬

নিষ্ফল ধারণ, কঙ্কন-ভূষণ,
দূর রহল যব কান।
হরি বিরহানল, তাপয়ি সো সব,
অব মঝু দহই পরাণ॥

৭

মণি-ভূষণ কিয়ে? কুসুম-হার হিয়ে,
বিষম-মদন-খর-বাণে।
কোমল ফুল সম, খেদই তনু মম,
বিরহক বেদন দানে॥

৮

বেতস কণ্টক, পূরিত বনপথি
যছু লাগি ধরলুঁ পরাণ।
—ভনই ভুজঙ্গম—হরি! হরি সো ধন
অব মুঝে ভুজগ সমান॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

উয়ল—উদিল,
সুখয়িতে—সুখ দিতে,
আতি—আসিতেছেন,
ভেল—হইল
যোকছু—যেকিছু
কাঁতি—কান্তি
বঞ্চল—বঞ্চনা করিল,
কঁহু—কাহার,
পহু—প্রভু,
কাময়ি—কামনা করিয়া,
মাহ—মধ্যে
নাহ—নাথ
কতি—কোন্,
করল—করিল,
ডারয়ি—ঢালিয়া,
তাপয়ি—তপ্ত করিয়া
সো সব—সেই সকল অলঙ্কারকে
মঝু—আমার,
দহই—দগ্ধ করিতেছে,
খেদই—খিন্ন করিতেছে,
যছু—যাহার,
ভনই—ভনিতেছে,
মুঝে—আমার নিকট,
অব—এখন।

ভাগবতের উপদেশ।

(গত বৎসর ফাল্গুন সংখ্যার পর।)

আমরা গতবারে ভগবৎ সাধন-পথের দুইটী স্তর দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথমটীতে আমিটীর মধ্যে 'স্ব' বা 'পর' ভগবৎ সত্বার দর্শন হওয়া আবশ্যক। তারপর দ্বিতীয় স্তরে সেই মহান্ সত্বায় অহংটিকে সম্পূর্ণ নিবেদন করিতে হয়। ইহাই নিমিরাজার প্রশ্নে শ্রীহরি ঋষির উপদেশ ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ভাগবৎ ১১।২।৪৫

প্রথমটীকে লক্ষ্য করিয়া Light on the Path নামক অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলেন "Seek the way by retreating within ; for within you is the Light of the world, the only light that can be shed on the Path."

ভাবিয়া দেখহ এ তিন ভুবনে কে আর 'আমি'র আছে।
বাহ্য ভাবে নাই সমাপ্তি তাহার, কেন ছুট তা'র পাছে ?
তোমাতে মিশিয়া অখিল জগত, দেখ, সদা হয় স্থির।
'আমি'তে মিশিছে নাম রূপ ত্যজি, সলিলে যেমত নীর।
তোমাকে লইয়া শকতিনিচয় অশেষ খেলিছে কত।
অতল 'আমিতে' মিশিছে দেখহ সকল সাধন পথ।
সুখ দুঃখ আর পাপ পুণ্য আদি 'আমি'কে লইয়া সব।
জগতের যত কোলাহল সব 'আমি'তে হয় নীরব।

এইরূপে যখন 'আমি'টীকে অদ্বিতীয় পরাগতি বলিয়া চিনিতে পারা যায়, যখন দেখা যায় যে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য, ইহারা সেই 'আমি'রূপ অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র,—তাহাতেই উঠিয়া তাহাতেই নিঃশেষে মিশিয়া যায়, তখনই জীব অভয়ের বাণী শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠে,—

খুঁজিয়া খুঁজিয়া পথ পাওয়া গেছে, ভয় কি আমার আর।
'আমি'র ভিতরে পেয়েছি দেখিতে করুণ পদাঙ্ক তাঁ'র।

এই অবস্থাতেই খ্রীষ্টীয় সাধক আনন্দে বলিয়া উঠেন,—I am redeemed. ইহারই আকর্ষণে বৈষ্ণব বলিয়া উঠেন "গৌর হরি নাম এনেছে, ভয় ঘুচে গেছে।" রামপ্রসাদ ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া গাহিলেন,—

"ছুঁওনারে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যদি বল ওরে শমন আমার জাত গেল কিসে,
'আমি' ছিলাম গৃহবাসী, কেলে 'সর্ব্ব'নাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।"

তখন ত' আর 'সর্ব্বের' মোহ নাই; তখন 'সর্ব্ব ঘন হইয়া আমিতেই মিশিয়া যাইতেছে। ইহাই পূর্ব্বরাগ বা ভগবানের অনুগ্রহাবস্থা; তিনি অণুরূপে 'আমি'কে গ্রহণ করেন বলিয়া সেই অনুগ্রহে 'সর্ব্বে'র নাশ হয়।

যস্যানুগ্রহমিচ্ছামি তস্য 'সর্ব্বং' হরাম্যহম্।

ইহাই ভাগবতের "দৃষ্টেবাত্মনীশ্বরে"। ইহাই—প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্ব সংস্থাপন নিবন্ধন 'সর্ব্ব'ভাব পরিত্যাগরূপ যোগের অবস্থা—

একত্বং প্রাণমনসোরিন্দ্রিয়াণাং তথৈব চ।
'সর্ব্ব'ভাব পরিত্যাগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥ মৈত্রায়ণ শ্রুতি।

সর্ব্বাত্মিকা মহাবিদ্যা কাত্যায়নী দেবীর প্রসাদ ব্যতীত এই স্তর সিদ্ধ হয় না; ইহাই বিদ্যাতত্ত্ব।

তারপর 'আমির' ভিতর পরাগতি দেখিতে পাইয়া সাধক, যখন সেই গতিটীকে শ্রীভগবানেই পরিসমাপ্ত দেখিতে পান, তখন আত্মতৃপ্ত 'সর্ব্ব'ভাব হইতে বিচ্যুত ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে পরপুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাহাতে 'আমি'টিকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। Light on the Path এ সম্বন্ধে বলেন, "Seek the way by boldly stepping forth beyond", আমির অতিগ পর শ্রীভগবানে এইবার অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিতে হইবে; ইহাই বৈষ্ণবগণের রাধা-ভাবের সাধনা। আর 'আমি' নাই, কেবল তিনিই আছেন। সেই শ্রীরূপসাগরে এইবার আত্মতত্ত্ব ও আত্মরূপ মিশিয়া যাইবে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন,—

* * * নমুক্তির্ন মেয়ম।
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্॥

বিশিষ্ট 'আমি' নাই বলিয়া, আর 'আমি মুক্ত' বা 'আমি বদ্ধ' জ্ঞানটীও নাই, আছে কেবল সেই চিরসুন্দর মদনমোহন। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবৎ বলেন,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরেঃ।

বিশেষ আমি জ্ঞানে পরিপুষ্ট মুনিগণ ক্ষুদ্র 'আমি'-বন্ধন মুক্ত হইয়া উরুক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; গুণময় হরির গুণই এই প্রকার। সমুদ্রাভিসারিকা পয়ঃপ্রবাহিনী যখন তাহার পরম বিশ্রাম ভবনে উপনীত হয়েন, তখন আর তাহার কুল, শীল, মান কোথায় থাকে? তাহার কুলের বন্ধন মুক্ত হইয়া পড়ে, সাধন ভজনাদি শীলতা লুপ্ত হইয়া যায়, ও ক্ষুদ্র 'আমির' মাপ কাঁটি বা মান ভাসিয়া যায়।

কথাটী আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক। সনাতন ধর্ম্মের উপদেশগুলি তিনটী স্তরে (Stratum) পর্য্যবসিত। এই তিনটীর নাম যথাক্রমে বিদ্যাতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব। ইহাই Light on the Path গ্রন্থের "Seek out the way" অর্থাৎ বাহিরে 'জগৎ' ভাবের মধ্য দিয়া পথ অন্বেষণ কর, (২) "Seek the way by retreating "within" ভিতরে 'অহং তত্ত্বের' মধ্যে পথ অন্বেষণ কর; তৃতীয়টী "Seek the way beyond" অর্থাৎ 'পর' ও অদ্বিতীয় ভাবের সাহায্যে 'অহং' ও 'জগৎ' ছাড়িয়া দিয়া পথ অন্বেষণ কর। এই তিনটী স্তর পরে পরে সাধিত হইবে। তন্ত্রেও এই তিন মহাভাবকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাতত্ত্বায়, আত্মতত্ত্বায় ও শিবতত্ত্বায় নমঃ, এই সঙ্কেতে উক্ত তিনটী স্তরের উপদেশ আছে। বেদান্তে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যে বিদ্যাতত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে। তারপর "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যে অহং তত্ত্বের সিদ্ধি। "সোঽহং" এই বাক্যে সুসিদ্ধ হইয়া 'অহং' টীকে সেই অখণ্ড 'পর' 'স'এ মিশাইয়া দিতে হইবে।

আমরা এক্ষণে সামান্যভাবে এই তিনটী স্তরের আলোচনা করিব। বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে আচার্য্য বলেন,—"বিদ্যা—সর্ব্বাত্মবিষয়া ... . যঃ সর্ব্বাত্মভাবঃ সোঽস্যাত্মনঃ পরমোঃ লোকঃ পরমো আত্মভাবঃ স্বাভাবিকঃ।" "... ... . বিদ্যায়াঞ্চ কাষ্ঠাং গতায়াং সর্ব্বাত্মভাবঃ মোক্ষঃ।" অর্থাৎ 'সর্ব্বের' আত্মভাবই বিদ্যা; উহাই আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বা প্রকাশ ভাব; উহা স্বাভাবিক। এই বিদ্যাভাব অবিদ্যাভাবজনিত মলিনতা হইতে পরিশুদ্ধ হইয়া পরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে মোক্ষে পর্য্যবসিত হয়। আচার্য্যের উক্তির মধ্যে তিনটী স্তর দেখা যায়। প্রথমটী ঘন 'সর্ব্ব' বুদ্ধি; এই বুদ্ধি প্রাকৃতিক মানবের জগৎ বুদ্ধি নহে। বৈজ্ঞানিক সমষ্ট্যাত্মিকা বুদ্ধি কতকটা এই ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে। যেমন এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জানিতে পারিলে, সেই

শক্তির অনন্ত প্রকাশকে আর জানিতে হয় না; এবং অপর ভাবে বিশিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রকাশগুলি ঐ এক ভাবে নিঃশেষে মিশাইয়া যায়; তদ্রূপ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অনন্তরূপে ব্যবস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড যখন এক আত্মরূপে পর্য্যবসিত হয়, তখনই বিদ্যাভাব সুসিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি (Phenomena) বিভিন্ন মূল তত্ত্বে (Principle) এক করিতে প্রয়াস করেন। বৈদ্যুতিক সমস্ত খেলা বিদ্যুৎ তত্ত্বে, (Electricity), উষ্ণতার সমস্ত প্রকাশ উষ্ণতা (Heat) তত্ত্বে একত্র সমাধান করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তৃপ্ত। এইরূপ অসামান্য ধৈর্য্য ও অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ বাহ্যজগতের ক্রিয়া ও শক্তি নিচয়কে এক প্রকৃতি ও শক্তিতে (matter and motion) মিশাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সার্ব্বজনীন বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বাত্মক নহে! উহাতে মানবের ভিতর দিয়া প্রকাশিত জীব বা 'অহং' তত্ত্বের কোন অবগতি হয় না। মানবের 'আমির' সহিত ঐ তত্ত্ব ও তাহাদের অনন্ত প্রকাশের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; সেই জন্য উহা অনার্য্য ও অবিদ্যাপ্রদ। আকাশের নক্ষত্র তারকা, পৃথিবীর অণু পরমাণু ও বিবিধ শক্তি নিচয়ের সাহায্যে আমার সার্ব্বজনীন (Universal) জ্ঞান হইল বটে কিন্তু তাহাতে কি আমার জীবন মধুরতর ও মহত্তর হইল? ঐ জ্ঞানের সাহায্যে আমার সুখ-দুখ, পাপ-পুণ্য, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নানা ভাবের কি পরিপুষ্টি ও ক্রমোন্নতি সাধিত হইল? আমি পুত্রশোকে কাতর; আমার পক্ষে, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, বা সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেণ এই উভয় ও বিরুদ্ধ মতগুলির পরিজ্ঞান হইলে কি উপকার সাধিত হইতে পারে? Radium এর আশ্চর্য্য শক্তি বুঝিতে পারিলে কি আমার পুত্রশোক উপশম হয়? পাশ্চাত্য প্রথা 'অহং' তত্ত্ব হইতে বিশ্লিষ্ট ভাবে সার্ব্বজনীন তথ্য নির্ণয় করিয়াও মানবের প্রকৃত হিতসাধনে অক্ষম। তবে ও ভাব বৃথা নহে; উহার দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমানী দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ মানবের দেহাত্মবুদ্ধির উপর বিষম আঘাত লাগে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা প্রায়ই জাগতিক ব্যাপারগুলিকে লইয়া আমাদের ক্ষুদ্র সাময়িক 'আমি' ও 'আমার' ভাব সিদ্ধ করিবার জন্য মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তোমার ঘরে আগুন লাগিয়া তোমার সর্ব্বনাশ হইল; 'আমি' ভাবিলাম বেশ হইল, আমার তামাক খাইবার কয়লা আর কিনিতে হইল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলনে এই ক্ষুদ্র দেহাত্ম-বুদ্ধির প্রভাব কমিয়া যায়, ও জীব

আপনাকে অন্য জীবের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া ভাবিতে শিখে। কিন্তু উক্ত জ্ঞানের দ্বারা 'আমিকে' পাওয়া যায় না। যখন সার্বজনীন জ্ঞান আত্মভাবে সম্পন্ন হয়, যখন বাহিরের নৈসর্গিক নিয়ম, শৃঙ্খলা, প্রভৃতি দ্বারা মানব ভিতরের 'আমিকে' চিনিতে পারে, এবং 'আমি'র ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিতে পায়, যখন বাহিরের সর্ব্ব ব্যাপারই আত্মার স্বরূপ দেখাইতে সক্ষম হয়, তখনই ঐ জ্ঞান সর্ব্বাত্মিকা ভাব প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাত্মিক অর্থাৎ "সর্ব্ব যে কেবল আত্মার জন্য ও তাহাতেই পরিসমাপ্ত," এই জ্ঞানই "বিদ্যা"। যে জ্ঞানের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, যৎ সাহায্যে আমরা 'আমি'কে চিনিতে পারি না, তাহা অনার্য্য ও ও 'অবিদ্যা' নামধেয়। অবশ্য সাধনা ও ক্রমোন্নতির অবস্থানুসারে প্রত্যেক মানব 'আমি' শব্দটাকে বিভিন্ন ভাবে বুঝিতেছে; কিন্তু যে ভাবেই বুঝুকনা কেন, বাহিরের সর্ব্বটাকে 'আমি'র সহিত না মিশাইতে পারিলে বিদ্যা হয় না। Occult World গ্রন্থে জনৈক মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়াছেন —Now *for us* poor unknown philanthropists, *no fact of either of these sciences is interesting except in the degree of its potentiality of moral* results and in ratio of its usefulness to mankind * * * * * * May I ask then . .. what have the laws of Faraday, Tyndall or others to do with philanthropy in this abstract relations with humanity, viewed as an intelligent whole? *What care they for* man as an isolated atom of this great and harmonious whole, even though they may some times be of a practical use to him. অর্থাৎ এক কথায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আত্মরূপ পরাগতি নাই বলিয়া উহাতে বুধগণ রমণ করেন না। প্রাচ্যদিগের জ্যোতিষ, বিজ্ঞান প্রভৃতি অপরাবিদ্যার যে সমস্ত বিভাগ আছে, তাহা সকলেই ব্রহ্ম বা আত্মপর। আর্য্য ঋষি প্রণীত যে কোন অপরাবিদ্যার গ্রন্থ পড়িয়া দেখুন, দেখিবেন সেই বাহ্য ভাষার ভিতর দিয়া ঋষিগণ ব্রহ্ম, আত্মা বা ভগবান্‌কে ফুটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্য ঋষি পাশ্চাত্য শরীর-তত্ত্ববিদের ন্যায় জিহ্বা, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিশেষ গঠন ও ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা প্রত্যেক ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অভ্যন্তরে অবিভূক বা বিশিষ্ট ভূত সকলের আধারস্বরূপ ভগবচ্ছক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে চাহেন। ইন্দ্রিয়গণের খেলায় তাঁহারা মুগ্ধ না হইয়া, তাহার ভিতর দিয়া

প্রকাশিত অধিদৈব তত্ত্বের ব্যঞ্জনা দেখেন। এইরূপ সকল ভাবেই শ্রীভগবান্ তাঁহাদের বেদ্য ও গম্য। রস (taste) সকলের বিভিন্নতা দেখিয়া তাঁহারা কেবল জিহ্বারূপ ইন্দ্রিয় সিদ্ধি করিয়া নিরস্ত হয়েন না। জিহ্বা ও রস সকলের মধ্যে তাঁহারা পরিসমাপ্তি বা অয়ন রূপ ভাব দেখিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য ঋষি ইন্দ্রিয়গণ সম্বন্ধে বলিতে গেলেও, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা 'সর্ব্ব' ভাবে ;—* * * "সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈবায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে এবায়নমেবং, সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)।" পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মৃত মনীষী Myers সাহেবের পূর্ব্বে কেহই ইন্দ্রিয় ব্যাপারের মধ্যে প্রকাশিত ও উপলক্ষিত জীবকেও দেখিতে চেষ্টা করেন নাই ; আত্মা ত' দূরের কথা। সর্ব্বভাবকে আত্মার সহিত মিলিত করিতে না পারিলে সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা হয় না। কি করিয়া আত্মার সহিত মিশাইতে হয় এবং আত্মার অর্থ কি, এই দুইটী বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন স্তরের মানবের জন্য বিভিন্ন দর্শনের অবতরণা হইয়াছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

এইবার আত্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক এক্ষণে 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'পুরুষ'। পুরীতে বা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে শায়িত 'অহং' প্রত্যয়রূপী ভাবময় পদার্থকে আত্মা বলে। ইহাই আমাদের প্রথম স্তরের সংজ্ঞা বা definition। 'অৎ' ধাতুর উত্তর 'মণিন্' প্রত্যয়ে আত্মা পদ সিদ্ধ হয়. "আত্মাততে ব্যাপ্তের্ব্বাপি ব্যাপ্ত ইব স্যাৎ যাবদ্ব্যাপ্তিভূত ইতি নিরুক্ত।" সুতরাং ব্যাপ্তিই আত্মার প্রধান লক্ষণ। যাহা 'সর্ব্ব'কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, যাহাতে 'সর্ব্ব' ভাব জলে সৈন্ধবের ন্যায় লীন হইয়া যায়, যাহা 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত 'সর্ব্ব' ভাবকে ব্যক্ত করিয়া 'ম' ভাবে ব্যক্ত খেলার অতিগ ভাবে থাকে, যাহাতে এই 'সর্ব্ব' ভাব নিঃশেষে মিশিয়া যায়, তাহাকে আত্মা বলে। 'আমি রাম' এই বুদ্ধিতে সমস্ত দৈহিক মানসিক খেলার অবসান হয়। রাম দরিদ্র ; ধন রূপ ভাব তাহার বাহিরে রহিয়া গেল ; তাহার 'আমি' ইহাতে অতৃপ্ত হইয়া ধনভাবেও তাহার ব্যাপ্তি সিদ্ধ করিবার জন্য রামকে ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত করিল। নিজে পরম বিশেষ বলিয়া, বাহিরের বিশেষকে আপন করিবার চেষ্টার নাম ব্যাপ্তি (বি+আপ্তি)। ধন অর্জ্জিত হইল ; ও পরে রামের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে দেখিল যে 'আমার' বোধে ধনকে মিশাইতে চেষ্টা করিয়াও ধন 'আমিতে' মিশিল না। সুতরাং বুঝা গেল রামরূপ আত্মভাব প্রকৃত আত্মা নহে ; কারণ তাহাতে দুঃখ, জরা প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবগুলি

মিশিতে পারে না. সুতরাং সে অ'সর্ব্ব' হইয়াই যায়। তারপর তাহাতে বাহ্য ভাবগুলি নিঃশেষে মিশিতে পারে না। এই উভয় দোষের জন্য রামে আত্মভাবের আভাস থাকিলেও উহা প্রকৃত আত্মভাব নহে। ইহাই মিষ্ট করিয়া বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন যে, যাহাতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা কত শত ইন্দ্র, কত চতুর্ম্মুখ বা অষ্টমুখ ব্রহ্মা নিঃশেষে ডুবিয়া যায়, তাহাই ত' আমাদের প্রকৃত 'আত্মা' বা 'পুরুষ' ভাব ;—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত. ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি. পুন তোঁহে সামাওত. সাগর লহরী সমানা॥

"স যোহয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদম্ সর্ব্বম্" সেই পুরুষ যাহা আত্মা, যাহা অমৃত, যাহা ব্রহ্ম, যাহা 'সর্ব্ব' রূপে অবস্থিত। বিভিন্ন আত্মা বা 'পুরুষ' ভাবগুলি যে এইরূপে পরিসমাপ্ত, ইহা বুঝার নামই আত্মতত্ত্ব। শাস্ত্র অধিকারী ভেদে এই আত্ম-তত্ত্বকে ভোক্তা, কর্ত্তা, দ্রষ্টা, নানারূপে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেরই মূল উদ্দেশ্য সেই পুরুষের ভাব অঙ্কণ করা। যাহাতে বিশিষ্ট পুরের ক্রিয়া, প্রযত্ন, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ বোধ ও প্রত্যয়গুলি নিঃশেষে মিশিয়া যায়, যে সেই সকল খেলার ভিতর থাকিয়াও তাহাদিগের দ্বারা অনাবৃত, অসংবৃত অথচ অভিন্ন, তাহাই 'পুরুষ' বা আত্মা। "স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চিনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্।" (বৃহদারণ্যক)। এই ভাবের স্ফুরণের জন্য শাস্ত্রে কতকগুলি উপদেশ আছে। 'সর্ব্ব' ভাবে বিস্তা প্রতিষ্ঠিত। 'সর্ব্ব' ভাবের অবসানে 'পুরুষ' ভাব প্রতিষ্ঠিত। একটীর খেলা বস্তুকে লইয়া, অপরটীর খেলা কেন্দ্রকে লইয়া। এই দুইটী ভাব পরস্পর সংযুক্ত ও মিথুনীকৃত। বিস্তার সর্ব্বাত্মিকা ভাবে ছিন্ন বহু গুলিকে এক না করিলে পুর হয় না। পুরে সমস্ত খেলার মধ্যে পরাগতি না থাকিলে 'পুরুষ' বা 'আমি' ভাব সিদ্ধ হয় না। ক্ষণিক ভাবে সমন্বয় করিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে প্রয়াস, সেই বিস্তার ফলে ক্ষণিক 'পুরুষ' ভাব সিদ্ধ হয়। সেই জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্থির পুরুষকে, এমন কি জীবের নিম্নতর ভাবগুলিকেও, দেখিতে পায় না। পরিবর্ত্তনশীল জগদ্বস্তুর সাময়িক সংযোগ ও বিয়োগে আকস্মিক ভাবে দেহাদির উৎপত্তি হয়,—এই মত স্বীকৃত হইলে 'পুর'গুলি ক্ষণভঙ্গুর ও সাময়িক হয় ; সুতরাং পুরুষ-বুদ্ধিও ক্ষণিক হইয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষণিক ভাবের ভিতরে যে কতকগুলি মৌলিক তত্ত্ব আছে ও ঐ তত্ত্বগুলিকে এক কল্পান্ত স্থায়ী, ইহা বুঝিতে পারিলে

'পুরুষ' ভাবও কল্লান্ত স্থায়ী হইয়া যায়। অজ্ঞ, নিরক্ষরা হিন্দু রমণী ইহ জন্মের কর্ম্ম ও ভোগ সমূহকে আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া দেখে না ; তাহার বুদ্ধি এই যে এ সকলও পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ পুণ্যের ফলাফল ; সেই জন্য তাহার 'পুরুষ' জ্ঞানটীও ক্ষণিক হয় না পরন্তু সে সুখ দুঃখ ভোগাভোগের অতিগ ভাবে এক স্থিরতর চৈতন্য স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইজন্য অজ্ঞাতভাবে এক মহত্ত্ব আত্ম ভাবের স্থিরতা সিদ্ধ হয় বলিয়া স্বধর্ম্মনিরতা হিন্দুরমণী সজ্ঞানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ভীত হন না। আর আমাদের 'পুরুষ নামধেয় পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষণিক-বিজ্ঞান-পরিতৃপ্ত বিদ্যাভিমানী উপাধিধারীরা plague, cholera নাম শুনিলেই মুক্তকচ্ছ ও পরিধেয় বস্ত্রাদি নষ্ট করত পলায়নপর হয়েন। 'সর্ব্ব' ভাবের সমন্বয় কারিণী মহাবিদ্যাকে যে যেরূপ ভাবে বুঝিয়াছেন তাহার আত্মজ্ঞানও সেইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই সর্ব্ব ভাবের সমন্বয়কে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি শব্দের অর্থও অধিকারী ভেদে বিভিন্ন হইয়া যায়, এই বিভিন্নতাই জীবের স্ব স্ব অধিকারের পরিচায়ক। আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু স্বদেশী ভাবের বিকাশ হইতে উপরোক্ত তথ্যের একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিকৃত-মস্তিষ্ক ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী নরেন্দ্র, গজেন্দ্র প্রভৃতি মহারথগণ 'স্বদেশ' শব্দে জল মাটী প্রভৃতির একটা কিম্ভূত-কিমাকার সমন্বয় ভাবিতেন, কাজেই তাঁহাদের বক্তৃতায় প্রকৃত ঘন দেশব্যাপী একত্বের আভাষ পাওয়া যাইত না। কিন্তু যখন স্বদেশ শব্দে চিন্ময়ী, অতিগা দেবীকে দেখিতে পাওয়া গেল তখন সেই মহান্ একত্বের আভাসে দেশও সহসা অনুপ্রাণিত হইয়া গেল। সেই আভাসও বিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতির প্রতি দ্বেষ ভাব অজ্ঞাতসারে মিশ্রিত ছিল। চিন্ময়ী স্বদেশরূপিণী মাতার ক্রোড়ে ত' সকলেরই সমান স্থান ছিল, কিন্তু অপরিপক্ক-বুদ্ধি অসংযত, সনাতন ধর্ম্মের মূল ভাবে অসিদ্ধ, স্বদেশী ওয়ালাগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহার ফলে শ্রীভগবান্-পরায়ণ হিন্দুগণের মধ্যে, বুদ্ধ দেবের অহিংসা মন্ত্রে পূত ভারতবর্ষে, রাক্ষসসুলভ 'বোমা' মতের' সৃষ্টি হইল। যেমন প্রকৃতি সেইরূপ 'পুরুষ,' এই মহামন্ত্র আমাদের বুঝা আবশ্যক। সনাতন ধর্ম্মের সাহায্যে রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতিকে চিন্ময়ী ও সনাতনী করিতে পারিলে, 'পুরুষ'ও চিন্ময়রূপে সনাতন ভাবে স্থাপিত হয়। সেইজন্য ভগবান্কে পাইতে গেলে তোমার 'সর্ব্ব' বা 'প্রকৃতি' ভাব ও তোমার 'অহং' বা পুরুষ' ভাব এই উভয় স্তরেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ'পরিপূর্ণ শ্রীভগবানের পদাঙ্ক দেখিতে পাওয়া চাই। ইহাই প্রকৃত

শিবতত্ত্ব। ইহাই 'সান্তং শিবমদ্বৈতং' ভগবৎ স্বরূপ ; ইহাই 'পরম অদ্বয়তা' শিবা মহাবিদ্যার প্রকৃত উপদেশ।

ভাগবতের আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারই এই মহাভাবে ভাবিত হইয়া রচিত হইয়াছে। ইহাতে কি 'পুরুষ', কি 'প্রকৃতি', কি কর্ম্ম, কি দেবতা, সকল তত্ত্বই এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার ফলে 'সর্ব্ব' ভাবেই পুরুষ-প্রকৃতির অতীত পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ভাব ফুটিয়া উঠে। সেইজন্যই রসিক না হইলে, "রসোবৈ সঃ রসংহ্যেবায়ংলব্ধানন্দী ভবতি" যে রস পান করিলে মানব আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়,—যে রস গায়ত্রী-তত্ত্বের তৃতীয় বিকাশ, যাহা আপঃ ও জ্যোতিঃ এই দুই ভাবের উপরে থাকিয়া এই দুই ভাবকে ঘনরূপে মিশাইয়া দেয়, সেই রসে রসিক মৎসর-শূন্য ও ক্ষুদ্র 'অহং' জ্ঞানের স্থাপনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত, সাধু, ভূতানুকম্পী সাধকগণের উপদিষ্ট ধর্ম্ম বা ভাগবতের মর্ম্ম বুঝা যায় না। যাঁহারা এখনও বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িক মত স্থাপনে ব্যস্ত, তাঁহারা এ ভাব বুঝিতে পারিবেন না। ইহার বেদ্য বাস্তব ও শিবদ পদার্থ, এবং এই ভাগবত শ্রবণে যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা জন্মিয়াছে, শ্রবণ মাত্র তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান, বিনা পরিশ্রমে ও প্রযত্নে, আপনা আপনি অবরুদ্ধ হইয়া যান। তাঁহাদেরই নিকট ভাগবত ব্যাসদেবের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিবে। কিন্তু যাঁহারা এখনও অনন্তরূপে বিতন্বত বিশ্বকে শ্রীভগবানের রূপ ও অনন্ত জীব ও শক্তিকে তাঁহার ব্যঞ্জনা বলিয়া বুঝিতে চাহেন না, যাঁহারা এখনও ভোগের ভাষা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, যাঁহারা এখনও বিশিষ্ট মত, বিশিষ্ট ব্যক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা ভাব পোষণের চেষ্টা করেন, যাঁহারা এক কথায় বিদ্যাবুদ্ধি, দলাদলি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রভৃতি 'সর্ব্ব'ভাবই শ্রীভগবানের জন্য অকাতরে, সানন্দে ও অকুতোভয়ে ত্যাগ করিতে পারেন না, যাঁহাদের চিত্তে সেই পরমাকর্ষক কৃষ্ণ ভক্তের আকর্ষণ প্রকটিত হয় নাই, যাঁহারা বিশিষ্ট 'আমি' ও 'আমার' প্রভৃতি ভাবকে একেবারে ত্যাগ করিতে ও 'অমানি মানদ' হইতে চাহেন না তাঁহারা যেন এই ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করেন না। অনধিকারী ভগবদ্ভক্তি বিহীন ব্যক্তিগণ জোর করিয়া এই ধর্ম্ম আচরণ করিতে গিয়া নেড়া, নেড়ী, বাউল প্রভৃতি মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ মতের সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। বাস্তবিক শ্রীভগবানের বাচক বলিয়াই ভাগবত এই নামের উপযোগী। ইহাতে বাচ্য বা প্রকৃত বাচক বা 'পুরুষ' ভাব নিঃশেষে মিশিয়া গিয়া ঘনাদ্বৈত, আনন্দময় পর পুরুষোত্তমের ব্যঞ্জনা করে। সেই জন্যই আমরা শ্রীভগবানের জন্ম ব্যাপারে, দেশ কালের অতীত পুরুষ ও প্রকৃতির পরি-

নিষ্ঠিতা সর্ব্বাত্মিকা, দ্যোতনশীলা, বুদ্ধিস্বরূপা দেবকী বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মহাভাবের ক্ষেত্রে. 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপ সর্ব্বময়, সর্ব্বত্র সমরূপে প্রকাশমান বসুদেব তত্ত্বের ঔরস-জাত, আমাদের 'অহং' এর একমাত্র গতি, সাক্ষী প্রভু 'কর্ত্তা' স-রূপ শ্রীভগবান বা 'সোহং' তত্ত্বের আভাসে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তবে এ 'সোহং'এ 'অহং' নাই, তাহা 'স'এ পারি সমাপ্ত। (ক্রমশঃ)

যোগানন্দ ভারতী—

মোক্ষ]

কে তুমি ?

কে তুমি, প্রেমের নিবিড় বাঁধনে—
আমায় বাঁধিয়া রেখেছ হে ?
কে আমার শোকে, দুঃখে, দৈন্যে,
করুণ দৃষ্টি রেখেছ হে ?
দিবস রাত্রি হৃদয়ে আমারি,
কে তুমি, বসিয়া বাজাও বাঁশরী ?
কে মোর হৃদয়ে গোপনে পশিয়ে,
মাধুরী মাখায়ে দিতেছ হে ॥
বিশ্ব-বেদীর সোনার আলোকে—
কে তুমি, দাঁড়ায়ে আকুল পুলকে,
দ্যুলোকে ভূলোকে হতেছে আজিকে—
কাহার মঙ্গল আরতি হে ?
মেঘে ঢাকা দিক, অসীম তিমির,
পথ নাহি পাই রাত্রি নিবিড় ;
তোমার চরণ কমল জ্যোতির—
আলোক ফুটিয়া উঠিছে হে ॥
আঁধার সিন্ধু গরজিয়া উঠে,
তা'রি মাঝে তব জ্যোতি ফুটে উঠে ;
(ঐ) অভয় বিশাল হুঙ্কারি উঠে,
শুনিতে তা' যে গো' পেয়েছি।
রোগে, শোকে, তাপে, জীবনে, মরণে,
প্রতি দিনকরে ত্যাগে ও গ্রহণে ;

বাঁধিছ মোরে যে প্রেমের বাধনে—
হৃদয়ে তা' যেন বুঝেছি ॥
দু'খ দিতে চাও ? দিও, তা'ই দিও,
তা' সহিব তোমাকে স্মরিয়া।
যদি অবিশ্বাস, যদি অধীরতা,
আবরিতে চায় আসিয়া ॥
তবু প্রতিদিন হে নাথ! আমার,
তব চরণে রহিব চাহিয়া,
যে আদেশ প্রভু, দিবে গো আমারে,
ল'ব তাহা শির পাতিয়া ॥
সব দুঃখ, রোগ, সন্তাপ, শোক,
সহিব হাঁসিয়া হে।
শুধু এই ক'র হৃদয়ে আসিয়ে,
কথা কয়ে যেও ক্ষণেক বসিয়ে ॥
নয়নের জল ঝরিবার যাহা,
ঝরুক চরণে হে !
মম সব শোক সার্থক হোক,
তোমায় পরশি হে ॥
আমার এমন দিন কি হবে ?
করিয়া অনেক কষ্ট, যতন—
যে কুসুমগুলি করেছি চয়ন,
তাহা শোভাহীন—তাহা মধুহীন,

তুমি হস্ত পাতিয়া ল'বে।
আকুল মানস জানিনা কি ছলে,
(বসি) কথা কবে দুটো পদছায়া তলে;
চরণ ধুয়াবে নয়ন সলিলে,
তুমি হাঁসিয়া বারেক চা'বে।
আমার এমন দিন কি হবে?
কি শোভা ছড়ায়ে রেখেছ জগতে,
নয়ন মুগ্ধ শোভাতে।
কি সঙ্গীতে ভরা এ বিশ্ব তোমার,
শ্রবণ মুগ্ধ তাহাতে॥
রূপ, রস, গন্ধে পরশ, শব্দে,—
তব আনন্দ জাগে।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন আবেগে,
তোমার মিলন মাগে॥
তুমি ইন্দ্রিয় যন্ত্র দিয়াছ যা' নাথ!
তারা মুগ্ধ আপন কাজেতে।
তুমি শোভায় ভরা এ ভুবন গড়িয়া,
শুধু তোমারে দিয়েছ ভুলিতে॥
প্রভু! তোমার শুদ্ধ প্রেম ও জ্ঞান,
করুণা করিয়া দাও।
তোমার স্বরূপ চিনিতে বুঝিতে,
তব আনন্দে, আনন্দ লভিতে;
চরণে তোমার বিনয় নমিতে—
আমারে ভক্তি দাও।
অজ্ঞান-পাশ করিয়া ছিন্ন চরণাশ্রয় দাও॥

সাধনার পথে।

(চতুর্থানুবৃত্তি)

তারক বাবু তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যে তুমি কেন অভিভূত ও বিপর্য্যস্ত হইবে তাহার কারণ দেখিতে পাইতেছি না। তিনি যে তোমাকে বলিয়াছেন যে দৈত্যশক্তিনিচয় হইতে নানাবিধ বিপদ্ আসে ও তাহারা সময়ে সময়ে মহাপুরুষদের প্রতিরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য দেখা দেয়, উহা বাস্তবিকই সত্য। তাহাদিগকে যে ঐরূপভাবে মোহিত করিতে দেওয়া হয়, তাহা ত' ভালই। নতুবা সাধকের বিবেকশক্তি, পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হয় না। আচ্ছা, বল দেখি—একজন বহুরূপী বা ব্যবসাদার ভাঁড় যদি আর একজনের পিতার মত সজ্জং বর্ণ ও শ্মশ্রু-গুম্ফাদি ধারণ করিয়া আসে ও সে ব্যক্তির যদি তাহাকে নিজের জনক বলিয়াই ভ্রম হয়, তবে তাঁহাকে তুমি কি ভাবিবে? যতক্ষণ আমরা শুধু রূপে মত্ত ও বাহ্য আকৃতিতে অভিনিবিষ্ট থাকি, ততক্ষণই আমাদের প্রতারিত হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু অন্তশ্চক্ষুঃ (জ্ঞানচক্ষু বা যোগনেত্র) উন্মীলিত হইলে, তখন আর কদাপিও নহে। অতএব যদি

উহাই (তারক বাবুর কথা) প্রকৃত হয়, তবে কোনও উদ্বেগের কারণ নাই। আরও দেখ, যাহাদের সেই পরম তত্ত্বের সর্ব্বমঙ্গলত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্ব-পাবনত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠানত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, তাহাদের অসত্য বা মায়িক কোনও বস্তু দ্বারা বিচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তিনি সর্ব্বভূতাধিরাম—সত্য ও মায়ায় সমভাবে বিরাজ করেন।

* * *

যে আলোক শুধু তোমার মনের অন্ধকার আলোকিত করিতে পারে, যে শান্তিই একমাত্র ক্রমবিকাশের মহানিয়মে আপতিত আপৎ সমূহের অন্তরে এবং বাহিরে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত ভাবে বিরাজমান, আমি তোমাতে সেই আলোক ও সেই শান্তি আনয়ন করিবারই চেষ্টা করিতেছি। যদিও তুমি আমার উপস্থিতি অনুভব করিতে পার না, তথাপি আমি প্রত্যহ তোমার নিকট, কখনও কখনও একাধিকবারও, আসি। আমাকে দর্শন করিলে যখন তোমার প্রকৃতই কল্যাণ সাধিত হইবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে ;—অন্য কারণে নহে। অতএব যখন আমাকে দেখা উচিত নহে, তখন দেখিবার ইচ্ছা করিয়া তোমার ভিতরের ও বাহিরের সমতা বিচলিত করা তোমার পক্ষে সমীচীন নহে। মনে রাখিও যাঁহারা তোমার জীবন-পথের পারদর্শক, তাঁহারা তোমার যে বাস্তবিকই কিসের প্রয়োজন আছে, তাহা তোমাপেক্ষা উত্তমরূপেই জানেন। অতএব যাঁহারা চিত্তের অসীম ও অপার কারুণ্যবশতঃ অনুদিন জীবের মঙ্গল-প্রয়াসী, সেই মহানুভব ঋষি ও মুক্তপুরুষদের সহিত ঐক্য স্থাপনে অভিলাষী হও। ইহাই ত' পরমার্থের সোপান।

(৫)

অপত্যস্নেহে তুমি যেরূপ রূঢ় আঘাত পাইয়াছ, তাহাতে বর্ত্তমান দুর্বিপাক তোমার নিকট যে কি আলোক বহন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না ও তজ্জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছ, ইহা অত্যন্তই স্বাভাবিক। তোমার বর্ত্তমান শোকের অবস্থার বিষয়ে আমি কিছু বলিব কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। যেই মাত্র মোহ-কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইবে ও কালবশে তোমার মন পুনরায় সাম্যাবস্থা লাভ করিবে, তখনই সেই আলোক তোমার নয়ন সমক্ষে স্ফুরিত ও উদ্ভাসিত হইবে।

বৎস! ঈশ্বর যে সর্ব্বদাই ন্যায়বান ও করুণাময় এবং ইহলোকের সমস্ত ঘটনাই যে তাঁহার মহানিয়মে পরিচালিত হইতেছে, এ তত্ত্বটী মস্তিষ্ক দ্বারা

সর্ব্বদা গৃহীত না হইলেও ধ্রুব সত্য। অতএব ছিন্ন জ্ঞানবশতঃ তোমার অল্পাবগাহী বুদ্ধি ও অনুভব দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও, দেখিও যেন অসংশ্লিষ্ট (isolated) ঘটনাসমূহ কখনও তোমার মনে শ্রীভগবানের ন্যায়বত্তা ও মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন না করে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অসীম মায়ায় আবৃত ও বেষ্টিত; অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় সবিতাও অনন্ত আকাশের ঘোরান্ধকার দূরীভূত করিতে পারে না—এ কথা কেন ভুলিয়া যাও? যে ক্ষুদ্র প্রাণীটী সম্প্রতি পরলোকে গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই মাত্র আমি বলিতে চাই যে, ইহার জীব শিশু নহে। যদিও ইহার মস্তিষ্ক যন্ত্রণাসমূহের অনুবাদ (প্রকৃতরূপে বোধ) করিতে পারে নাই, তথাপি ইহার বুদ্ধি যাহা শিখিবার তাহা শিখিয়াছে এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হইয়াছে।

এই পরীক্ষার সময় শত্রু (দৈত্যগণ) যে সমস্ত প্রশ্ন তোমার মনে উদিত করিয়াছে, তাহা লইয়া চিত্তকে অবসাদগ্রস্ত করিও না। দৈত্যশক্তিনিচয়ের ক্রিয়াকৌশল অতি ভীষণ ও তাহাদের গতি অতি সূক্ষ্ম। অতএব শোক যে আমাদের চিত্তকে ঘনমেঘাবৃত করে, ও আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারও যে যৎসামান্য, ইহা মনে রাখিয়া যে বিশ্বাসকে তোমার চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থায় ও স্থিরতর বিবেকের সাহায্যে যুক্তিযুক্ত এবং তৎকালের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ অবস্থাসমূহের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছ, সেই বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইও না। সত্য ও জ্ঞানের পথ ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত এবং যে সব বাধা বিঘ্নসঙ্কুল, সেগুলি বিচিত্র ও নানাবিধ। অতি দৃঢ় ও সংযতচিত্ত ব্যক্তিই সে পথে অবিচলিত ও স্থির থাকিতে পারে,—সে দৃঢ়তাও আবার অস্মিতা মাত্রাপ্রসূত হইলে টিকিয়া থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীগুরু পাদপদ্মে অব্যভিচারিণী প্রণতি ও রতিই জীবের মহত্তর সত্ত্বাকে সঞ্জীবিত রাখে।

অতএব স্বপ্নেও ভাবিও না যে একটী যোগীকে গড়িয়া তুলিবার জন্য একটী নিরপরাধ নিষ্কলঙ্ক জীব কষ্ট ভোগ করিবে। ঐরূপ ভাবনা—অর্থাৎ বাহ্যবস্তুসমূহ আমাদের ভেদভাবাবদ্ধ সত্ত্বার জন্যই অবস্থিতি করে সর্ব্বান্তরাত্মার জন্য নহে,—এরূপ অলীক চিন্তা অহঙ্কার-প্রসূত মিথ্যানুবাদ মাত্র। ন্যায়ের বিধান সর্ব্বলোকেই প্রতিপালিত হইবে ও অব্যাহত থাকিবে; এবং সমস্ত বস্তু, সকল ব্যক্তিই নিয়মানুসারে যাহা পাইবার তাহা পাইবে। কেবল উহার জটিলতাগুলি হয়ত তুমি আমি আজ পর্য্যন্তও বুঝি নাই; এবং তজ্জন্য বারম্বার এমনতর সমস্যার সম্মুখীন হই যে উহাতে বুদ্ধিকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে। প্রকৃত ভাব

(attitude) এই প্রকার যে, যাহাই ঘটুক না কেন, তুমি অবশ্যই নিজকে বুঝাইবে ও অনুভব করিবার চেষ্টা করিবে যে উহা ন্যায্য ও সঙ্গত না হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ শ্রীভগবানের সংসারে ইহার বিপরীত ভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। যোগীর এ সমস্ত কষ্ট পাইতেই হইবে, তজ্জন্য তিনি অবিচলিত ভাবে যাহাতে তিতিক্ষা অবলম্বন করিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা করিবেন।

* * *

তোমার স্ত্রী যে বস্তুসমূহের ভিতরকার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত যোগানুমোদিত পন্থায় শিক্ষিতা হইতেছেন, তাহাতে আমি আহ্লাদিত হইলাম। বস্তুতঃ যতদিন পর্য্যন্ত নিজের স্ত্রী মহত্তর জীবনের আভাস মাত্রও প্রাপ্ত না হন, ততদিন মানুষের জ্ঞান-পথে প্রকৃত স্থির উন্নতি লাভ করা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক জানিও যে তাঁহার যে কাহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিকট কিছু প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে। কারণ যদিও স্বামী স্ত্রীর বিভিন্ন গুরু হওয়া বিশেষ সুবিধাজনক নহে, তথাপি অকালে তোমার স্ত্রীকে তোমার গুরুর নাম বলিয়া দিয়া হয়ত' তুমি একেবারে কার্য্য পণ্ড করিবে। আমি স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে জানিয়াছি যে, যদি স্ত্রী প্রকৃতই সহধর্ম্মিণী হয়েন, —যদি তিনি প্রকৃত সাধনার সহচরী ও কল্যাণকারিণীরূপে সংযুক্তা হইয়া থাকেন, তবে তিনি স্বতঃই নিজের প্রাণে স্বামীর গুরুকে খুজিয়া বাহির করিতে পারেন এবং পরে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার পথ পুষ্প সমাকীর্ণ না করিতে পারিলেও অন্ততঃ কিছু দূর সরল করিতে পারিবেন। সেই পরম কৃপাময় মহাগুরুগণ যেন তোমাদের উভয়কেই রক্ত মাংসের শরীরের সহজাত উপদ্রবগুলি সহ্য করিবার উপযোগী শক্তি ও শান্তি প্রদান করেন এবং তোমাদিগকে ধীরে ধীরে সেই নির্ম্মল স্থির শান্ত লোকে পরিচালিত করেন!! তথায় দুঃখ ভীষণ ছায়া বিক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় না, তথায় চিরশান্তি বিরাজমানা।

* * *

প্রিয় বৎস! তোমার উপর যে কি গুরু কর্ম্মভার অর্পিত হইতেছে তাহা আমি জানি। কিন্তু ধৈর্য্য, সাহস বা বিশ্বাস হারাইওনা। বরঞ্চ এই বাহ্য বিপদ রাশি হইতে আভ্যন্তর শক্তি ও দৈবীসম্পৎ যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা শিক্ষা কর —যাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের খেলা ঘরের ঝটিকাবর্ত্ত হৃদিস্থিত পরমাত্মার স্বরূপ-ভূত পরমশান্তি আর ভঙ্গ করিতে না পারে,—যাহাতে অবশেষে কোন জীব আপনার মঙ্গলময়ী ভাগবতী প্রকৃতি

উপলব্ধি করিতে পারে—যাহাতে তোমার 'আমিটী' তাহার 'তটস্থ' ও দেশ কাল কর্ম্মাতীত মহাভাব ও পরাগতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং মায়া ও তৎ সহকারী পরিণাম সমূহ হইতে আপনার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা ও অপাপবিদ্ধতা বোধ করিতে পারে। তুমি জান যে আমাদের দুঃখ কষ্ট সমূহ স্বকৃত কর্ম্ম-বিপাক মাত্র; উহারা আমাদের বিকারী বা পরিণামী সত্ত্বার বা 'ক্ষণিক আমির' সহিত সংযুক্ত;—আমাদের নিত্য শাশ্বত স্বরূপকে বিন্দুমাত্র খিন্ন করিতে পারে না। অতএব সমস্ত দুঃখ কষ্ট যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জীবের পাবন, তাহাও জানিয়া ঐ গুলিতে আর বিরক্তি প্রকাশ করিও না। বরঞ্চ তাহাদের যা' মূল্য (তাহারা যে ভাবের ব্যঞ্জক) তদ্রূপে গ্রহণ করিবে ও অবিচলিতভাবে উহাদিগকে গ্রহণ করিবে। যাহারা তাঁহাদের (মহাপুরুষদের) সেবক তাহাদিগকে যে দারিদ্র্যে নিষ্পীড়িত হইতে হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। দারিদ্রই সর্ব্বত্যাগের সোপান ও তদ্দ্বারা আমাদের গুণ ও বিশ্বাস (ভক্তি) পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ভাবের উপর নির্ভর কর যে, যাঁহারা আমাদের নিয়তি পরিচালিত করিতেছেন, ও আমাদের কার্য্যাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা সহস্র গুণে জ্ঞানী; এবং তাঁহারা যাহা করেন, তাহা আমাদের পক্ষে প্রকৃতই মঙ্গলজনক।

সাংসারিক কর্ত্তব্য বলিয়া তোমায় যাহা যাহা করিতে হইতেছে, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকা সুবিবেচনা সঙ্গত নহে। অতএব মনে করিওনা যে, মর্ত্তধারী একটা খারাপ জায়গা। তুমি নিজেই জান যে মনই বন্ধ মোক্ষের কারণ; উহা স্বর্গকে নরকে ও নরককে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে। যোগীকে যে সকল অন্তরায় অতিক্রম করিতে হয়, তাহার মধ্যে প্রধান একটী এই যে "বহির্বিক্ষেপ" বিরহিত হইতে হইবে, অর্থাৎ বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপেক্ষা করিতে হইবে। এই স্থলে আমি উল্লেখ করিতে চাই যে, এইখানেই যোগবিদ্যা ও বাম মার্গাবলম্বীর (বিভূতির) পথ বিভিন্ন দিগাভিমুখী হয় শ্বেতদ্বীপের ঋষিরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল বা প্রতিকূল করিতে কোনও প্রয়াস অবলম্বন করেন না। উহা যেরূপই থাকুক, ইঁহারা সেইরূপেই —ভগবদ্রূপেই, তাহাদিগকে গ্রহণ করেন,এবং পরমাত্ম শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ইহাদের উপর আপন প্রভুত্ব স্থাপনা করেন। পক্ষান্তরে বাম মার্গগামীরা, সংঘর্ষে বিশিষ্ট আমিত্বের প্রসার হইবে বাসনায়, স্বেচ্ছায়, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্বেষণ করেন এবং এইরূপে

তাঁহাদের সামর্থ্যের উপর গুরু ভার ন্যস্ত করেন ; নতুবা নির্ঝঞ্ঝাট সরল পন্থার জন্য আকুল হন এবং তজ্জন্য অন্তরে দুর্ব্বলই রহিয়া যান। ভাগবত জ্ঞান ও ভাগবতী শান্তির সাধকের নিকটে বাহ্যাবস্থায় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কারণ তিনি অবস্থার বা বাহ্য ব্যক্ত ভাবের দাস নহেন ; বরং তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াই চলেন। শুধু এইরূপেই আমরা ভিতরের শক্তিতে মহীয়ান হইয়া বিকশিত হইতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রী প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম]

ধর্ম্মপথ।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত এই সংসারে সকলই নশ্বর। আজ যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, কাল তাহার অস্তিত্ব কোথায়? অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া কোন্ অজ্ঞাত কুহক তলে মোহ তিমিরাচ্ছন্ন জীবকে যেন দিন দিন বদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। আশা আকাঙ্খার নিবৃত্তি নাই—পিপাসারও শান্তি নাই ; নিত্য নূতন উত্তেজনার হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে আমাদের ভোগ-বিলাস-সুখপালিত জীবন-তরণী কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে! যাহা চাই, তাহা পাই না ; পাইলেও আশা মিটে না ; শুধুই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়নে দিন রাত্রি ছুটাছুটি! পদে পদে ছলনাময়ী আশা মরীচিকা, আর আত্ম প্রবঞ্চনা। সংসারে সুখ দুঃখের আশা-নিরাশার পাষাণে কতই না নিষ্পেষিত, নিপীড়িত! কখন আশায় উৎফুল্ল, আবার কখনও বা নিরাশার উষ্ণশ্বাসে—গভীর মর্ম্মবেদনার লেলিহান অগ্নি-শিখায় দেহ মন আশা ভরসা,সহায় সম্পদ সব যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে! চির কল্যাণময়ী বসুন্ধরার শান্ত, শীতল ক্রোড়েও আর যেন সুখ শান্তি নাই, শুধুই উত্তপ্ত সংসার-মরুর অসহনীয় তাপ! বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই দুঃখময় সংসারে জীবের দুঃখের অভাব নাই। কিন্তু করুণাসিন্ধু মঙ্গলময় ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু এই সংসার মরুতেও স্নিগ্ধ শীতল উৎস-সমন্বিত উদ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারের দুঃখ তাপদগ্ধ বিরহ বেদনা ব্যথিত ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট নরনারী ইচ্ছা করিলে, সেই ফলচ্ছায়া সমন্বিত উৎসের শীতল সলিলে অবগাহন

করিয়া এ জনমের কেন,—বহু জন্মার্জ্জিত পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইতে পারে। এই সংসার মরুতে উৎস-সমন্বিত মরুদ্যানই ধর্ম্মক্ষেত্র। সুদীর্ঘ বালুকা কঙ্করময় মরুভূমি অতিক্রম করিয়া এইখানে আসিতে পারিলে, "ত্রিবিধ দুঃখের" নিবৃত্তি হয়। অকপট ধর্ম্মানুরাগীই এই পথক্লেশ সহ্য করিয়া এইখানে আসিতে পারেন, অন্যের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সংসারে ধর্ম্মপথই মানবের চরম লক্ষ্যস্থল,—দুঃখতাপময় সংসারে শান্তি লীলা-নিকেতন। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মপথ ভিন্ন মানবের গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই ধর্ম্মপথে প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে, বড়ই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। ধর্ম্মপথ পরীক্ষা ক্ষেত্র; বিঘ্ন বিপত্তি পদে পদে; বিপত্তি বাত্যা অহরহঃ বহিতেছে; বিঘ্নের আবর্ত্ত যেখানে সেখানে, প্রলোভনের চোরাদহ চারিদিকে; কুহকিনী আশা উত্তাল তরঙ্গমালা তুলিয়া তোমার চিত্ত হ্রদকে বিক্ষোভিত করিবে। ষড়রিপু গুপ্ত শত্রুরূপে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবে। শয়তান বন্ধুর বেশে তোমার মন ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। তাই বলি হে পান্থ! সাবধান! প্রথমে তুমি দুঃখ, যন্ত্রনার ও নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে পথ দেখিতে পাইবে না। এই বিশাল সংসারে তোমার স্থান হইবে না। হয়ত, তরুতলে ছিন্নকন্থা ও মুষ্টি ভিক্ষা তোমার জীবনের সম্বল হইবে। কিন্তু এই সব বিঘ্ন-বিপদ প্রকৃত পক্ষে ক্ষণস্থায়ী; এ সব কিছুই নহে, কেবল তোমার পরীক্ষা মাত্র। পরীক্ষায় এই কঠোরতা দেখিয়া অনেক পান্থই ভয় পান, কেহই আর ঐ বিপদসঙ্কুল পথে অগ্রসর হইতে চাহেন না। তাই সংসারে প্রকৃত ধার্ম্মিকের বড় অভাব; সকলেই প্রায় বৈড়ালব্রতী ও বকোধার্ম্মিকের দল। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই পথ ত্যাজ্য?—না কখনই নহে। কেননা, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ "(গীতা) এই ধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে।

আর এক কথা, এই পথক্লেশ সহ্য করিয়া যদি একবার ঈপ্সিত স্থানে গমন করা যায়, তাহা হইলে সকল ক্লেশের অবসান হয় এবং যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে পথিককে উৎফুল্ল করে ও সারা জীবনের ক্লেশের পরিবর্ত্তে এক পরমানন্দ লাভ হয়। সে লাভের—সে আনন্দের তুলনা নাই। এ আনন্দ কত প্রচুর, কত অতুলনীয়, তাহারই পরিচয় দিতে গিয়া ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "যং লব্ধা চাপরং লাভমন্যতে মাধিকংততঃ" যাহা লাভ করিতে পারিলে অন্য লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে হয় না। ইহাই ভূমানন্দ। ভূমাই সুখ—"ভূমৈব সুখং"।

সংসারে প্রকৃত ধর্ম্মের ন্যায় বন্ধু ও আশ্রয়দাতা আর নাই। জীবের সহিত ইহাঁর নিত্য সম্বন্ধ। ইনি মানবের ইহকালের ও পরকালের সঙ্গের সাথী। কেহ পরিত্যাগ না করিলে, ইনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না; ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়া থাকেন। যে দিন মানব পৃথিবীর অর্থ-বিত্ত, বিষয়-বৈভব, ত্যাগ করিয়া শ্মশানের অনলে দগ্ধ হইয়া বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন, "শ্মশানানলোদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ" যে দিন "আকাশস্থঃ নিরালম্বঃ বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ" হইয়া কোন্ মহাশূন্যে অবস্থান করিবেন, যে দিন পৃথিবীর কোন বন্ধুই আর তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না; সে দিন এই একমাত্র ধর্ম্মই তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠিত প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিবে। হিতোপদেশে আছে —

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেন সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

"ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ। ইনি মরণেও অনুগমন করিয়া থাকেন। অপরাপর সমস্তই শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়।' সুতরাং এ হেন ধর্ম্মকে কখনও পরিত্যাগ করিতে নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও অকর্ত্তব্য কি?—যাহাতে অধর্ম্ম হয়।" অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করা প্রয়োজন। ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে ধর্ম্মও কাহাকেও রক্ষা করেন না; যথা,—

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিত।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্ম হতোঽবধীৎ॥

"ধর্ম্মনাশ করিলে সেই নষ্ট ধর্ম্ম মনুষ্যকে বিনাশ করে এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিলে রক্ষিত ধর্ম্মই রক্ষা করে। অতএব ধর্ম্ম নষ্ট করিবে না। ধর্ম্ম নষ্ট না করিলে, ধর্ম্মও কাহাকেও নষ্ট করেন না" মানবের ধর্ম্ম আছে; তাই মানব অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; নচেৎ মানবে ও পশুতে কোনও প্রভেদ নাই।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্
ধর্ম্মস্তু তেষাং হি বিশেষ এব ধর্ম্মেণ হানাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" মনু

"আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ঐ সকল মনুষ্য ও পশু উভয়েরই আছে। কেবল ধর্ম্মই মানবের বিশেষত্বের হেতু; সুতরাং ধর্ম্মহীন হইলে মনুষ্য পশুরই তুল্য।" অধর্ম্মে কখনও মানবের মঙ্গল হয় না। ধর্ম্মপথ অবলম্বনের উদ্দেশ্যই মঙ্গল লাভের জন্য। কিন্তু কেহ হয়ত বলিতে পারেন, অধর্ম্ম পথে থাকিয়া মঙ্গল লাভ করিতে ত' অনেককেই দেখা যায়। একথা নিতান্ত অমূলক নহে।

অধর্ম্ম পথের প্রথম লাভই এইটুকু, —আপাততঃ সুখ ও উন্নতি। কিন্তু পরিশেষে কল্পনার অতীত দুঃখ দুর্গতি, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভগবান মনু বলেন,—

"অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততঃ ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জায়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

"অধর্ম্মাচরণে মানব প্রথমে বর্দ্ধিষ্ট হয়। তারপর লোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়, তৎপর শত্রু পর্য্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অবশেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" অধর্ম্মের ঠিক ইহাই লক্ষণ; আর ধর্ম্মের লক্ষণ ঠিক ইহার বিপরীত। ধর্ম্মপথের আলোচনার সহিত ধর্ম্ম কথাটীর অর্থ বুঝা প্রয়োজন। ধর্ম্ম কি? ধৃ ধাতু মণ্ প্রত্যয় হইতে ধর্ম্ম কথাটী উৎপন্ন; বস্তুমাত্রং ধ্রিয়তে যেন ধরতি বা যঃ, স ধর্ম্মঃ অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ধৃত হইতেছে বা যিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু ধর্ম্ম কথাটীর আরও ব্যাখ্যা আছে। যথা:—

বৈশেষিকের ঋষি ভগবান কণাদ বলেন,—"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম্ম। (অভ্যুদয়= ইহকালের ও পরকালের উন্নতি। নিঃশ্রেয়স=আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি।*) যে পুরুষার্থ দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, মহর্ষিগণ তাহাকেই ধর্ম্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। যে অলৌকিকী ঈশ্বরেচ্ছা অখিল বিশ্ব ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

সত্ত্বৃদ্ধিকরো যোঽত্র পুরুষার্থোঽস্তি কেবলঃ।
ধর্ম্মশীলো তমেবাহু ধর্ম্মং কেচিন্মর্হয়ঃ॥
যা বিভর্ত্তি জগৎ সর্ব্বং ঈশ্বরেচ্ছাহ্যলৌকিকী।
সৈব ধর্ম্মো হি সুভগে নেহ কশ্চন সংশয়॥

যাহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। আমরা প্রধানতঃ কতকগুলি আচার সমষ্টিকেই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু আচারকে ঠিক ধর্ম্ম বলা যায় না। তবে ইহা আচার ধর্ম্ম। আচার ধর্ম্ম লাভের সোপান বলিয়া আচারকে পরম ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। "আচারঃ

---

* যাহাতে একত্ব বুদ্ধির উপক্রম হয়, (Sense of an organic synthesis) যাহা জীব বা বিশ্বের অনুগুলিকে উন্নত করিয়া পুরুষাভিমুখী করে, (অভ্যুদয়) যে শক্তির সাহায্যে উপাধি অতিক্রম করা যায় (নিঃশ্রেয়স) তাহাই ধর্ম্ম। সং সং

পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এব চ"—সদাচার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা কথিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ও চিত্ত চরিত্র নির্ম্মল রাখিবার জন্য এই আচার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রযত্নে অবশ্য পালনীয়। বলিতে কি আচার হীন ব্যক্তি কখন ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে Theosopnical Societyর কর্ণধার শ্রীমতী আনি বেশান্ত মহোদয়া (Mrs Annie Besant) কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। যথা :—

"For what is religion? Religion is not a mass of formulæ which people can learn by heart and practise by rote, it is not a number of ceremonies which priests can perform and people look on at; it is not even sacred books however noble, however inspiring, however precious. Religion is the cry of the human spirit to the Life whence it came; it is the appeal of the little self bewildered in the mists of earth to the Supreme Self, whose reflection it is, it is the search of the human heart for God; অর্থাৎ ধর্ম্ম কি? ইহা কতক গুলি মন্ত্রের সমষ্টি নহে; কারণ তাহা হইলে সকলেই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ধার্ম্মিক হইতে পারিত। অপিচ শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান পরম্পরাও ধর্ম্ম নহে; কারণ তাহা হইলে ত' উহা ক্রিয়াকুশল যাজক মাত্রেরই করায়ত্ত হইত। তদ্রূপ সুবুদ্ধি-বিকাশক, সন্মার্গ প্রকাশক পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রাদিও ধর্ম্মপদ বাচ্য নহে। তবে ইহা কি? ইহা সেই অচিন্ত্যব্যক্ত অনাদি অনন্ত জীবন প্রবাহে মিলিত হইবার জন্য সান্ত জীবনের আকুল আকাঙ্ক্ষা; পরমাত্মার পবিত্র জ্যোতি সন্দর্শনের নিমিত্ত সংসার তমিস্রায় পথভ্রষ্ট জীবাত্মার কাতর আবেদন; সেই সর্ব্বেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য মানব হৃদয়ের অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতির উজ্জ্বল দিবালোকে প্রবেশ না করিলে, প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক বলা যায় না। আজ কালকার ধর্ম্মবীরের কথা— "আমি যাহা বলি তাহা কর যাহা করি তাহা করিওনা।" অর্থাৎ আজকাল কেহই ধর্ম্মের অনুভূতিলাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদি যে সমস্ত কষ্টসাধ্য

* এগুলি ধর্ম্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ নহে। Loose thinking গত একদেশিক উপপত্তি মাত্র যথা। পং সং

ব্যাপার আছে তাহার অনুষ্ঠান করিতে চাহেন না। সকলেই শুধু বাক্‌-সর্ব্বস্ব উপদেষ্টা—ধার্ম্মিক। আমরা অজ্ঞতার কুহেলিকাময় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে, হৃদয়ে সত্য তত্ত্বের হেমোজ্জ্বল স্নিগ্ধালোক জ্বালিতে না জ্বালিতে, ধর্ম্মলাভ হইয়াছে বলিয়া প্রচার করি এবং নিজেকে একটী ছোট খাট অবতার বলিয়া খাড়া করিতেও পশ্চাৎপদ হই না। শুধু ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিলে বা লম্বা-চওড়া বাক্যব্যয় করিয়া বক্তৃতা দিলে, কিম্বা ধর্ম্মের কতকগুলি শুষ্ক বাহ্যানুষ্ঠান অবলম্বন করিলে ধর্ম্মলাভ হয় না। বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত ধর্ম্ম ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। এক বিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষানুভূতি রাশি রাশি বাক্‌প্রপঞ্চ ও মূর্খ সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস হইতে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর" * নানাধর্ম্মের নানা মত ও পথ আছে। যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর কিছু না কিছু বিবাদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্মের সার। আর ইহাই ধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব। তাই ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ দৃষ্ট হইলেও, উহার মূল উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষানুভূতির বিমলালোকে উপস্থিত হওয়া কোনও সাধু মহাজন বলিয়াছেন,—

"উদ্দেশ্য নাহিক ভেদ, এক ব্রহ্ম, এক বেদ,
যোগ, ভক্তি, পুণ্য, এক উপাদানে গঠিত।
এক ছাঁদে গড়া দেহ, এক দয়া, এক স্নেহ,
হৃদে হৃদে বহে রক্ত এক বর্ণ লোহিত॥
ভিন্ন ভিন্ন মত,   ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্য স্থান।
যে যেমন পারে,   ট্রেণে ষ্টীমারে,
হোক সেথা আগুয়ান।"

ইহাই ধর্ম্মের মূল কথা, ভিন্ন ভিন্ন পথ হইলেও গম্যস্থান সেই এক ব্রহ্ম। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আপাততঃ পৃথক হইলেও, সকলেই সেই সর্ব্বশক্তিমানের অংশ—ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। জ্ঞানীর চক্ষে—ভক্তের চক্ষে—সর্ব্ব ধর্ম্মের বিশেষ সারবত্তা আছে। শুনা যায় শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ দেব সাধনের প্রথম অবস্থায় নানা ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। কখন ফকিরের বেশে আল্লার জন্য, কখন 'রাম' 'রাম' বলিয়া হনুমান সাজিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্য গাছে গাছে বেড়াইতেন; আবার

* স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত ভক্তিযোগ।

কখনও বা স্ত্রীলোকের বেশ হাবভাব ধারণ করিয়া শ্রীনন্দদুলালকে স্বামীরূপে ভাবনা করিতেন, আবার কখনও বা 'মা' 'মা' বলিয়া আবেগভরে অনন্ত ভাবোচ্ছ্বাসে শ্যামামায়ের চরণ-পদ্মে ভক্তি চন্দন-চর্চ্চিত রক্তজবা দিয়া আত্মানন্দে বিভোর হইতেন। সাধক চরিত্রের কি অপূর্ব্ব মহত্ব! সাধকের ঈশ্বরের জন্য কি অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা! ধর্ম্মের জন্য—ঈশ্বরের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা না থাকিলে এরূপে কেহ আপনহারা হইয়া আরাধনা করিতে পারে না।

ধর্ম্মে আ'র ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই ঈশ্বর। "নিয়ন্তৃত্বাদ্রূপং ধর্ম্মস্য" (কর্ম্মমীমাংসা) ঈশ্বর জগতের নিয়ামক এবং ধর্ম্ম দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইয়া থাকে, এই হেতু ধর্ম্ম ভগবদ্রূপ। সাধকের যখন ধর্ম্মপিপাসা প্রবল হয়, যখন তিনি ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করেন, তখন আর তিনি প্রলোভনের সহসা তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হন না। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপথে থাকিয়া লোকাতীত যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কঠোর জীবনসংগ্রামে যে তিতিক্ষা, যে অধ্যবসায়, যে সত্যনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মের উপর অকপট অনুরাগ ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা দুর্লভ। একমাত্র ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ন্যায়ের—সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই কত কত মহাত্মা প্রাসাদবাসী রাজাধিরাজ হইয়াও স্বেচ্ছায় হাসিমুখে ভিক্ষুকের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া ধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যিনি ধর্ম্মের জন্য নিজের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া, এই সংসার আহবে জয়পতাকা উড়াইতে পারেন, তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ—তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

তা'ই বলিতেছিলাম ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, তিনি এ জগতে কোন দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার পক্ষে দুঃখ, দুঃখই নয় ত'; এ যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ। তিনি সমস্ত দুঃখ কষ্টকে আনন্দে ও হাসিমুখে গ্রহণ করেন; আর বলেন,—

"বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
দুঃখ নয় মা দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা,
সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি শিরে সুখ দুঃখেরি পশরা।"

দুঃখ কিসের? দুঃখ যতই ভোগ হয়, ততই মঙ্গল। বুঝিতে হইবে এক একটী দুঃখ ভোগ হইলে, এক একটী সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইল। "এ যে

মায়ের স্নেহের শাসন, মায়ের দেওয়া দুঃখ তাপ, জন্মার্জ্জিত পাপ নাশ করে। সন্তান-বৎসলা মা আমাদের সন্তানের মঙ্গলের জন্যই ব্যস্ত! সন্তানকে কখন হাঁসান, কখন কাঁদান, কখনও কোলে করেন, আবার কখনও বা শাসনের জন্য কোল হইতে নামাইয়া দেন। সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল মা যেমন বুঝেন, এমন আর কে পারে? তাই মা ছেলেকে শুধুই আদর দিতে ভালবাসেন না। বেশী আদর দিলে ছেলে যে বিগড়াইয়া যাইবে—উদ্ধত হইবে। তাই মা আমাদের সুখ দুঃখের কোমল কঠোর আঘাতে ছেলেকে সুশিক্ষা দেন। ধার্ম্মিক কখনও মায়ের দেওয়া দুঃখ তাপে অধীর হন না। তাঁহার লক্ষ্য ধর্ম্ম—ভগবান। ভক্তের প্রার্থনা দুঃখ—মুক্তি নয়, কেবল সেই চিরবাঞ্ছিতের স্নিগ্ধ নির্ম্মল আলোকোজ্জ্বল অনুভূতির জন্য। ধার্ম্মিক দুঃখের বিনিময়ে চান, প্রেমময়ের পবিত্র চরণ সংস্পর্শ। ভক্ত কবি ঠিকই বলিয়াছেন,—

Impose upon me whatever hardships you please, give me nothing but the bread of sorrow to eat. Lay me in the cold hut of poverty and in the thorny bed of disease Set death before me with all its terrors, do all this—only let me pillow my head in the bosom of Omnipotence" (Lord Brougham) অর্থাৎ আমার দুর্ব্বল মস্তকে দুঃখের দুর্ব্বহ ভার নিপতিত হয় হউক। শোকের প্রতিক্ত রসে আমার মুখের গ্রাস তিক্ত হউক! অভাবের অগ্নিময় গহ্বরে এবং ব্যাধির কণ্টকময় শয্যায় আমার বাসস্থান হউক! বিশ্বাসভাজন বন্ধুগণের সঙ্গসুখে আমি জন্মের মত বঞ্চিত হই! মৃত্যু তাহার শত বিভীষিকায় পরিবৃত হইয়া আমার সম্মুখে অধিষ্ঠিত হউক!—কিন্তু সেই সর্ব্বেশ্বরের প্রতি অনুরাগ যেন আমার অচল থাকে; যেন সেই সর্ব্বশক্তিমানের স্নেহময় বক্ষে আমার পরিশ্রান্ত মস্তক বিশ্রাম লাভ করে।" ধার্ম্মিকের ইহাই কামনা—ধার্ম্মিকের কামনা শুধু ধর্ম্মের সহিত—ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিবার জন্য। ধর্ম্মের অনন্ত পথ আছে; তন্মধ্যে যে কোন্‌টী সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিলে, ওই ঊর্দ্ধে প্রেমময়ের রাজ্যে শান্তিময়ের নিভৃত কুঞ্জে, জ্যোতির্ম্ময়ের রত্ন সিংহাসন তলে, যেখানে ব্যাস, বশিষ্ঠ, বামদেব, যেখানে শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, দীপ্ত পাইতেছেন, সেখানে, হের ভাই ধর্ম্মপথের পথিক! তুমিও তাঁহাদের পদরেণু মাখিয়া পূতসলিলা অমৃততোয়া মন্দাকিনীর শীতল সলিলে অবগাহন করিয়া ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইয়া দুর্লভ

মানব জনম সার্থক করিতে পার। আর—আর যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর ধর্ম্মের পথ কি ? আমি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের উক্তি আবৃত্তি করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিব—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

ধর্ম্ম]

সমস্যা।

এ যুগের নব্য ছাত্রবৃন্দের সহিত নিভৃতে আলাপ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্মহীন আধুনিক শিক্ষা তাহাদের মনের ভিতর কি ভয়াবহ দুর্নীতি সকল বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাস হিন্দু ছাত্রের লক্ষ যুগের আস্তিক্য জ্ঞান এবং সদসৎ বিচারবুদ্ধি একেবারে হৃদয় হইতে মুছিয়া দিতেছে। বাংলা দেশের প্রত্যেক বি এ, এম-এ, এখন ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রচারক। ভাবের বশে যখন যে খেয়াল তাহা দর মাথায় উঠে, তাহাকেই চরম সত্য ভাবিয়া সমাজের ঘাড়ে বজ্র-নির্ঘোষে ফেলিয়া দেয়। তাহারা শিখিতেছে, যে সমাজের কল্যাণ উদ্দেশে কোন সাধনাই হেয় নয়, কোন বন্ধনই দৃঢ় নয়, কোন নিয়মই রক্ষণীয় নয়, কোনো পথই জঘন্য নয়! তাহাদের বিশ্বাস, যে আত্যন্তিক ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বাংলার লোক অলস, অকর্ম্মণ্য এবং দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া হিন্দু জাতি মর-মর; ধর্ম্মের 'সূক্ষ্ম তত্ত্ব' জাতির মজ্জা হইতে চলিয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে শুষ্ক, জীর্ণ বিকৃতায়তন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপী কঙ্কালখান! এইরূপ রোগ নির্ণয় করিয়া তাহারা ব্যবস্থা স্থির করিয়াছে, যে ধর্ম্মকে এখন মাথায় রাখিয়া কর্ম্মকে বরণ করা হউক। তমোগুণে দেশ ভরিয়া গিয়াছে; অতএব রজঃ শক্তির আবাহন কর। ভগবান যদি থাকেন, তবে তিনি পটেই আঁকা থাকুন; তাঁহার সহিত আমাদের এখন কোন বাধ্য-বাধকতা অনুমিত হইতেছে না, অতএব তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবার দিন এখন গিয়াছে! এই সকল সরল, সুগভীর তত্ত্বের মীমাংসকদিগকে প্রমাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাসের বাক্য পাঠ করিয়া শুনায়; মিল্, হেগেল্, স্পেন্সার প্রভৃতি মনীষি-দিগের গবেষণা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যায়! হিন্দুর ঘরের ছেলের মুখে, কর্ম্ম-রহস্য ও সামাজিক তত্ত্বের এমন অকাট্য প্রমাণ ও সরল মীমাংসা শুনিতে হইবে, তাহা আগে কে ভাবিয়াছিল!

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের আমাদের জাতীয় ইতিহাস মনে পড়িতেছে। পাশ্চাত্য 'চাকচিক্যের' মোহ যখন এই বাংলাদেশে শ্রাবণের ধারার মত অবিরাম বর্ষিয়াছিল, তখন দেশের বড় বড় রথিবৃন্দ ঐরাবতের মত সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন; এমন কি সুধী-সজ্জনদিগের মস্তিষ্কও ঐ মদিরায় কলঙ্কিত হইয়াছিল; রক্ষা পাইয়াছিলেন, কেবল সুদূর পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা; নিরক্ষর, ভক্তিপ্রাণ, নির্ভীক ব্রাহ্মণ সন্তানেরা জাতির মাথার মাণকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মহারথীরা স্থির করিয়াছিলেন, যে হিন্দুজাতির সনাতন ভিটেটিকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া, বনেদ্ হইতে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা একান্ত আবশ্যক; তাই তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আঁতুড় ঘর পর্য্যন্ত, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, সকল বিষয়েরই সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিদ্রোত্থিত জীবনের উদ্যম, উৎসাহ, প্রচণ্ড ইংবঙ্গ বক্তৃতা, সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি পদাঘাত ও তীব্র কশাঘাতের ইতিহাস মনে পড়িলে এখনো বুক কাঁপিয়া উঠে। তাঁহারা কতকগুলি হিন্দু ভাবকে বৈদেশিক শ্রীসম্পদে ভূষিত করিয়া, পাশ্চাত্য মজ্‌লিসে গৌরবের সহিত বাহির করিয়াছিলেন; এবং যে ভাবরাজি পাশ্চাত্য বিদ্যাবুদ্ধির চক্ষে অপ্রিয় অশ্লীল অথবা নিষ্প্রভ ঠেকিয়াছিল, সে গুলির ঘাড় ভাঙ্গিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, মহিলানীতি, কোন বিষয়েই হাত দিতে সঙ্কুচিত হন নাই, এক একটীকে ধরিয়া পাশ্চাত্য আদর্শ-নদীতে ডুবাইয়াছেন এবং মৃতপ্রায় করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে যে দুর্দ্দমনীয় বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, কটাক্ষ সুরদেবীর ছবি সদাসর্ব্বদা আলোকে, আঁধারে, স্বপ্নে, জাগরণে, নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত, তাহার মোহন মূর্ত্তি মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিবার শক্তি, সে যুগের কম লোকেরই ছিল! সে ধাক্কা সাম্‌লাইতে সকলকেই অল্প বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছে; বহু যুগের সাধনালব্ধ সংযম-রত্ন হারাইতে হইয়াছে। সে মোহ এখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই, সে স্বপ্ন এখনো একেবারে তিরোহিত হয় নাই; এখনো কাহারো কাহারো চিন্তা, ভাব, চাল-চলন ঐ রঙ্গে রঞ্জিত; নয়ন ঐ নেশার ঘোরে বিকৃত।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের সংস্কারক দলের এবং আধুনিক শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে মতের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এ যুগের যুবকেরা কথায় বার্ত্তায় হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। কারণ হিন্দুর ধর্ম্ম, বেদান্তধর্ম; এবং বেদান্ত যে ধর্ম্মের অস্ত্র, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণ নিঃসন্দিগ্ধরূপে জগতে

প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মনের ভাব এই যে "ধর্ম্মচর্চ্চা দুই চারিজনে ভাল করিয়া করুন ; তাঁহাদের চর্চ্চার ফল সুযোগ ও সুবিধামত শুনা যাইবে। আপাততঃ ধর্ম্ম করিবার সময় নাই, আগে উদরান্ন সংস্থানের চিন্তা করা দরকার হইয়া উঠিয়াছে।" পূর্ব্বাপরে আচরিত সামাজিকতা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা বিশেষ অগ্রগামী বা উৎসাহী নয়, একেবারে অমনোযোগীও নয়। যাহা চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ; এবং যাহা দশে মানে, তাহারাও তাহা মানে। দশে যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দৃঢ় স্থাপন করে, তাহারা বিশেষ বাধা দিবে না ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির অভ্যুদয় বা পুনঃ স্থাপনা হইলে তাহারা আনন্দিত হইবে, এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণীরা যদি সকল গণ্ডী ছিন্ন করিয়া সমন্বয় করিয়া ফেলেন, তবে সে কি সুখের দিন হইবে, ছেলেদের এই কথা। কিন্তু তাহাদের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিলে বেশ বুঝা যায়, যে প্রবল প্রতাপান্বিত নানক সম্প্রদায়ের বিপুল বৈভবের পরিচয় পাইয়া, আত্মহারা যুবকবৃন্দ এক হাতে হিন্দুর পুরাতন প্রথাগুলি সংস্কারবশতঃ ধরিয়া আছে, আর অপর হাতে বিড়ালাক্ষী, বিধুমুখী পাশ্চাত্য লক্ষ্মীর গাউন ধরিবার জন্য লালায়িত। তাহারা আমাদের ভাবও চায়, উহাদের ভাবও চায় ; মুখে বলে এস ভাই, এই উভয় ভাবের মিশ্রণে আমরা একটা বড় জাতিতে পরিণত হই। কিন্তু ইহাদের অন্তরের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য জাতিদিগের মত সর্ব্ব গুণান্বিত জাতি এ পর্য্যন্ত ইতিহাসে খুঁজিয়া মিলে না—মিলিবেও না ; উহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও সভ্যতা যদি আপনাদের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা যায়, তবেই আশা ; নচেৎ অন্যান্য পুরাতন জাতির ন্যায় আমাদেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্য জাতির হাব-ভাব, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার পঞ্চাশ বৎসর অনুকরণ করিয়া, পাইলাম—ঘৃণা—উভয় পক্ষ হইতে! জগৎ এক সুরে বলিয়া দিল—শতবার ধৌত করিলেও কয়লার মলিনতা দূর হয় না। দেব-দেবী, পূজাপদ্ধতি, আচার ব্যবহার, কুল মান যাহাদের জন্য ত্যাগ করিলাম, তাহারা ত' দু'টা মিষ্ট কথা বলিয়াও তুষিল না! তাহাদের শ্লেষবাক্যে ব্যথিত হইয়া সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মকে মনের মত করিয়া, জগতের আদর্শ ধর্ম্মে পরিণত করিয়া দিলাম ; তবু কেহই আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল না! পাশ্চাত্য জাতি বিজ্ঞানের বড় ভক্ত জানিয়া, হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থরে থরে তাহাদের সম্মুখে সাজাইয়া দিলাম।

তবু আশা মিটিল না, দুর্দ্দশা ঘুচিল না, নীচতা দূর হইল না। পাশ্চাত্য স্রোত-সমুদ্রে সপরিবারে ঝাঁপ দিয়া দেখিলাম, পার্থক্য সম্পূর্ণই রহিয়া গেল ;—মাঝে পড়িয়া কুল হারাইলাম! সংস্কারক সম্প্রদায়ের এই কাতরোক্তি—তাহাদের উত্তরাধিকারী আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ করিতেছি।

এই দুঃসময়ে সুদূর পল্লীগ্রামস্থ এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-সন্তান কলিকাতার নিকটে এক বাগানে সনাতন ধর্ম্মের পেটিকাটি উন্মুক্ত করিয়া, শিক্ষিত সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। ছিন্ন চীরাবৃত বহুকালের পুরাতন পেটিকার মধ্যে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমণি থাকিতে পারে, তাহা পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিমুগ্ধ হিন্দুসন্তান কখনো কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, যে হিন্দুর হিন্দুয়ানীই তাহাকে দারুণ দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়াছে ; অতএব যতদিন হিন্দুয়ানীর ছায়ামাত্র থাকিবে, ততদিন সুখের মুখ দেখা দুরাশা মাত্র। তা'ই তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বিদেশী সাজিতে ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুই চারি জন যুবক, ব্রাহ্মণের স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান এবং অমানুষিক সাত্ত্বিক প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই সময় হইতেই স্রোত ফিরিয়াছে। তারপর পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় সন্তান মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ যখন হিন্দু ধর্ম্মের গৈরিক নিশান সুদূর আমেরিকায় বিজয়গর্ব্বে উড্ডায়মান করেন, তখন এই অকূলে ভাসমান দরিদ্র হিন্দু জাতি, ধরিবার তৃণ দেখিতে পাইল ; বহু যুগের পর তাহার ম্লানমুখে হাস দেখা দিল। সে যে গৌরব করিয়া জগৎকে দেখাইবার মত অমূল্য সামগ্রীর একমাত্র অধিকারী, তাহা জানিয়া অপার্থিব আনন্দে তাহার মনপ্রাণ পূর্ণ হইল *

একদিকে নৈরাশ্য, লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান—আর একদিকে অভয় আত্ম-সম্মানবোধ, এই দুই ভাবের ভিতর দিয়া বাংলা জাতি আধুনিক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের চক্ষের সম্মুখে এখনো সকল প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি জীবন্ত বিদ্যমান। তবে প্রথম যুগের সে উন্মাদনা, সে তীব্র মাদকতা এখন আর নাই,—বন্যার জল নামিয়া গিয়াছে। এখন সকলেরি তৈজস পত্রের দিকে লক্ষ্য পড়িতেছে ; এখন স্থিরভাবে ঘর দ্বার সাম্‌লাইবার সময় আসিয়াছে। ভগবানের সংসারে কোন ভাবই বৃথা যায় না। বিপুল বন্যার 'পলি' পড়িয়া

---

* স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্ম্মতথ্য জনসাধারণে প্রচার করেন, তাহা সত্য। কিন্তু Theosophical Society হইতে মূল রহস্যগুলি জগতে উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পং সঃ—

গিয়া যে সার প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ফলে জাতির মধ্যে একটা যে তীব্র জ্ঞান ও কর্ম্ম-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। সকলেই বলিতেছে—'জ্ঞানলাভ কর, তম, আলস্য, জড়তা দূর কর; মানুষের মত খাটিয়া খাও।' এখন জ্ঞান ও কর্ম্ম সমন্বয়ের যুগ আসিয়াছে।

এদেশে অধুনা প্রচলিত ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের সোণার চাঁদ ছেলেদের যৌবনের সকল স্ফূর্ত্তি, সমস্ত শক্তি অপহৃত করিয়া, তাহার বিনিময়ে ছাই ভস্ম দর্শনের কচ্‌কচি আর বিজ্ঞানের সামান্য দু' একটা প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া সংসারে কঙ্কালমাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। তাহারা হিন্দু ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছে মাত্র; তাহার সহিত পরিচয় করিবার সময় পায় নাই। কাজেই তাহাদের উদ্দেশ্য স্থির নাই, মতের ঐক্য নাই, ধারণার স্থৈর্য্য নাই। যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বহুকাল পূর্ব্বে মীমাংসা করিয়া সমাজ মধ্যে আদর্শ জীবন স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন, আজ সমাজের এই বিশৃঙ্খলার দিনে নূতন করিয়া আবার তাহাই শিখাইতে হইবে! দেশের দুঃখে সত্য সত্যই যদি কাহারো প্রাণ ব্যথিত হয়, যদি সমাজের কল্যাণ করিবার জন্য কেহ জীবনের সকল সাধ ও আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেশকে চিনিতে হইবে; দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে হইবে, দেশের পল্লীগ্রাম, নগর, তীর্থ ও দেবালয় সমূহ দেখিতে হইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ও তাহার গতি প্রভৃতি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কেবল পাশ্চাত্য দেশসমূহের ইতিহাস পড়িয়া, ঘরে বসিয়া কল্পনা সাহায্যে একটা ধারণা করিয়া লইয়া দেশের কার্য্য করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।

ভারতবর্ষের একটী তীর্থ বা পুরাতন গ্রাম যদি হিন্দুর চক্ষে কেহ দেখে, হিন্দুর প্রাণ লইয়া কেহ বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে সে দেখিবে—যুগ যুগ ব্যাপিয়া কি মহান্ সুন্দর পবিত্র আশ্রমধর্ম্ম এই জাতির অন্তঃস্থল অধিকার করিয়া বিরাজমান ছিল এবং আজও আছে। সে দেখিবে যে এই হিন্দু জাতি রাষ্ট্রীয় হিসাবে যখন জগতের শীর্ষস্থানে আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, তখন তাহার প্রাণপক্ষী ঊর্দ্ধাকাশে মুক্তবাতাসে উড়িতে উড়িতে যে বৈদিক মন্ত্র গান করিত, আর এই দুর্দ্দিনেও কাঙ্গালের বেশে সেই জাতি সাংসারিকতার বদ্ধ পিঞ্জরে বসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে সেই মন্ত্রই বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিতেছে। প্রভেদ ঘটিয়াছে আবরণের; ভাবের ঘরে চুরি হয় নাই, প্রভেদ হইয়াছে সুর গ্রামের। মন্ত্রগুলি

এখনো জীবিত—এখনো স্পন্দনশীল। আছে সব, কেবল ভস্মে ঢাকা পড়িয়াছে মাত্র। তখন সুর ছিল গম্ভীর, তেজঃপূর্ণ, প্রতি স্পন্দনে ভাব ফুটিয়া উঠিত; প্রতি নিশ্বাসে পবিত্র গন্ধে দিক্ আমোদিত হইত। এখন সুর বড় মৃদু, প্রায়ই করুণোদ্দীপক, নিভৃতে, গুহার মধ্যে ধ্বনিত হয়, এখন ভাব চাপিয়া রাখিতে হয়, কাজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। তখন নটবর শ্যামসুন্দর বংশীধ্বনি করিয়া ভক্তের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন; এখন তাঁহাকে সাধকের হৃদয়-মন্দিরে লুকোচুরি খেলিয়া বেড়াইতে হইতেছে;—প্রভেদ এই মাত্র। এখনো ঐ বিরাট্ হিন্দু জনসঙ্ঘ প্রাতঃসন্ধ্যা শঙ্খধ্বনি সহকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তি ইষ্টাভিমুখী করে; দরিদ্র, অন্ধ, আতুরকে এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করে, গুরু, সাধু, ফকিরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, এবং বংশে এক ব্যক্তি সিদ্ধ হইলে চতুর্দ্দশ পুরুষ চরিতার্থ হইল মনে করে। এখনো এই জাতির মধ্যে সহস্র সহস্র লোক সাধন উদ্দেশে সকল পার্থিব সাধ আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিয়া, অতি কঠোর যোগপথ অবলম্বন করিয়া আছে; তাহাদের এক একটী জীবনের বিপুল চেষ্টা ও প্রাণান্তক সাধনার ব্যাপার দেখিলে, বড় বড় বীরের বীরত্বকাহিনী তাহার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হয়। এই ভীরু, মুগ্ধ, অলস, অকর্ম্মণ্য, হিন্দু,—যাহার দুঃখে আমাদের প্রাণ 'অবসর মত' কাঁদিয়া থাকে, এই দুর্ব্বল, মৃতপ্রায় হিন্দু যখন ভগবান্ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহার হৃদয়-যন্ত্রে যখন নামের বাজনা বাজিয়া উঠে, তখন জড়তা ভয়ে পলাইয়া যায়, স্বয়ং যম তার দিকে ঘেঁসিতে সাহস করে না। সে সাধনা, সে উন্মাদনা সে ভাব-প্রবণতা জীবে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর জীবন এই সুরে বাধা, এই মন্ত্রে তাহার দীক্ষা; ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসে; অন্য কোন বিষয়ে তাহার উদ্যম, উৎসাহ, বল বুদ্ধি এমন তীব্র বেগে প্রকাশ পায় না। লক্ষ যুগ ধরিয়া হিন্দু সদসৎ বিচার করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যা অবিদ্যার স্বরূপ সাধনা করিয়াছে; যাহা দু'দিনের জন্য, যাহা কালে লয় পাইবে, সেই আপাতঃ-মনোহর প্রেয় বস্তুকে তাহার মন অসৎ জ্ঞানের বন্ধন জানিয়া ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। হে বিদ্বন্, তোমাদের দুদিনের ভাবের ছটায়, ফেনায়িত কথার মোহে, তাহার গতি কি ফিরিয়া যাইবে? তাহার লক্ষ বৎসরের সাধন-পথ কি রুদ্ধ হইয়া যাইবে?

এই মহান্ আদর্শে যে জাতির দৈনিক জীবন গঠিত, যাহার শাস্ত্র বর্ণে বর্ণে, ছত্রে ছত্রে অমৃতের উৎস খুলিয়া রাখিয়াছে, যাহার সমাজ এই দুর্দ্দিনেও চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রসব করিতেছে, সে জাতিকে ক্ষুদ্র কাচখণ্ড

দেখাইয়া কাঞ্চনের ভ্রমে পাতিত করিবার চেষ্টা কি বিফল হইবে না? জগতে কোন্ জাতি এই আদর্শকে জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে এমন করিয়া মাথায় করিয়া রাখিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি এই তেজের নিকটে মাথা হেঁট না করিয়া পারিয়াছে? তবে কেন আমরা আদর্শকে খাটো করিতে চাই? স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সাধ করি? সমাজদেহ ব্যাধি-দুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার চিকিৎসকের বা ধর্ম্মের গৃহে যদি অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া থাকে, ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দাও; যেখানে মন মুখ এক না দেখিবে, ভ্রমে সত্ত্ব ভ্রম দেখিবে, শাঁস ফেলিয়া খোলা লইয়া টানাটানি দেখিবে, সেখানে তোমার সাধন দৃষ্টির, তোমার ব্রহ্মচর্য্যের, তোমার শাস্ত্রজ্ঞানের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। ভাণের কৃত্রিম পোষাক টানিয়া ফেলিয়া দাও। বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ কর, শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা কর। আদর্শকে খাটো করিবার কল্পনা মনেও আনিও না। যতদিন সাধনার দ্বারা, শাস্ত্র জ্ঞানের দ্বারা এই বৃহৎ কর্ত্তব্য ভার স্কন্ধে লইবার সামর্থ্য না আসে, যতদিন চাপরাস না পাও, আদেশ না আসে, ততদিন সাধুবাক্য মহাজনের পন্থা মানিয়া যাও অনুসরণ কর। সেবা ব্রতে মন প্রাণ ঢালিয়া দাও।

যতীন —

কাম]

আকিঞ্চন।

১। এত দিন গেল চ'লে, মিছে শুধু কোলাহলে,
হ'ল নাকো নাম করা তাঁ'র।
সে প্রেমে নাহিক তৃষা,— নাহি সে চরণে আশা,
অসীমেতে নাহি ধায় আর।

২। নাহি ধৈর্য্য পদে পদে, না পূ'রল ক্ষুদ্র সাধে,
বিধাতারে দুষি বারে বারে,
তবুও দেখি না, স্বামি! কতখানি দিলে তুমি
প্রতিদান নাহি পেলে ফিরে॥

৩। তুমি চাও বক্ষে নিতে, আমি সরি তাহা হ'তে,
কি অন্ধ, এ হৃদয়-লোচন!
ক্ষম নাথ সব দোষ, দাও শক্তি, নাশ রোষ,
কর দেব এ মোহ মোচন॥

শ্রীমতী লীলাদেবী।

কাম]

সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে।

'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং, বিদ্যাবধূজীবনং।
লাবণ্যাম্বুধিবর্দ্ধনং, প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং।"

১।— কাহার ভকতি করি'ছ প্রচার?
পুরাণ বঙ্গে সুখেরি রঙ্গে, বাজিত যে ভেরী পবন সঙ্গে
সেই ভেরীনাদ, সেই সমাচার;—
ধরমের ভেরী সেই গো! আবার!

২।— সেই ভেরী আজি জাগিছে আবার!
বৈষ্ণবগণে বঙ্গ অঙ্গনে, মিলাইত যাহা বিশ্ব বন্দনে,
ছিল্ যার অপার সুখের আধার—
আজি কি তাহারি মধুর সঞ্চার!!

৩।— মধুর হিয়ায় মধুর সঙ্গীত!
প্রাণেরি উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ হুতাশে, মিশায়ে আপনা আশ্বাস আশে
মানব গাহিছে ভক্তির গীত,—
কোথা সে ভক্তি, কোথা সে অতীত?

৪।— তটিনীর কূলে তটিনীর সনে,
কীর্ত্তন জাগে কীর্ত্তিপরাগে ধবলিয়ে কাল নিরাশারি দাগে,
উপরে তুলিয়ে মানবেরি মনে,
পাপ তাপ হ'তে ভুলায় আপনে!

৫।— ভুলায়ে নিয়ত মোহিত মানবে—
ঐ তরঙ্গ ছাইল অঙ্গ, সুখের লহরে ভাসিল বঙ্গ,
ভাসায়ে অসার ভবের বিভবে,
জাগায়ে চিতের মৃত কলরবে।

৬।— কলরবে ভরা সাঁঝের সময়ে,
আনিয়ে শান্তি, হৃদয় ধ্বান্ত নাশিয়ে, কুটিল অমল কান্ত,
মলিন মরতে পাশিল অভয়ে,
মরমে তুলিল ভকতি বিস্ময়ে

৭।— ফুটিয়া উঠিয়া তারকা বিস্ময়ে,
আপন শব্দ শুনিয়ে স্তব্ধ, মিটিমিটি দিঠি করি' আরব্ধ,
রহিয়া চাহিল আকাশ অবশ আলয়ে,
শান্তি জাগিল শান্তি আশয়ে।

৮।— শান্তিতে মজি নাচিল হৃদয়,—
ছিন্ন বাধন মর্ম্ম তখন, ভুলিল নিখিল আপন বেদন,
ঝরিল তা' হ'তে, কোমলতাময়
অমিয়-মাখান' ভাবের উদয়।

৯।— এ অমিয়ে ভরা ছিল ত' মানব ;—
অলস বঙ্গে ঘটিত রঙ্গে, সুখের সদনে ভব-তরঙ্গে,
কত ভক্তির লীলা অভিনব,
কত মহত্তের মহাভাব সব !!

১০।— সে ভকতি কোথা, কোথা সে অতীত ?
শান্তির ধার স্বর্গ দুয়ার, হৃদি ফুলহার ভক্তি অপার,
কোথা গেল বল, কোথা বা রাজিত,
বলনা কোথায়, কোথা সে অতীত ?

১১।— অতীতের স্মৃতি পশিল হিয়ায় —
কোথা 'চৈতন্য' ভকত ধন্য, 'প্রসাদ,' সাধক, কোথা বা অন্য,
কোথা সেই যুগ, ফুটিত যাহায়,
ভক্তি-আকৃতি মোহন কায়ায়।

১২।— দরিদ্র বাঙ্গালা আপনা ভুলেছে—
আপন রত্নে, পরের যত্নে, ল'য়ে তুলে' দিতে মোহের স্বপ্নে,
শিখেছে ! তা' বলে' নাহি হারায়েছে
কভু ধর্ম্মভাব, বিমুখ হ'য়েছে।

১৩।— বাজুক বঙ্গে সে ভেরী আবার !
শান্ত নিস্বন, ব্যাপ্ত গগন, আমাদের মন ভক্তিপ্রবণ,
চিরকাল তরে বাজুক আবার,
হউক সাধের ভক্তি প্রচার !!

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।)

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এমনই ভাবোন্মাদকর এক পবিত্র সময় বিরাজমান ছিল, যে সময় ভারতীয় মনীষিমণ্ডলীর মানসাকাশে বৈদিক-ধর্ম্মময় শারদায় পূর্ণ শশধরের বিমল স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে নিরন্তর সমুদ্ভাসিত ছিল; কখনও তাহার অবসান ছিল না। সংশয়-কুজ্ঝটিকায় দিগন্ত আবৃত ছিল না; বিতর্ক-বাত্যার বিষম বিবর্ত্তে প্রখর রজঃ-পসর ছিল না; বিতণ্ডা বাদরূপ মহামেঘের গভীর গর্জ্জনে গগনতল প্রকম্পিত হইত না; প্রবল প্রতিপক্ষরূপ ভীষণ অশনি নিপাতেরও আশঙ্কা ছিল না। পক্ষান্তরে ঈশ্বরে ভক্তি, বেদে বিশ্বাস, জন্মান্তরে দৃঢ় প্রত্যয় এবং গুরু-বাক্যে অচলা শ্রদ্ধা দৃঢ়বদ্ধ ছিল। সেই স্মরণীয় পবিত্র সময়ে ভারতের বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলেই অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার এবং ধর্ম্মরত্নের অপূর্ব্ব-আকর বেদরূপ কল্পতরুর স্নিগ্ধ শীতলচ্ছায়ায় বসিয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে নিজ নিজ অভীষ্ট ফল লাভে পরিতুষ্ট ও কৃতার্থ হইত। কাহারো প্রতি তর্কের কর্কশ কশা-ঘাতের আবশ্যক হইত না। কিন্তু দুরন্ত কাল কাহারো মুখাপেক্ষা করে না; সেই দুর্নিবার দুরন্ত কাল-চক্রের অমোঘ আবর্ত্তনে ভারতবাসীর সে সুখের দিন ফুরাইল, সে সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল একে একে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সংশয়ের সূক্ষ্ম রেখা দেখা দিল; আবার তাহাই প্রবল জলদজালে পরিণত হইয়া বিষম দুর্দ্দিনের সঞ্চার করিল। প্রশান্ত সাধু-হৃদয়ও কুতর্ক কালিমায় মলিন হইতে লাগিল। অবশেষে বিতণ্ডাবাদরূপ প্রবল ঝটিকা সম্পাতে, দিন দিন, নিত্য নূতন নাস্তিকতার সৃষ্টি করিয়া চিরাচরিত সরল ধর্ম্মপথ পঙ্কিল ও দুর্গম করিয়া তুলিল, এবং খরতর বেগে দেহাত্মবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বেদ-তরুর শাখা সমূহ ছিন্ন ভিন্ন, বিপর্য্যস্ত ও শ্রীহীন হইল। তাহারই ফলে প্রশান্ত বারিধির ন্যায় স্বভাব, শান্ত, দূরদর্শী ঋষি-সমাজ নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা প্রাণপ্রিয় সনাতন ধর্ম্ম সংরক্ষণে বদ্ধ পরিকর হইয়া, আগন্তুক নাস্তিকা-ব্যাধি বিনাশের উপায়োদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। রোগ বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে কোন ফল হয় না। তাই সুনিপুণ চিকিৎসককে অগ্রে তদ্বিষয়ে যত্নপর হইতে হয়। ঋষিগণও যখন বুঝিতে পারিলেন যে, এখন দেশে গুরুশিষ্য-ভাবের অভাব উপস্থিত হইয়াছে, সরল সত্যকথায় কাহারো হৃদয়

অধিকার করা সম্ভব নহে, তখন গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ রোগের উপযুক্ত ঔষধ বোধে, যুক্তি-তর্ক-সমন্বিত বিবিধ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে

দর্শনের প্রাচীনতা

বলা আবশ্যক যে, দর্শনশাস্ত্রগুলি গৌতমাদি ঋষির অভিনব সৃষ্টি হইলেও, দার্শনিক তত্ত্ব বা দার্শনিক বিচার-প্রণালী এদেশের চিরন্তন সামগ্রী। অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ—জীব, ব্রহ্ম, বন্ধ, মোক্ষ এবং জন্ম-জন্মান্তর চিন্তা—বিশেষতঃ জীবের আত্যন্তিক দুঃখ বিমোচনের উপায় উদ্ভাবনই বর্ত্তমান দর্শন সমূহের জীবন বা প্রধান উদ্দেশ্য। বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে, অনাদি-সিদ্ধ বেদের উপনিষদ্ ভাগের মধ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই। দেখিতে পাই, প্রায় অধিকাংশ উপনিষদের মধ্যেই দর্শনের সূক্ষ্ম সূত্রগুলি অত্যধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। এ কথার অনুকূলে ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠক আমরা বিশেষ উদাহরণরূপে উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া মনে করি। তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সময় ও সমাজের অবস্থানুসারে তৎকালে নিত্য সত্য তত্ত্ব-রত্ন গুলিকে অকারণ কর্কশ তর্কজালে জড়িত করা আবশ্যক ছিল না; তাহার পর যখন দেশে ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল, শান্তশীল ঋষি সমাজেও উদ্বেগ বহ্নির তীব্র তাপ অনুভূত হইতে লাগিল, তখন—স্বভাব সুন্দর সুবর্ণ পিণ্ডকে যেমন উত্তাপ সহযোগে গলাইয়া নয়ন মনোহর নানাবিধ অলঙ্কারে পরিণত করা হয়, তেমনি দূরদর্শী ঋষিগণও উত্তেজনাবশে উপনিষদের সেই দার্শনিক তত্ত্ব গুলিকে নানা ছাঁচে ঢালিয়া আবশ্যক মত নানাকারে পরিণত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ছয়খানি দর্শনের সৃষ্টি করিলেন। আমাদের কথা ঋষি-সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি মাত্র; তাঁহারা বলিয়াছেন—"শ্রোতব্যঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ।" অর্থাৎ বেদোপদিষ্ট বিষয়ে যখন শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সংশয় সমুদ্ভিত হয়, তখন সেই সংশয় অপনোদনের জন্য মননের আবশ্যক হইয়া পড়ে। মনন অর্থে অনুকূল তর্কদ্বারা প্রতিকূল তর্ক খণ্ডন করা; যতক্ষণ প্রতিকূল তর্ক নিচয় খণ্ডিত না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই উপদিষ্ট বিষয়ে কাহারো দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। সেই শ্রুত্যর্থে দৃঢ় বিশ্বাস সমুৎপাদন করাও দর্শন শাস্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দর্শন শাস্ত্র ছয়খানি হইলেও মূলতঃ তিনখানির অধিক নহে;—( ) ন্যায়দর্শন দুই—গোতম কৃত ও কণাদ কৃত। (২) সাংখ্য-দর্শন দুই—কপিল কৃত নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন, ও পতঞ্জলি কৃত যোগ-

দর্শন। (৩) মীমাংসা দর্শন দুই—জৈমিনি কৃত পূর্ব্বমীমাংসা, ও ব্যাস কৃত উত্তর মীমাংসা। উক্ত তিন শ্রেণীর দর্শনের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহার দ্বারা উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণের পথও অনেকটা সুগম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা নিজ নিজ দর্শনে লোকের অধিকারানুসারে ক্রমশঃ স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম তত্ত্বের উপদেশ দ্বারা লোককে আত্মদর্শনে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন।

দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণ

প্রথমেই বলিয়াছি যে, রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়; দর্শন-কর্ত্তা ঋষিগণও তাহাই করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম দেখিলেন,—দেহাত্ম-বাদ ও স্বভাব-কারণতা-বাদের উপরেই নাস্তিকতা রূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত; সেই দুইটি ভিত্তি বিনষ্ট করিলেই নাস্তিকতা নিরস্ত হইতে পারে; অথচ প্রথমেই অতি সূক্ষ্ম পরতত্ত্বোপদেশে লোকের হৃদয় আকর্ষণ করা সম্ভবপর হইবে না। তাই তিনি ন্যায় দর্শনে প্রধানতঃ দেহাত্মবাদ খণ্ডনে এবং তদনুকূল তর্ক-বিন্যাসে অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম এইমাত্র বুঝাইয়াই নিরস্ত হইলেন যে, দেহ, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অচেতন জড় পদার্থ সমূহ আত্মার ভোগ্য ও ভোগ-সাধন মাত্র,—আত্মা নহে; আত্মা স্বয়ং নিত্য চেতন, কর্ত্তা, ভোক্তা, ইহলোক পরলোকগামী এবং দেহ ভেদে-ভিন্ন ভিন্ন; দেহ নাশেও তাহার নাশ হয় না, ইত্যাদি তিনি আপনার প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমূহ সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের সাহায্যে বিপক্ষ পক্ষ পরাস্ত করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন।

অতঃপর, মহামুনি কণাদ দেখিলেন মহর্ষি গোতমের কথায় দেহাত্ম-বাদ বিধ্বস্ত হইলেও নাস্তিক-নন্দনগণের অভিনন্দিত স্বভাব-কারণতাবাদ খণ্ডিত হইল না। তাই তিনি গোতমের অনুক্তাংশ পরিপূরণের জন্য পরমাণু-কারণ-বাদ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন,—একমাত্র বস্তু-স্বভাব কখনই এই জগৎ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। স্বভাব নিজে অচেতন, ভাল মন্দ বিচারশক্তি তাহার নাই, সুতরাং দেশ কাল নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদাই একাকার কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু জগতে ত' তাহা কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ পরমাণু পুঞ্জের স্বভাবটী, সংযোগ না বিয়োগ? অথবা উভয়ই? কেবল সংযোগ-সাধন করাই পরমাণুর স্বভাব হইলে কস্মিন্-কালেও তাহার বিয়োগ-কার্য্য ধ্বংস হইতে পারে না; কারণ বস্তু কখনও

নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে না; আর বিয়োগ স্বভাব বলিলে ত' আদৌ সৃষ্টিরই উপপত্তি হয় না। তাহার পর সংযোগ-বিয়োগ উভয় স্বভাব বলিলেও পরস্পর বিবাদের ফলে উহাদের আত্মরক্ষা করাই দুর্ঘট; কার্য্য সম্পাদন করা ত' দূরের কথা। সুতরাং স্বভাব-কারণতা বাদ কেবল কৌতুহলমাত্র।

অতএব জীবের অদৃষ্ট-সহচর, ঈশ্বর-প্রেরণাধীন, পরমাণু পুঞ্জই জগতের আদি উপাদান কারণ; এবং পরমাণুগত 'বিশেষ' নামে যে এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহা দ্বারাই পরমাণুর কার্য্য-বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও দেহাতিরিক্তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গোতমের মতে মত দিয়া, মহামুনি কণাদও বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মহর্ষি কপিল যখন দেখিলেন, মহর্ষি গোতম ও কণাদ প্রণীত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রভাবে লোকের নাস্তিকতা হ্রাস পাইয়াছে, দেহাত্ম বুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে, এবং আধ্যাত্ম চিন্তারও প্রবৃত্তি আসিয়াছে, তখন তিনি সময় ও সুযোগ বুঝিয়া আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। তখন তিনি বিবেক-জ্ঞানোপযোগী আত্মতত্ত্বের উপদেশে মনোযোগী হইলেন; স্বপ্রণীত সাংখ্য-দর্শনে বুঝাইয়া দিলেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত আত্মাকে নিত্য, চেতন, কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া জানিলেই প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জানা যায় না। আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত সত্তা, কিন্তু চৈতন্যবান্ নহে—চৈতন্যস্বরূপ, এবং কর্ত্তা ও ভোক্তা নহে—উদাসীন নিষ্ক্রিয়; কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম্মগুলি অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। এই অজ্ঞান বা অবিবেকই জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল। এই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে প্রকৃতি হইতে আত্মার পার্থক্য বা বিবেক সাক্ষাৎকার উপলব্ধি করিতে হইবে; আর সত্ত্ব-রজস্তমো গুণাত্মিকা পরিণামশীলা নিত্যা প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বৈশেষিক পরিভাষিত পরমাণু পুঞ্জ বস্তুর তন্মাত্র স্থানীয় অনিত্য পদার্থ; সুতরাং মূল কারণ নহে। অধিকন্তু আপাতঃ রমণীয় নাস্তিক্য-বাদে বিমুগ্ধ মানব মণ্ডলীর মনস্তুষ্টির জন্য, তাহাদেরই মতানুসারে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত বাদ দিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু বিবেক-জ্ঞানের একান্ত উপযোগী আত্মার নিত্যত্ব, বিভুত্ব ও জন্মান্তর বাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। সে সমুদয় বিষয়গুলি তিনি অতি উত্তমরূপে সংস্থাপিত করিলেন। কপিল এখানে অবসর গ্রহণ করিলেন।

এইবার মহামুনি পতঞ্জলির পালা। তিনি দেখিলেন এখন কপিলের সিদ্ধান্তে

কাহারো সন্দেহ নাই, সকলেই তাহার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিতেছে। এখন কপিলের অনুক্ত বা সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণে প্রথমেই তিনি বিবেক-জ্ঞানোপযোগী যোগসিদ্ধির অন্যতম উপায়রূপে ঈশ্বরের অবতারণা করিলেন। তখনও একেবারে পরতত্ত্বোপদেশের উপযুক্ত সময় হয় নাই, মনে করিয়া ইতরজীব-সাধারণ ক্লেশকর্ম্মাদিদোষ-সংস্পর্শ-শূন্য ঈশ্বরকে 'পুরুষ বিশেষ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, এবং বিস্তৃতভাবে যোগ, যোগসাধন ও যোগফল নিরূপণ করিয়া যোগদর্শন শেষ করিলেন।

এইরূপে ন্যায়াদি দর্শনের প্রচার বাহুল্যে দেশে যে সময় নাস্তিকতার খর-স্রোতঃ ক্রমে ক্রমে মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল; শনৈঃ শনৈঃ জন্মান্তর চিন্তা আসিয়া লোকের হৃদয়কে অধিকতর কাতর করিতে লাগিল, এবং দেহাত্মবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া গেল; সেই সুসময়ে মহামুনি জৈমিনি মীমাংসা-দর্শন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মীমাংসামাত্রই সংশয় সাপেক্ষ; যেখানে সংশয়, সেখানেই মীমাংসার আবশ্যক হয়। জনসাধারণ অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইলেও বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে তখনও সন্দিহান্ ছিল; তখনও "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সর্ব্বংখল্বিদং" প্রভৃতি বেদবাক্যের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসামর্থ্য নিবন্ধন, বিশেষতঃ গুরু শিষ্য সম্প্রদায়ের বিরলতা বা বিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন, বেদবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে মন্দোৎসাহ ছিল। তাই তিনি মন্দমতি লোকদিগকে ক্রিয়ানিরত করিবার ইচ্ছায় তাহাদের মনোবৃত্তি অনুসারে বুঝাইলেন যে, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বা দানর্থক্যমতদর্থানাম্" অর্থাৎ প্রচুর ফলপ্রদ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের অভিপ্রেত। যে সমস্ত বাক্যে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার উল্লেখ নাই, যেমন "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি সে সমস্ত বাক্য নিরর্থক,—বেদের অনভিপ্রেত। সুতরাং সে সমুদয় অনর্থক কথার অর্থ চিন্তায় ব্যাকুল হইবার আবশ্যক নাই; "তোমরা "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বুঝিয়া তদনুযায়ী ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহাতেই তোমরা পরকালের পরম কল্যাণময় ফললাভে কৃতার্থ হইবে।" জৈমিনির অভিপ্রায় এই যে বীতশ্রদ্ধ লোকদিগকে অগ্রে বেদের উপর শ্রদ্ধাবান্ করিতে হইবে, এবং বিহিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর লোকসমূহ যখন অল্প ও অনিত্য কর্ম্ম ফল অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যার ফলোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই ব্রহ্মজ্ঞানে—ব্রহ্মবিদ্যালাভে সমুৎসুক হইয়া সদ্গুরুর শরণাপন্ন হইয়া কৃতার্থ

হইবে। মহামুনি জৈমিনি এই রূপ অভিপ্রায়ের বশেই স্ব-প্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসা গ্রন্থে কর্ম্ম সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম-কাণ্ডের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরস্ত হইলেন।

কিন্তু তখনও জন সমাজে জীব নিস্তারের এক মাত্র উপায় এবং বেদের চরম লক্ষ্য, ব্রহ্মবিদ্যা, গভীর অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া রহিল। এমনই দুঃসময়ে বিশ্ববিধাতা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইলেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, যে, কর্ম্ম যাগানুষ্ঠানের মহিমায়, এবং বিবেক-বিজ্ঞানের প্রভাবে, ব্রহ্মবিদ্যা-সিদ্ধির অন্তরায় অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু, তখনও জীব-গণের অশান্তির উদ্বেগ অপসৃত হয় নাই। অথচ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, বীজ বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, বেদসার বেদান্ত ভাগের অর্থ ব্যবস্থাপক উত্তর-মীমাংসা প্রণয়নে সমুৎসুক হইলেন। উত্তর-মীমাংসার অপর নাম বেদান্ত-দর্শন ও ব্রহ্মসূত্র। তিনি বেদান্ত বাক্যরূপ মনোরম কুসুমরাশি সমাহরণপূর্ব্বক এই সূত্রে গ্রথিত করিলেন, এবং উপনিষদের মধ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সমস্ত বিরোধ বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, সে সমস্ত বিরোধ ভঞ্জনপূর্ব্বক তাৎপর্য্য নির্ণয়ের প্রণালী পরম্পরা অতি বিশদ্‌ভাবে নির্ণীত করিলেন। তখন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেরূপ তৈল-সেক সহযোগে পুনরুদ্দীপিত হয়, তদ্রূপ ক্ষয়োন্মুখ ব্রহ্মবিদ্যাও ইহার সাহায্যে আপন অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

অর্থ]

ভাষা-তত্ত্ব।

মানবের হৃদয়গত-ভাবের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক ধ্বনি বিশেষকে (রব) 'ভাষা' বলা যায়। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে প্রাণী মাত্রেরই ঐরূপ মনোগত ভাব প্রকাশক একরূপ ভাষা আছে; কিন্তু মানব জাতির ভাষা ভিন্ন অপর পশু পক্ষীর ভাষা (রব) প্রায়ই অবোধ্য। পশু পক্ষিগণের মধ্যে শুক-শারিকা প্রভৃতির ভাষা মনুষ্যের অনুকরণে শিক্ষা হয় বলিয়া, তাহা সহজবোধ্য, সকল পক্ষীর বা পশুর ভাষ নয়। শুক শারিকারা যে মানবের ন্যায় শব্দোচ্চারণ করিয়া হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করে, তাহা তাঁহাদের নৈমিত্তিক, কিন্তু স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক হইলে, সকল পশুরই ঐরূপ মানবোচিত শব্দ করিবার শক্তি থাকিত।

মানুষের সন্তরণ শিক্ষা যেরূপ নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক নয় ; মৎস্য মকরাদির প্রাকৃতিক ; তদ্রূপ শুকাদিরও মানবোচিত শব্দ শিক্ষা অপ্রাকৃতিক। শুক প্রভৃতি কতিপয় পক্ষীর মানবীয় শব্দের শক্তি গ্রহণে ও ভাষণে অনুকূল সামর্থ্য আছে বলিয়া, তাহাতে কৃতকার্য্য হয়। কাক প্রভৃতি অন্য পক্ষীরা তাদৃশ শক্তির অভাবে তাহা পারে না।

প্রাণিগণ যে উপায় দ্বারা নিজের মনোগত ভাব অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি প্রকাশ করেন, তাহাকেই সাধারণে 'ভাষা' নামে অভিহিত করা হয়। যেরূপ কোন কোন দার্শনিক মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়াবস্থা ছিল, পরেও তাহাই হইবে ; সেইরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভাষারও উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা এবং পরে লয়াবস্থা থাকা সম্ভব। প্রাচীন ত্রিকালবিদ্ মহর্ষিগণ 'স্ফোটবাদ' প্রভৃতিতে ভাষাকে নাদ-মূলক বা নাদ-প্রভব * বলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্ম) বা নাদ একই পর্য্যায় শব্দ। "সর্ব্বশক্তিমান্ এক সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর তত্ত্ব হইতে জগদ্বীজ-শক্তি মহামায়ার প্রাদুর্ভাব হয় ; সেই চিন্ময়ী পরমা শক্তি হইতে নাদের সৃষ্টি হয় ; এই নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়॥"

"সেই চিতের শক্তিই নাদ, বিন্দু, বীজ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সেই ভিদ্যমান বিন্দু হইতে নাদ ও বীজাত্মক 'রবে'র উৎপত্তি হয়। সেই রবই শ্রুতি-সম্পন্ন হইয়া (শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া) শব্দব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়"। শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ সেই নাদাত্মক ব্রহ্মকে দুইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রথম রূপ ব্যক্ত', দ্বিতীয় রূপ অব্যক্ত। তাহার মধ্যে প্রণবাত্মক ব্রহ্মনাদকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। এই অব্যক্ত নাদের পুনঃ পরা, পশ্যন্তী, বৈখরী, প্রভৃতি+ সঞ্জ্ঞা ও প্রকার-ভেদ আছে। অর্থ বোধ জন্মাইতে সক্ষম ভাষাকে (বাক্য, পদ,

---

* সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদস্তস্মাদ্বিন্দু-সমুদ্ভবঃ॥
নাদোবিন্দুশ্চ বীজঞ্চ স এব ত্রিবিধোমতঃ।
ভিদ্যমানাৎ পরাৎ বিন্দোরভয়াত্মা রবোভবেৎ।
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দোব্রহ্মাঽভবৎ পুনঃ॥

(+) নাগেশের শব্দেন্দু শেখর ক্রম, প্রকরণে। সিদ্ধান্তকৌমুদী। লঘুমঞ্জুষা। মহাভাষ্যে.
"বৈখরীশব্দ নিষ্পত্তি মধ্যমা শ্রুতিগোচরঃ।
আগুরাথাচপশ্যন্তী সূক্ষ্মাবাগনপায়িনী॥"
প্রণবএববাশেদানাভ্যাং সহ বৈখরীরূপং প্রতিপদ্যতে।"
"পরাখ্যমেব নাভিপর্য্যন্তবাগক্ষতা 'তনবায়ুনাঽভিব্যক্তং মনোবিষয়ঃ পশ্যন্তি বাগিত্যর্থঃ॥
বাগেবার্থং পশ্যন্তী বাগজীবীতি বাগর্থঃ নিহিতঃ সন্তনোতি।' ইত্যাদি (শ্রুতিঃ)

শব্দাদিকে) ব্যক্ত বলা হইয়াছে। এই স্ফোটবাদী শব্দ-তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রণব ও পরব্রহ্মকে একই তত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশেষে এইরূপ লক্ষণ বলা যাইতে পারে যে, যে ধ্বনি দ্বারা নিজের হৃদ্‌গত ভাব সুব্যক্তরূপে অপরকে বুঝাইতে সমর্থ হয়, তাহাকেই ভাষা শব্দে শব্দিত করা হয়। এইরূপ আত্ম-ভাব প্রকাশের ভাষা কীটাদিরও আছে, তাহা আমরা তাহাদের বাহিরের ব্যবহার দ্বারা অনুমান করিতে পারি পাশ্চত্য দেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিদাদির এ ভাষা স্বীকার করিয়া থাকেন।

জগতে সকল প্রাণীরই স্বীয় মনের ভাব, সুখ, দুঃখ, রোগ, শোকাদির বার্ত্তা স্ব স্ব জাতির অনাদি সংকেত দ্বারা (ভাষা) প্রকাশ করিবার স্বাভাবিক শক্তি বিদ্যমান আছে। যে কোন উপায়, সঙ্কেত কিম্বা ইঙ্গিত দ্বারা হউক, স্বজাতির নিকটে আত্মাভিপ্রায় প্রকাশ করিবার শক্তি, প্রাণী মাত্রেরই বিদ্যমান আছে—ইহা এক প্রকার অবধারিত। তাহার হেতু এই যে, বিভিন্ন প্রাণীর স্বর যন্ত্রের নানারূপ, সংস্থান নানা প্রকার থাকাতে নানারূপ শব্দের অভিব্যক্তি হয়। তাহাতে নানা শব্দ দ্বারা নানাবিধ অর্থের অববোধ হয়। গো-বৎসের হম্বা রব শুনিয়া তাহার জননী (ধেনু) বৎসের অনুসরণ করিয়া থাকে; এবং বৃক্ষ-কোটরস্থিত পিতামাতার আগমন প্রতীক্ষাকারী কলরব-পরায়ণ পক্ষী শাবকগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সুদূরাবস্থিত পক্ষিগণ স্বীয় সন্তান-রক্ষণের জন্য অতি বেগে ধাবিত হইতে দেখা যায়। বিহঙ্গম-শাবককুলের কলকল ধ্বনিতে তাহাদের পিতামাতা কলরবের অনুযায়ী সম্পদ্ ও বিপদের বার্ত্তা অনুভব করিয়া থাকে। কেবল যে এক জাতীয় জীবের মধ্যে পরস্পরের ভাষা বুঝিবার সামর্থ্য আছে এমন নয়; এক জাতীয় জীব অপর শ্রেণীর প্রাণীর নিকট স্বীয় ভাষা দ্বারা মনের ভাব বুঝাইয়া থাকে, এবং ভাষা দ্বারা পরস্পরের শত্রুতা ও মৈত্রের ভাব জানিতে পারে। পশুগণকে স্বীয় ভাষা দ্বারা মানবদিগকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে দেখা যায়। মদমত্ত সিংহের ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অপর বন্য পশুগণ পরস্পর শব্দ দ্বারা আত্ম-ভীতি জ্ঞাপন করে। তাহাদের ধ্বনির মধ্যেও হর্ষ ব্যঞ্জক ও দুঃখ-সূচক ভাব বিদ্যমান থাকে। হর্ষ-সূচক শব্দ শ্রবণ করিয়া স্বীয় বন্ধুজনকে স্বাগত সম্বোধন জ্ঞাপন করে। অতএব প্রাণিজগতের মধ্যে ভাষাই যে সর্ব্ববিধ-মনোগত ভাবাদির প্রকাশের হেতু, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাণী-নিবহ যেরূপ অসংখ্য, তদ্রূপ তাহাদের ভাষাও বহু; এক

একটী ভাষার মধ্যে অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। পশুগণের ভাষা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞানগুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ব্যবহার কালে জ্ঞানী মানবগণ পশুদিগের সহিত সমান; শব্দাদির সহিত শ্রোত্রাদির সম্বন্ধ হইলে পশু প্রভৃতিরা যেমন শব্দাদি জানিতে এবং জানিবার পর তাহারা অনুকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হয়—প্রতিকুল দেখিলে নিবৃত্ত হয়; জ্ঞানীগণও তদ্রূপ ঐ ভাবে শব্দাদি অবগত হইবার পর তাহারাও প্রতিকুল দেখিলে নিবৃত্ত হন ও অনুকুল দেখিলে প্রবৃত্ত হন।" * পশুগণ যেরূপ দণ্ডোদ্যত-হস্ত মনুষ্যকে স্বীয় অভিমুখে আসিতে দেখিয়া 'ইনি আমাকে মারিতে আসিতেছেন' এইরূপ ভাবিয়া পলায়ন করে এবং শ্যামল তৃণপূর্ণ হস্তে আগমন করিতে দেখিলে তাহার অভিমুখীন হয়; সেইরূপ জ্ঞানী লোকেরাও আপনার সম্মুখে হুঙ্কার চণ্ডরবে রোষ-কষায়িত নেত্রে খড়্গ-হস্ত পুরুষ আসিতেছে দেখিলে পলায়ন করেন এবং তাহার বিপরীত দেখিলে তাঁহার অভিমুখী হন। যেরূপ মানবের ভাষা অপর প্রাণীর ভাষা হইতে ভিন্ন সেইরূপ মানবগণের ভাষাও দেশ, প্রদেশ, জাতিভেদে বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানবগণের ভাষা দেশভেদে বিভিন্ন হইলেও মাধুর্য্য ওজঃ প্রভৃতি গুণে এবং অপর প্রাণীকে বিজ্ঞাপনে ও সংস্কার দ্বারা উৎকর্ষ সাধনের যোগ্য। ভাষাবলে মানব যেরূপ অশেষ কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহা অন্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রীক দেশীয় কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—যে 'ভাষা দ্বারাই মানবগণ ন্যায়, অন্যায় সত্য অসত্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় বুঝাইয়া থাকে, এবং হিতাহিত বিবেক করিতে সমর্থ হয়। অন্য প্রাণী হইতে ভাষার উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া উচ্চ ভাষা ব্যবহার করে"। ভাষার উৎপত্তি কিরূপে হয়, এই বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভাষা ঐশী-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কোন মানব ইহার ব্যবহর্ত্তা ভিন্ন স্রষ্টা নয়। পাশ্চাত্য বুধগণ বলেন,—বিশ্ব সৃষ্টির পর সকল বস্তুই বাক্‌শক্তি রহিত ছিল, তাহারা স্বীয় স্বীয় অঙ্গভঙ্গী ও সঙ্কেত দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিত। যে সময় হইতে অঙ্গভঙ্গী ও সঙ্কেত দ্বারা নিজের মনোভাব সকল ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইল, সে সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয়জাত মনের ভাব-ব্যঞ্জক কোন একটী ধ্বনির উৎপত্তি হইল; সেই ধ্বনি দ্বারা

* "যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদি বিজ্ঞানে প্রতিকুলেজ্ঞাতে ততো নিবর্ত্তন্তে অনুকুলেব প্রবর্ত্তন্তে। শাঙ্করভাষ্য, অধ্যাসপ্রকরণ। ১।১।১।

তাঁহারা কোনরূপে মনের ভাব প্রকাশ করিত। তখন তাঁহাদের প্রযুজ্য শব্দ পরস্পর সংবদ্ধ ছিল; দুঃখ শোকের প্রকাশক 'অঃ', 'উঃ', ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিত; এবং সুখ হর্ষের পরিব্যঞ্জক বাঃ' 'আহা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতে ভালবাসিত। এখন এই সকল শব্দকে শাব্দিকগণ নিপাত ও অব্যয় বলিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রণালীতে তাঁহারা যখন সমস্ত মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না, তখন পুনঃ ঐরূপ দুইটী বা তিনটী শব্দ এক সঙ্গে যোগ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে যত্ন করিল। এইরূপ বারবার শব্দ সংযোজনে ও প্রয়োগে যত্ন ও ব্যবহার করিতে করিতে, এক অপূর্ব্ব মনোহারিণী, সকল ব্যবহার নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী ভাষার বিস্তার ও প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও সকল পণ্ডিতের এই মত স্বীকৃত নয়; যেহেতু "নানা মুনির নানামত"। অপর একদল বলেন,— ভাষা ঈশ্বরের সৃষ্ট; এই ভাষা দ্বারা সকল বস্তুরই নামকরণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ ভাষা-সূত্রে নাম-প্রসূনাবলী যেন গাঁথাই ছিল। তাঁহাদের 'আদম' বা আদি মনু প্রথমে ভাষার অধ্যয়ন করেন, তৎপরবর্ত্তী সৃষ্ট মানবগণ ভাষা শিক্ষা করেন। ইহাকে কোন কোন পণ্ডিত প্রাচ্য ভাষা-তত্ত্ববিদের মত বলিয়া স্বীকার করেন। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত উক্ত উভয় প্রকার মতের মধ্যে কোন মতই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—স্বভাবতঃই মানবের ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে; ভাষার উৎপত্তিতে কোন মানবের চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই। কিম্বা ঈশ্বর মানবগণকে ভাষা শিক্ষা দেন নাই। প্রাণীগণের মন ও শরীরের সংস্থান এবং গঠন অনুসারে স্বতঃই ভাষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মানব যেরূপ স্বাভাবিক শরীরাদির সঞ্চালন দ্বারা পরিভ্রমণ, শিক্ষা, অশন শয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ ভাষাও তাঁহাদের মুখ-কুহর হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে। যেরূপ মানবের শারীরিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন যত্ন করিতে হয় না; কিন্তু স্বতঃই যেন বাল্যকালের পর কৈশোর, তৎপর যৌবন অবস্থার বিকাশ হয়, সেই-রূপ ভাষার নিত্যবস্তু দর্শনাদিতেও শারীরিক সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদুর্ভাব হয়। আরো দেখা যায় যে, সামাজিক অবস্থার নিত্য নানারূপ পরিবর্ত্তনে মানবের মনে ভাষাঙ্কুরের বিকাশ হয়। আত্মীয়জনগণের নিকটে মনের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত বাহিরের প্রস্তাবিত বিষয় বুঝাইবার জন্য সকলেরই চিত্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে। মূক ও বাক্-যন্ত্র-বিকৃত ব্যক্তির ভাষা-বিকাশের মূল-শক্তির ব্যাঘাত ঘটাতে ভাষার প্রকাশ হয় না। ইহাকেই লোকে ভাষার উৎপত্তির প্রথম

কারণ বলিয়া থাকে। আত্মা শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছেন. যে ভাবে আত্মাতে ঈষৎ প্রযত্ন (ব্যাপার বা ক্রিয়া) হইলে. তৎপর শরীরে, স্বরযন্ত্রে, ও বাগ্‌যন্ত্রে তাহা প্রতিফলিত হয়; সেইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ তন্ত্রী সমূহের মধ্যে একটীতে আঘাত পড়িলে অপর তন্ত্রীগুলি স্বতঃই বাজিয়া উঠে ও স্পন্দিত হয়। এ বিষয়ে পাণিনীর শিক্ষা উক্ত হইয়াছে যে, "আত্মার সঙ্গে বুদ্ধির (বোধনাবৃত্তির) যোগ হইলে, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সহযোগ বিষয়ের সম্বন্ধ হয়; তাহার পর কথনেচ্ছায় মন নাভিদেশে উদান বায়ু ও জঠরানলে আঘাত করে, তৎপর সেই বায়ু হৃদয় যন্ত্রে বিচরণ করিয়া 'মন্দ্র' নামক স্বরের প্রাদুর্ভাব জন্মায়"। * অতএব বুঝা যায় যে. আত্ম সমুন্মেষে মনে অভিঘাত হয়, মনে অভিঘাত হইলে বাগেন্দ্রিয়ে অভিঘাত সম্পন্ন হয়, তাহাই ভাষা শব্দের চরমার্থ।

এই বসুধা মণ্ডলে ভাষা ইয়ত্তা করা খুব কঠিন কথা। কেবল আমাদের এই ভারতবর্ষেই যে কত ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার নির্দ্দেশ হইয়া উঠে না। ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত। এক লেখা ভাষা, অপর কথা ভাষা। লেখা ভাষারও অনেক প্রভেদ বা অবান্তর ভেদ আছে। আর কথ্য ভাষা প্রতি ব্যক্তিতেই নিত্য নূতন আকার ধারণ করিয়া, বিষয় ভেদে ও বক্তার অভিপ্রায় ভেদে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাড়ায়। এখানে আমরা কথ্য ভাষার অনেকত্বেও বহু হেতু দেখিতেছি। কাল ভেদে, সামাজিক অবস্থা ভেদে, লোক-সংস্থানের পরিবর্ত্তনে ভাষা মূর্ত্তি, নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই ভারতে পূর্ব্বকালে যে ভাষা ছিল, এখন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে ভাষা যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সেই ভাষাই কাল পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ভাষারূপে দাড়াইয়াছে। এই বর্ত্তমানের ব্যবহার্য্য ভাষাও কালান্তরে অন্য আকার ধারণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি অতএব কথ্য ভাষার ইতিহাস এখনও আর সমুদয় পাওয়া সম্ভবপর নয়. এবং সেই প্রাচীন কালের সকল ভাষা আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া অসম্ভব। লেখা ভাষার বিষয়ে শাস্ত্রে নানা প্রমাণ দেখিতেছি,—যথা বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে. "তাহার পর বিধাতা সৃষ্টি প্রথমে শব্দ-ব্রহ্মময়ী ভাষা সৃষ্টি করিলেন, এবং আকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ, ককারাদি হল্ বা ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরস্পর সংযুক্ত বর্ণের সর্জ্জন করিলেন। তাহার পর ভাষা পঞ্চাশ

---

* "আত্মাবুদ্ধ্যাসমেত্যার্থান্ মনোযুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতং।
মারুতস্তূরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরং॥" পাণিনীয় শিক্ষা।

ও ছয় অথবা ষট্ পঞ্চাশ সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া উদ্ভাবন করিলেন। বালকদিগের উক্ত ভাষার ও বর্ণের জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ সমূহ,—পদ জ্ঞান ব্যাকরণ দ্বারা ও অর্থ জ্ঞান দর্শনের দ্বারা সৃষ্টি করিলেন।"

উল্লিখিত পুরাণে উক্ত ভাষার লক্ষণ, উদাহরণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে; এখানে তাহার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর ব্যাকরণে উক্ত ব্যাকরণ প্রণেতা আঠার প্রকার ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, ঔদীচী, মহারাষ্ট্রী মাগধী, মিশ্রার্দ্ধমাগধী, শাকভীরী, শ্রাবন্তী, দ্রাবিড়ী, উৎকলা (ওড়িয়া), পঞ্চালী, প্রজ্ঞাবাহ্লিকা, রক্তিকা দাক্ষিণাত্য, পৈশাচী, আবন্তী, শৌরসেনী।

ললিতবিস্তর নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থের দশম অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের অধীত লিপির কথা উদাহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বহু কথা বর্ণিত আছে। ভগবান্ বুদ্ধদেবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যখন আচার্য্য বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বেই তিনি চতুঃষষ্ঠি বর্ণমালা অভ্যাস করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন এই গ্রন্থ (ললিতবিস্তর) খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে এই সকল—শাক্য সিংহের অধীত লিপি; ব্রাহ্মী, খরোষ্ট্রী, পুষ্করসারী, অঙ্গলিপি, মাগধ লিপি, মাঙ্গল্য লিপি, মনুষ্য লিপি, অঙ্গুলীয় লিপি, শকারি লিপি, ব্রহ্মবল্লী লিপি, কিনারি লিপি, দক্ষিণ লিপি, মুগ্র লিপি, মনুলোম লিপি, অর্দ্ধধনু লিপি, দরদ লিপি, সাস্পালিপি, চীনলিপি, হূণলিপি, মধ্যাক্ষর বিস্তর লিপি, পুষ্পলিপি, নাগলিপি, যক্ষলিপি, কিন্নরলিপি, মহোরগলিপি, মসুরলিপি, গরুড়লিপি মৃগচক্র লিপি, বায়ুমরু লিপি, ভৌমদেব লিপি, উত্তর কুরুদ্বীপ লিপি, অপর গৌড়াদিলিপি, পূর্ব্ববিদেহ লিপি, উৎক্ষেপলিপি, নিক্ষেপলিপি, বিক্ষেপলিপি, প্রক্ষেপলিপি, সাগরলিপি, ব্রজলিপি, লেখ প্রতিলেখ-লিখিত নিক্ষেপাবর্ত্তলিপি, পদলিখিতলিপি, দ্বিরুত্তর পদসন্ধি লিপি, যাবদ্দেশোত্তর পত্রসন্ধিলিপি, অধ্যাহারিণী লিপি, সর্ব্বরুত সংগ্রহণী লিপি, বিদ্যানুলোম লিপি, বিমিশ্র লিপি, ঋষি তপস্তপ্ত রোচমান ধরণী প্রেক্ষণ লিপি, সর্ব্বৌষধি নিস্পন্দা, সর্ব্বসার সংগ্রহণী। হে গুরুদেব! এই চতুঃষষ্ঠি লিপির মধ্যে কোন লিপি আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন? এই কথা বুদ্ধদেব আচার্য্য বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুবিধ লিপি-ভেদ দ্বারা ভাষারও অনেক অনুমান করা যাইতে পারে। জৈনগণের প্রজ্ঞাপনা সূত্র ও সমবায় সূত্রে অষ্টাদশ প্রকার লিপির উল্লেখ

দেখা যায় ; যথা,—বস্তী, যবনালীয়া, দাস উড়িয়া, খরোষ্ট্রী, পুক্খর সরিয়া, পহাড়াইয়া, উচ্চতুরিয়া, অক্ষর প্রথিয়া, ভোগবপত্তা, দেষণ্তিষা, নিয়াহইয়া, অঙ্কলিপি, গন্ধর্ব্ব লিপি, আদর্শলিপি, মাহেসরা লিপি, দামিলী লিপি, পোলিন্দি লিপি, এই সকল সমবায় সূত্রোক্ত বস্তী, যবনালীয়া, দাসপুরীয়া, খরোষ্ট্রী, পুক্খর সারিয়া ভোগবইয়া, উপঅন্তর কারিয়া, অক্ষর পুবিয়া, বেননিয়া, নিহইয়া, অঙ্কলিপি, গণিতলিপি, গন্ধর্ব্বলিপি, আদর্শলিপি, মাহেশ্বরী, দামিনী, পোলিন্দা, এই সমস্ত লিপির কথা প্রজ্ঞাপনা সূত্রে আছে। বস্তী—শব্দের অর্থ ব্রাহ্মী, দামিনী শব্দের দ্রাবিড়ী, এই জৈন শাস্ত্রোক্ত লিপি ও বুদ্ধ দেবোক্ত লিপির মধ্যে কতিপয় লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহা মহারাজ অশোকের উৎকীর্ণ শিলা লিপির পরিচয়ে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ট্রী বিদ্যমান আছে ; অপর লিপিগুলি নামে মাত্র পর্য্যবসিত। জৈনগণের অপর নান্দীসূত্র নামক একখানি গ্রন্থেই ষট্‌ত্রিংশৎ লিপির কথা উল্লিখিত আছে। সেগুলি এইরূপ,—হংসলিপি, যক্ষ লিপি, রাক্ষসলিপি, উড্‌লিপি, যাবনী লিপি, তুরস্কী লিপি, কীরী লিপি, দ্রাবিড়ী লিপি, সৈন্ধবী লিপি, মালবী লিপি, নাড়লিপি। নাগরী লিপি, পারসী লিপি, লাটীলিপি, অনমিত্র লিপি, চানক্কী লিপি, মৌলদেবী লিপি, লাটী, চৌড়ী, ডাহলী, কামডী, গুর্জ্জরী, সোরটী, মরহটী, কোঙ্কণী, খরাসানী, মাগধী, জোহলী, হারী, হাম্বিরী, পরতিরি, মসী, মালবী, মহাযোধী। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও বিবিধ লিপির কথা সন্নিবদ্ধ দেখা যায়। দক্ষিণাপথের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক-নিচয় হইতে জানা যায় যে, ছয়টী ভাষা ও সাতাইশটী উপভাষা পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। প্রাকৃত চন্দ্রিকায় লিখিত আছে, মহারাষ্ট্রী আবন্তী, সোরসেনী অর্দ্ধ মাগধী বাহ্লিকী, মাগধী, এই কয়টী ভাষা দক্ষিণাত্য প্রসূত''। ব্রাচড়ী, লাটী, বৈদর্ভী, উপনাগরী, নাগরী, বর্ব্বরী, আবন্তী, পাঞ্চালী, টাক্কী মালবী, কৈকেয়ী, গৌড়ী, ঔড্র, দেবপাঞ্চালী, পাণ্ডলিপি কৌন্তলী, সিংহলী, কালিঙ্গী, প্রাচী, কর্ণাটী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়ী, গুর্জ্জরী, মধ্যদেশীয়া, এই সকল সূক্ষ্ম অবান্তর ভেদে বৈড়ালী প্রভৃতি সাতাইশ প্রকার অপভ্রংশ ভাষার (প্রাকৃত ভাষা) উল্লেখ দেখা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রেও অনেক প্রকার দৃষ্ট হয়। মুদ্রালিপি, যন্ত্রলিপি, লেখনী লিপি, গুণ্ডিকা, ঘুণলিপি এই পাঁচ প্রকার লিপি। প্রাচীন বৃহৎ পরাশরীয় শিল্পশাস্ত্রে এবং অপরাপর প্রাচীন শিল্প গ্রন্থে লিপি ও বর্ণের (রঙ্‌এর) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রেও নানাবিধ ভাষার (মহারাষ্ট্রী

প্রভৃতির) উল্লেখ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, কেন যে তাহাতে নানা প্রভেদ দেখা যাইতেছে, তাহা ঠিক নির্ব্বিবাদে বলা খুব কঠিন। তবে আমাদের ধারণা হয় যে, সংস্কৃত ভাষা বা গীর্ব্বাণ ভাষাই সকল ভাষার জননী। এই বিষয়ে র', রা, ৺অপ্পা শাস্ত্রী রাশিবড়েকর বিদ্যা-বাচস্পতি মহোদয় তাঁহার সংস্কৃত চন্দ্রিকার প্রবন্ধে বহু গবেষণা পূর্ব্বক স্থির করিয়া গিয়াছেন; এবং অন্যান্য ভাষাতত্ত্বালোচকগণও তাহাই বলিয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত নামে পরিচিত অনেক ভাষা দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃত, ব্রাহ্মণারন্যক সংস্কৃত, উপনিষদ্ সংস্কৃত, সূত্র সংস্কৃত, স্মৃতি সংস্কৃত, প্রভৃতি নানা প্রকারে প্রভিন্ন সংস্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রণালীতে ভাষার প্রভেদ ব্যবস্থিত হয়, তদ্দ্বারা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক সংস্কৃত ভাষারই অপর ভাষাগুলি উত্তরবর্ত্তী বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান আছে। বিদেশীয় পণ্ডিতও তাঁহার 'ভাষা বিজ্ঞান' পুস্তকে সংস্কৃত ভাষাই সকল ভাষার স্রষ্ট্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দেশে এখনও বিদ্বৎ সমাজে প্রচলিত আছে যে, "ভাষা সুসংস্কৃতং ভাষা"। এক সময়ে দক্ষিণাপথের আঢ্য রাজের শাশন কালে তিনি প্রাকৃত ভাষায় কথন নিপুণ কোন ব্যক্তির অন্বেষণ করিয়াছিলেন, যে 'আমার রাজ্য মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিতে পারে এমন কেহ আছেন কিনা।" সম্প্রতি ভারতের অপরাপর দেশ অপেক্ষা দক্ষিণাপথের জনগণ সংস্কৃত ভাষায় কথনে ও লিখনে অধিক নিপুণ। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ আরও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা ইটালীয় ভাষার তুল্য। সাহিত্যের ভাষার পরিপুষ্টি ও তাহার পরিণতির পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষা, ইটালীর পূর্ব্ব-ভাষার অনুরূপ ছিল ইহাই তাহাদের মত। ভারতের দৃশ্য কাব্যে বা নাটকে প্রাকৃত ভাষার বাহুল্য আছে। নাটকে রাজ-সচিব পুরোহিতাদির সংস্কৃত ভাষায় বলিবার নিয়ম আছে। তাহাতে নায়িকা, রাজমহিষী, পরিচারিকা, সখী, ভৃত্যগণ প্রাকৃত ভাষায় কথোপ-কথন করিলে, সহজে তাঁহাদের মনের ভাবের অভিব্যক্তি ও কথার মাধুর্য্য প্রকাশ পায়।

সেই প্রাকৃত ভাষাও কালে ও সংস্কারে সংস্কৃত ভাষার স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইতে পুনঃ বহু ভাষার আবির্ভাব হইয়াছে। সে সকল ভাষা এখন ভারত প্রান্তে ও বন্য প্রদেশে বিকৃতরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। একই

ভাষার আকার দুই প্রকার, কোমল স্বভাব ও কঠোর প্রকৃতি। যাহার ব্যঞ্জনবর্ণ বহুল আকার গঠিত তাহা কঠিন। যাহাতে স্বরের বাহুল্য আছে তাহা শ্রুতি মধুর। যাহার বলেন,—প্রকৃতি বা মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাকে প্রাকৃত ভাষা বলা হয় সংস্কার হইতে প্রাদুর্ভূত বলিয়া তাহাকে সংস্কৃত বলা হয়; এই সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ দোষশূন্য যুক্তি দেখিতে পাই না। আমরাও এই কথা স্বীকার করি যে, সংস্কার হইতে অর্থাৎ সুপ্রাচীন বৈদিক ভাষার সংস্কার হইয়াই সংস্কৃত হইয়াছে। কেবল মানসিক সংস্কার হইতে নয়, কিম্বা নাটকীয় ভাষার সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার আবির্ভাব হয় নাই। অতএব এই ভাষাকে 'গীর্ব্বাণ বাণী' বা দেবভাষা বলা হয়। যেহেতু "প্রাকৃতস্তু পৃথক্ জনঃ" এই অভিযুক্তের উক্তি দ্বারা ও প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষাই প্রাকৃত ভাষা। দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয়ও আঠারটী ভাষা বারবিলাসিনীকে মানস-শায়িনী করিয়াছিলেন বলিয়া স্বগ্রন্থে দর্প প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সন্ধ্যাবন্দন, যাগ-শ্রাদ্ধাদিতে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার ব্যবহার করিতে নাই। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "নাসংস্কৃতং প্রযুঞ্জীত নাপভাষিতবৈ" ইহা দ্বারা অপভাষার অপ্রশংসা করিয়াছেন। ব্যাকরণের বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন দ্বারা বিক্ষিপ্ত ভাষার সম্বন্ধ, সংস্কার, সুপ্রয়োগ, ও প্রণালী বদ্ধ করা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যারত্ন সংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

অর্থ]

মহামায়ার খেলা।

(গত চৈত্র সংখ্যার পর।)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—হেমলতার স্বামী নির্ম্মলকুমার যোগাভ্যাস করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে, তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে নবকুমার নামক একটী যুবক হেমলতার প্রণয়াকৃষ্ট হইয়া কৌশলক্রমে তাহাকে গ্রামান্তরে লইয়া যায়। মহামায়ার কৃপায় হেমলতা সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া এক সন্ন্যাসিনীর শরণাপন্ন হয়। এদিকে নবকুমার হেমলতার কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করে। পরে একজন সন্ন্যাসী তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া নবকুমারকে তাহার এক শিষ্যের আলয়ে রাখিয়া দেন। তথায় কিছুদিন আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, নবকুমার তাঁহার উপদেশানুযায়ী গৃহে প্রত্যাগত হয়। কিছুদিন পরে হেমলতা যোগ ও জীবহিত ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসিনীর গুরুর উপদেশানুযায়ী কাশী অঞ্চলে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের সেবার জন্য গমন করেন।

তখন উমাপদ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক যুবক সন্ন্যাসী নির্ম্মলকুমারের পিতার উৎসাহে এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ধনী ও রাজপুরুষদিগের সাহায্যে কাশীতে একটী সেবাশ্রম স্থাপন করেন। পরে বিনোদিনী নাম্নী একটী গৃহস্থ কন্যাকে তাহার স্বামীর উদ্দেশে কাশী যাইবার সময় পথে প্লেগাক্রান্তা হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, হেমলতা তাহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হয়েন।]

সে বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ এক সঙ্গে উভয়ে উভয়কে পরাজয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। রাজপুরুষগণ এবং দেশের দয়ালু ধনকুবেরগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও দুর্ভিক্ষের সেই বিভীষিকা মূর্ত্তি কিছুতেই হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একে দারুণ অন্নাভাব, তদুপরি রোগের যন্ত্রণা এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মৃত্যু জনিত শোকে গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন যাইতে চলিল। জীর্ণ শীর্ণ নরকঙ্কালগুলির অন্নের জন্য ব্যাকুলতা, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী! মৃতদেহের স্তূপ- দুর্গন্ধ, কে কাহার সৎকার করে। দুর্ভিক্ষের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, উমাপদ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার অনুচরবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবন উৎসর্গ করিয়া—জীবনের অণুমাত্র আশা পরিত্যাগ করিয়া, রোগীর সেবা—দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত। রাজপুরুষগণ এই সকল স্বেচ্ছাসেবকদিগের সেবানুরাগ ও পরিচর্য্যা দেখিয়া ইঁহাদের উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত করিলেন। অর্থব্যয়ের জন্য কোন চিন্তা নাই, উমাপদ ব্রহ্মচারী সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যেখানে যাহা প্রয়োজন, তিনি আশ্রমে বসিয়াই তাহার সুব্যবস্থা করিতেছেন। দরিদ্রেরা ছত্রে ছত্রে আসিয়া আহার্য্য লইয়া যাইতেছে; মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ যতদিন পারেন আপনার জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া অন্ন সংস্থান করিয়াছেন, কিন্তু এখন আর কিছুই নাই; অথচ ছত্রে গিয়াও আনিতে পারেন না। ব্রহ্মচারী এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহাদের বাটীতে সাহায্য পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাও শ্রেয় মনে করিল, তথাপি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগকে তিনি কর্জ্জ স্বরূপ দিয়া জীবন রক্ষা করিলেন।

ইঁহাদের সাহায্য ভিন্ন এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত সাহায্য,—পীড়িতের সেবা কিছুতেই সম্ভব হইত না, রাজপুরুষগণ ইহা বেশ বুঝিলেন। সমগ্র ভারত জুড়িয়া ইহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হইল। ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের বেগ কমিয়া আসিল; ধনীদিগের উৎসাহে—রাজপুরুষের সহায়তায় সেবাশ্রম

নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা উত্থাপিত হইল। ব্রহ্মচারীর সে চিন্তা, সে উদ্বেগ এখন আর নাই ; অনেক ধনী ব্যক্তি ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসিয়া তাঁহাদের এই মহৎ কার্য্যে সহানুভূতি জানাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী সবিনয়ে বলিলেন, এই ভীষণ সংহার বা ধ্বংশের মূল মহামায়ার ইচ্ছা! দেখুন একদিকে বরাভয়—আর একদিকে অসি ও মুণ্ড। তিনিই সকল ব্যাপারের মূল, তাঁহার ইচ্ছাতেই এই দারুণ দুর্ঘটনা ; আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই শান্তি! সুতরাং এ কার্য্যে আমাদের কোনরূপ প্রশংসা করা বৃথা, ইহা মহামায়ারই কার্য্য।

তখনও তাঁহাদের কার্য্যের নিবৃত্তি হয় নাই। সকল সেবক তখনও কার্য্যক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হয় নাই। এক দিন অন্ধকারে একটী যুবতী বৃক্ষতলে শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, চক্ষু রক্তবর্ণ ; গাত্রের উত্তাপ এত তীব্র যে হাত দেওয়া যায় না! সময়ে সময়ে "মাগো" "বাবাগো" শব্দ করিতেছে। এই ধ্বনি সহসা একটী সন্ন্যাসিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসিনীও কাশী যাত্রা করিয়াছেন. এই মহামারীতে তাঁহার বদনেও কোনরূপ ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই ; সদাই সহাস্য বদন! শব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে এ স্বর রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত। শব্দ অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাসিনী গিয়া দেখিলেন যে, একটী রুগ্না স্ত্রীলোক রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। করুণায় তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল, কাশী যাওয়া তাঁহার বন্ধ হইল। রোগিণীর পার্শ্বে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিলেন। রোগিণী এই জনশূন্য শ্মশান মধ্যে মানব সমাবেশ দেখিয়া বলিয়া উঠিল "কে তুমি! একটু জল—প্রাণ যায়"! সন্ন্যাসিনী দ্বিরুক্তি না করিয়া জলের অনুসন্ধানে চলিলেন। অদূরে একটী সরোবর হইতে জল আনিয়া রোগিণীর মুখে প্রদান করিলেন।

"আঃ বাঁচিলাম" বলিয়া রুগ্না দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। "কে তুমি মা"! এমন সময়ে আমার এই উপকার করিলে! আমার শেষ অবস্থা"—পিপাসায় প্রাণ বাহির হইতেছিল. তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করিতে পারিব না।"

'ঋণ কি মা! আমাদের কর্ত্তব্যই ত' এই"; পীড়িতের সেবা করাই ত' সেবিকার ধর্ম্ম। তোমার দেখ্‌ছি প্লেগ হয়েছে. আমার মনে হয় যে নিকটস্থ গ্রামে রাত্রে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় রাত্রিতে হিম লাগাইলে জীবনের আশা থাকিবে না।

"জীবনের আশা! এখনও জীবনের আশা! না-না, এখন মরিলেই ভাল, আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ কর যম যেন আমায় কৃপা করে গ্রহণ করেন।"

"সে সব কথা ভাব্‌বার প্রয়োজন দেখি না; তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, তোমার সেবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিলাম। তোমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি গ্রামে যাই—একটু দুধের চেষ্টা দেখি এবং দুই একজন লোক সংগ্রহ করিয়া আনি—তোমায় গ্রামে লইয়া যাইতেই হইবে।"

"না—না, আমার জন্য এত কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। উঃ—বড় পিপাসা"। সন্ন্যাসিনী জল দিলেন, রোগিণী আবার বলিতে লাগিল—"গ্রামে লোকজন নাই—আমি আর বাঁচিব না; এমন দুঃখিনীর মরণই মঙ্গল"।

"দুঃখিনী হইবে কেন মা? তোমার হাতে শাঁখা ও লোহা,—দেখিতেছি তোমার স্বামী আছে স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব। স্বামী থাকিতে স্ত্রীলোক দুঃখিনী হবে কেন?'

স্বামীর কথা শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তখন বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"স্বামী আছে বলিয়াই ত বিশ্বাস করি, তা'ই হাতের শাঁখা ও লোহা, এখনও পরিত্যাগ করি নাই; জানি না তিনি আছেন কিনা।'

"যাক্‌ এখন সে সব কথা আলোচনা করিয়া বৃথা শোক করার প্রয়োজন নাই। তুমি চুপ করিয়া একটু থাক দেখি, আমি আঁচল দিয়া একটু বাতাস করি, একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।

উঃ বড় যাতনা। মৃত্যু বোধ হয় এর চেয়ে সুখের! একটু জল—বড় পিপাসা।"

জল পান করিয়া যেন একটু সুস্থ বোধ করিল, সন্ন্যাসিনী নিজ হাঁটুতে তাঁহার মস্তক রাখিয়া অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে একটু নিদ্রা আসিল। সন্ন্যাসিনীর ক্লান্তি নাই, নিদ্রাভঙ্গে রুগ্না দেখিল যে, তিনি ঠিক সেইরূপ ভাবেই উপবিষ্টা। কাতর ভাবে বলিল,—"মা! তুমি এখনও বসিয়া আছ—এমন উচ্চ হৃদয় আমি চক্ষে দেখি নাই।

"তোমার এখন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই—কথা বল্লে শরীর আরও খারাপ হবে। তোমার জর এখন কমে এসেছে, বোধ হয় মহামায়া তোমায় এ যাত্রা রক্ষা ক'র্‌বেন। প্রাতঃকাল হ'য়ে এল, পূর্ব্বদিক একটু পরিষ্কার হয়েছে,—আমি এইবার গ্রামের দিকে গিয়ে একটু দুধের চেষ্টা করিগে।

"মা, তুমি দেবী কি মানবী, আমি তা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা! যাক্‌ দু'দিন হ'তে এইরূপ অবস্থায় প'ড়ে আছি, এখন যেন একটু সুস্থ বোধ কচ্ছি; যন্ত্রণা

যেন কম পড়েছে, তোমার স্পর্শে বোধ হয় এমনটা হল। বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু গ্রামে ত' লোকজন নাই—আমি আস্‌বার দিন দেখে এসেছি।"

"দেখা ত' যাক্; মায়ের ইচ্ছা!" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী যাত্রা করিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্রাম বাস্তবিকই প্রায় জনশূন্য কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট আছে। একজন পীড়িত লোকের সেবার্থ চারিজন যুবক সন্ন্যাসী নিযুক্ত; রোগীর আহারের জন্য দুগ্ধ দোহন করিতেছে। সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—"আমি বড় বিপদে পড়িয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত, গ্রামের বাহিরে একটী অসহায়া রমণী প্লেগাক্রান্তা হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার জন্য কিঞ্চিৎ দুধের প্রয়োজন।"

তাঁহারা সন্ন্যাসিনীর কথায় বুঝিলেন যে ইনি সেবাব্রত ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা সেই ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র বদনমণ্ডলে মাতৃমূর্ত্তির আভাষ পাইলেন; কারণ তাঁহারাও সকলে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হৃদয়ে একটী নবভাবের ইঙ্গিৎ পাইয়াছেন। তাই তাঁহারা ব্যগ্রভাবে বলিলেন;—"কোথায় সে রমণী পড়িয়া আছে,—আপনি কিরূপে সে সন্ধান জানিলেন? আমাদের লোক ত' সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিতেছে; কিন্তু তাহার সন্ধান ত' পাওয়া যায় নাই; যাক্ উহাকে রক্ষা করিবার জন্য মা আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। চলুন—যাহা প্রয়োজন আমরা তাহারই ব্যবস্থা করিব। উহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—"কালীপদ! তোমার যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন, কারণ কিরূপ অবস্থায় সে আছে—জীবনের আশা কতদূর, এ সকলও জানা আবশ্যক।"

"বেশ" বলিয়া কালীপদ একটী পাত্রে গরম দুধ লইয়া সন্ন্যাসিনীর সহগামী হইল। পথে যাইতে যাইতে কালীপদ বলিল—"মা! আপনি এই মহামারীর কথা শুনিয়া এ পথে আসিলেন কেন?"

"কোন্ পথে যাইব? পীড়িতের সেবাব্রত যাঁহার ধর্ম্ম, সে অন্য পথে গেলে সে কার্য্য হইবে কেন?" এইরূপ নানা কথা বলিতে বলিতে ক্রমে তাঁহারা সেই রমণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দুধ খাইয়া রোগিণী কিঞ্চিৎ আরাম বোধ করিল: দুই দিনের অনাহার—তা'ই সে যেন নব জীবন পাইল বলিয়া মনে করিল।" সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা?"

"আমরা সেবক। আপনার নাড়ী দেখিয়া এবং সাধারণ জ্ঞানে বেশ মনে হইতেছে যে, বাঁচিবার আশা আছে: তবে আমার মনে হইতেছে যে, আপনাকে গ্রামে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। আমাদের আশ্রম

কাশীধাম, তথা হইতে প্রত্যহই লোকজন যাতায়াত করিতেছে। আমাদিগকে অপর ভাবিবেন না, আমরা আপনার সন্তান। সর্ব্বতোভাবে মাতৃসেবাই সন্তানের কর্ত্তব্য।

"আমার উঠিবার কিঞ্চিৎ মাত্রও শক্তি নাই, অতদূর যাইব কিরূপে? আর অন্ত উপায়ই বা কি হইতে পারে?"

"সে ব্যবস্থা আমি করিতেছি।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনীকে তাঁহার নিকট থাকিতে বলিয়া কালীপদ ব্রহ্মচারী গ্রামের দিকে চলিলেন। তিনি গ্রাম হইতে অপর তিন জনকে লইয়া একখানি পাল্কী আনিয়া বলিলেন,—"মা! আসুন, আমরা ধরিয়া আপনাকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিই; আমরাই লইয়া যাইব, কোন চিন্তা নাই।

রমণী তাঁহাদের এই দেবোপম ব্যবহার দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিল না। কাতর ভাবে বলিল,—"আপনারা দেবতা! আমি আপনাদের কে, যে আমার জন্ত আপনারা এরূপ কষ্ট পাইতেছেন? আপনার লোকও এমন করে না।"

"এ কি বলিতেছেন! আমি ত' পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনি আমাদের মা! সন্তান মায়ের পর নয়-নিতান্ত আপন; আপনি আমাদের পর ভাবিবেন না।

ক্রমে তাঁহারা সেই পাল্কী বহন করিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। একটী কুটুরীতে বেশ পরিষ্কার বিছানায় তাহাকে শয়ন করাইয়া ঔষধের ও পথ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার জীবনের আশার সঞ্চার হইলে, সন্ন্যাসিনী তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় চাহিল। এই কয়-দিনের ব্যবহারে ইঁহারা যেন কত আপন হইয়া গিয়াছেন; তাই রোগিণী কাঁদিতে লাগিল। সেই জন্ত এ অবস্থায় তাঁহারা সন্ন্যাসিনীকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না; কারণ এই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ দুঃখের সঞ্চার হইলে পীড়ার বৃদ্ধি হইতে পারে। তাই কালীপদ ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"আপনার কাশী যাওয়াই ত' অভিপ্রেত, কাশী আর বেশী দূর নহে। এতদূর যখন আসিয়াছেন, তখন আর ভয় নাই।"

সন্ন্যাসিনী। ভয়ের জন্ত নয়; এখানে আমার আর কোন আবশ্যক নাই। "কর্ত্তব্য ত' সম্মুখে পড়িয়া আছে, তাহার সমাধান না করিয়া বৃথা বসিয়া থাকি কেন?" ভিতর হইতে এই কথাই শুনিতেছি।

"সে কথা সত্য, কিন্তু যখন স্ত্রীলোকটী এত কাঁদিতেছে, তখন অন্য পথ্য

পর্য্যন্ত আপনার থাকা প্রয়োজন। পরে "কাশী গিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের আশ্রমে একবার যাইবেন।"

"আপনাদের আশ্রম কোন্ স্থানে ?"

কালী। "ঠিক দশাশ্বমেধ ঘাটের সম্মুখে ; বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "মায়ের মন্দির।" ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিবেন, 'মায়ের মূর্ত্তি।' পার্শ্বে একটু দূরেই রোগীগণের থাকিবার স্থান। আপনি কাশীতে গেলেই চক্ষের সম্মুখে পড়িবে। আমরা সেবক সম্প্রদায় সকলেই উমাপদ ব্রহ্মচারীর আদেশে কার্য্য করিতেছি। তিনিও কোন মহাপুরুষের আদেশে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এই স্থানের এই কয়জন রোগী আরোগ্য লাভ করিলেই আমরাও কাশী ফিরিয়া যাইব। আপনি কতদিন তথায় থাকিবেন।

"আমার কিছুই স্থিরতা নাই এবং আমি তাহা জানি না ; ঘটনা স্রোতে চলিয়া যাইতেছি মাত্র। এখানে অবস্থিতি করিতে হইবে ইহাও ত' ভাবি নাই ! পিতা বলিয়া দিয়াছেন যে কর্ম্ম করিয়া যাও, ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত করিও না। যদি কাশী যাওয়া ঘটে, তবে আপনাদের মন্দিরে গিয়া মায়ের দর্শনে চরিতার্থ হইব। আর ব্রহ্মচারী যদি দর্শন দেন, তাঁহারও চরণ বন্দন করিব। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে সেই রমণী কাতর স্বরে বলিল, আপনারা সকলেই কাশী যাইতেছেন এবং যাইবেন ; আমারও কাশী যাওয়া প্রয়োজন। শুনিয়াছি আমার স্বামী কাশীতেই আছেন ; তাঁহাকে একবার খুঁজিয়া দেখিবেন। বেশী কথা যাহাতে না বলে সেইজন্য তাঁহারা বলিলেন,—বেশ কথা! আমরা আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব ও আমাদেরই আশ্রমে রাখিয়া দিব। আর আমরা বহু পুত্র বর্ত্তমানে একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিব, তাহা আর বিচিত্র কথা কি ?

যাহা হউক কয়েকদিন পরে সে রমণী অন্ন পথ্য করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, সন্ন্যাসিনী তথা হইতে যাত্রা করিলেন। কাশীর পথ আলোকিত করিয়া তিনি চলিলেন, গ্রামের অবশিষ্ট যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা ভাবিলেন যে, আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই মহামায়া আবির্ভূতা। (ক্রমশঃ)

বৃদ্ধ বাঞ্ছারাম রাখাল ডাক্তারের পুরাতন ভৃত্য। যতদিন হইতে ডিস্পেন্সারী, বাঞ্ছারামও ততদিনের চাকর। ডাক্তারের পশার, নাম, যশ, ভাগ্যলক্ষ্মী ও ডাক্তারখানার সঙ্গে বাঞ্ছারামের জীবন একই সূত্রে জড়িত। বাঞ্ছারামের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে নূতনত্ব ও বিশেষত্ব বর্জ্জিত একঘেয়ে জীবন। প্রাতঃকালে উঠিয়া ডাক্তারখানা পরিষ্কার, জল তোলা, প্রাতে ও অপরাহ্নে বিলের তাগাদা, সন্ধ্যা সমাগমে আলো জ্বালা ও আমাদের মুহুর্ম্মুহুঃ তামাকু সাজিয়া দেওয়া তাহার নিত্যকর্ম্ম। বৎসরের পর বৎসর এমনি ভাবে কাটাইয়া বাঞ্ছারাম একদিন এই নশ্বর পৃথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিল।

ডাক্তারের সহিত আমার কেবল সামান্য ভাবের বন্ধুত্ব নয়; বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবেই মিশিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর যথারীতি গল্প গুজব, তাস, পাশা, দাবা, পরচর্চ্চা, মুহুর্ম্মুহুঃ তামাকু সেবন। বহুদিনের চাকর বলিয়া বাঞ্ছারামের অভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা বিশেষরূপেই অনুভব করিতাম। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী অথবা কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, সম্মুখে শবযাত্রা দেখিলে কিম্বা হরিবোল ধ্বনি শুনিলে মানুষের মনটা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও কেমন উদাস হইয়া পড়ে। হউক না শ্মশান বা মর্কট বৈরাগ্য; কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যও চিত্ত মধ্যে সংসারের সুদৃঢ় ছাপের উপরে ইহলোকের নশ্বরত্ব ও পরলোকের আভাসে একটা সূক্ষ্ম স্তর জাগিয়া উঠে। মনে হয় এই ত' সংসার জানিতা, শুধু ভোজবাজীর খেলা, সব ফাঁকা—আজ আছে, কাল নাই; কে কার পিতা, কে কার পুত্র, তবে কেন মিছা ছুটাছুটি ক'রে মরি। বাঞ্ছারামের মৃত্যুতে আমাদের মনে ঐরূপ একটা চিন্তা, কথায় বার্ত্তায় ঐরূপ গতি কিছু দিনের জন্য বহিয়া যাইত, কথায় কথায় পরলোকের কথা আসিয়া পড়িত। সেটা স্বাভাবিক—চিরকালই মানুষের মনে পরলোক সম্বন্ধে জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান। তবে আমাদের সকল বিষয়েরই জ্ঞান যেরূপ স্বল্প, ধারণা যেরূপ ঝাপ্সা ঝাপ্সা অস্পষ্ট এবং বিচার যেরূপ ফাঁকা ফাঁকা, এক্ষেত্রেও তাহাই হইত। তবে একটা বিষয়ে ডাক্তারে ও আমাতে স্থির হইয়াছিল যে আমাদের মধ্যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হইবে, সেই অপরকে পরলোকের সংবাদ দিবে।

২

ডাক্তারের ডাক আগে আসিল। প্রবল কলেরায় রোগী দেখিতে দেখিতে বার ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার ইহলীলা শেষ হইল। অবশ্য চেষ্টা বা চিকিৎসার

কোনই ত্রুটী হয় নাই; কিন্তু অনিবার্য্য নিয়তির বশে অথবা দৈব সহায় না থাকিলে, যেমন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষীণ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়, তেমনি আমাদের সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ করিয়া ডাক্তারের প্রাণবায়ু সূক্ষ্মভূতে বিলীন হইয়া গেল। চিতা প্রস্তুত; বিপিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল 'ডাক্তারের বুকটা যেন নড়ছে।' আমরা প্রথমে বলিলাম,—"না না, কিছু না!" শেষে দেখি সত্যই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি মৃদুভাবে বিদ্যমান! তবে কি আমাদের ভুল হইয়াছিল! কখনই নয়। শ্মশান লোকে লোকারণ্য; চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় re-action, স্থায়ী হইলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।"

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ডাক্তার সে যাত্রা সজ্জিত চিতার সম্মুখে পুনরায় পূর্ব্বদেহে প্রতি-পবেশ করিলেন। একটু সুস্থ হইলে, ডাক্তার বলিল ' ভাই, সে বড় আশ্চর্য্য কথা। যদি আমার খেয়াল, কল্পনা বা দৃষ্টি বিভ্রম না হয়, তাহা হইলে বলিব যমরাজ, যমপুরী, চিত্রগুপ্ত, যমদূত প্রভৃতি সকলই সত্য।" ঠিক যেন স্বপ্নাবস্থা, কে বা কাহারা যেন আমাকে বাঁধিয়া—ইন্দ্রিয়াদির বাহ্য বিকাশ স্তম্ভিত করিয়া আকাশমার্গে হু হু করিয়া লইয়া গেল। বহু তোরণ-সম্বলিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, নানা লোক সমাগমে এবং কলরবে ও আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, আমার বাহকগণের মধ্যে বাঞ্ছারাম।" আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত দেখিয়া বাঞ্ছারাম বলিল, "বাবু! আমি যে মরিয়া যমদূত হয়েছি।

চিত্রগুপ্ত আমাকে দেখিয়াই ভৎর্সনা করিয়া বলিল, বাঞ্ছারাম করেছিস কি? এ রাখাল ডাক্তারের এখনো সময় হয়নি, তুই কাকে আনতে কাকে এনেছিস্; যা এখনি ফিরিয়ে দিয়ে আয়। বাঞ্ছারাম রাখাল ডাক্তার অর্থে আমাকেই বুঝিয়াছিল, সুতরাং সে তাহার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমি বলিলাম, বাঞ্ছারাম একটা কাজ করিও, আমার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে আমাকে খবর দিও, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত হইতে পারিব। বাঞ্ছারাম সানন্দে স্বীকৃত হইল। জ্ঞান সঞ্চার হইলে দেখিলাম চিতার সম্মুখে তোমরা সোৎসুক নেত্রে আমার চারি পার্শ্বে বসিয়া আছ।

৩

ডাক্তার এবার নিশ্চিন্ত, পাকা চুলে কলপ দিয়া বেশ স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল। আমি বলিলাম ডাক্তার বুড়া বয়সে এতটা স্ফূর্ত্তি ভাল নয়। ডাক্তার উত্তর দিল কিছু ভয় নাই দাদা, বাঞ্ছারাম আমাকে ঠিক খবর দিয়া যাবে।

ডাক্তারের আবার ডাক পড়িল। এবার আমরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন

যোগাড় করি নাই। একদিন স্বপ্নে দেখি ডাক্তার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য্য হইলাম! ডাক্তার বলিল যে, আমাদের মধ্যে কথা ছিল, যে আগে মরিবে, সে-ই আগে আসিয়া পরলোকের খবর দিবে, তাহা কি ভুলে গেছ? তাই তোমাকে সেই সম্বাদ দিতে এসেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, বাঞ্ছারাম ত' তোমাকে খবর দেয় নি।

ডাঃ। হুঁ', সে জন্য বাঞ্ছারামকে ভৎর্সনা করেছি; কিন্তু সে নিরপরাধ, সে বল্লে সে অশরীরী, সুতরাং আমি তাহাকে দেখিতে বা তাহার কথা শুনিতে পাইব না বলিয়া, সে প্রকারান্তরে খবর দিয়া গিয়াছে। সে বল্লে "কখন এসে চুল পাকাইয়া দিয়াছি, কখন দাঁত নড়াইয়া, গাত্র চর্ম্ম লোল করাইয়া দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মাইয়া বার বার আপনাকে খবর দিয়াছি যে বিলম্ব নাই; কিন্তু তাহাতেও আপনার চৈতন্য হয় নি, দোষ ত' আমার নয়।"

৪

ভাই, বাঞ্ছারাম প্রত্যহ আমাদেরও জীবনে ঐরূপে সংবাদ দিয়া যাইতেছে। এস আমরা যেন ডাক্তারের ন্যায় ইহকাল সর্ব্বস্ব হইয়া পরিণামে না অনুতাপ-গ্রস্ত হই।

বাঞ্ছারামের কোন অপরাধ নাই, আমরা যদি চক্ষু বুজিয়া জেগে ঘুমাই ত' সে কি করিবে; তাহার কাজ সে ঠিক করিয়া যাইতেছে। বাঞ্ছারাম ত' সকলকেই খবর দিতেছে, কিন্তু কই কাহারো ত' চৈতন্য হয় না। লালাবাবুর মত কাহারো ত' বৈরাগ্যের উদয় দেখি না। যথারীতি ঘৃণিত জীবন, কামিনী-কাঞ্চন আসক্ত, রিপুর বশ, মোহের দাস, মায়ার সাগরে নিমজ্জিত, লোক সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মনকে চোখ ঠারিয়া, নিজের কাছে নিজে প্রতারক হইয়া মুষ্টিমেয় রজত খণ্ড বা তুচ্ছ নাম যশের প্রলোভনে চোখ ঢাকা বলদের মত আজীবন ঘুরিতেছি। বাঞ্ছারাম ঘুরিয়া ফিরিয়া জানান দিতেছে, তবু ভাবিতেছি বুঝি অজরামরবৎ ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিব? এ টুকুই সংসারের বৈচিত্র্য, ইহাই কি মাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

এস ভাই, এখনো সময় আছে—এখনো ইচ্ছা করিলে গোবিন্দের কৃপাভিখারী হইতে পারি, তাঁহার কৃপা হইলেই গুরু মিলিবে—"যব্ গোবিন্দ কৃপা করে, তব্ গুরু মিল্ যাই।" তাই বলি বিলম্ব করিও না; এস গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সংযম অভ্যাস করিতে শিখি। কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পন করিয়া তাঁহার চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং তাঁহারই নাম গুণগানে বিগত-কলুষ ধন্য ও কৃতার্থ হই; নহিলে একদিন নেশা ন ছুটিলেই অনুতপ্ত হইবে; কিন্তু তখন আর সময় নাই—উপায় নাই; কেবল মনে হইবে,—

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রইল পড়ে, আবাদ করলে ফল্ত' সোনা।

শ্রীঅরূপচাঁদ গোস্বামী।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। ২য় সংখ্যা।

মোক্ষ] সর্ব্বাত্মিকা।

একটি রতি চোখের জল,
একটি কণা হাসি ;—
একটুখানি মান অভিমান,
ভালবাসা বাসি।
তা'ই নিয়ে কর্‌তেছি বাস,
সংসারে ঘর বেঁধে,
কা'র আদরে হেঁসে উঠি,
কা'র শাসনে কেঁদে?
কাহার অগাধ স্নেহের ছায়া,
মাতৃ-বক্ষে দেখ্‌তে পা'ই?
কা'র করুণা বাবার বুকে?
কা'র পীরিতি বিলায় ভাই?
ভগ্নী, জায়া, কন্যা, বল,
কাহার আদর থেকে;
দুঃখের ক্ষত দূর করে দেয়,
সেবার মলম মেখে?
আততায়ীর বুকের মাঝে,
কাহার দ্বেষের বিষ;
কা'র অনাদর ব্যাধিরূপে,
জ্বালায় অহর্নিশ?
আমার তোমার সবার যাহা,
সব যে দেখি একই মত;
কেমন করে, বল তাহা,
করি 'আমার' সংজ্ঞাগত?
পশু, পাখী, সাপের মায়ের,
বুকের মাঝের স্নেহ-কণা,
তোমার আমার মায়ের স্নেহে,
হয় নাকি ভাই তার তুলনা?
দিবার কোলে রাত্রি যাঁহার,
আলোর কোলে শোভে আঁধার;
সুখের কোলে দুঃখও তাঁহার,
'সর্ব্ব' আধার, সেই মা আমার।
তাঁরি 'গুণে'র রূপের কণা,
সকল জগৎ জুড়ে আছে;
'দ্রব্য' 'ক্রিয়া' 'ভাব' রূপেতে,
তিনিই রাজেন জগত মাঝে।
তাঁ'র সোহাগে তিনিই তাঁ'রে,
আদর ক'রে কোলে কোলে;
বিরাগ ভরে তাঁ'রেই তিনি,
দলেন আপন চরণ তলে।
তুমি আমি তাঁ'র বিভূতির,
তুচ্ছ কণায় কণা সব;
তাঁর ধ্বনি 'আমি' রবে—
তুল্‌ছে তাঁ'রি কল-রব।

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক-চৌধুরী।

ভাগবতে অমোঘলীল শ্রীভগবানের রাসলীলার বর্ণনা কালে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী প্রথমেই বলিয়াছেন,—"তস্মাদ্রাসক্রীড়া বিড়ম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বং কিঞ্চ শৃঙ্গার কথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তিকরিষ্যামঃ॥" অর্থাৎ কাম জয়ের জন্যই রাসলীলা; ইহারই তত্ত্বকথা শৃঙ্গার কথার ছলে বিশেষরূপে এই পঞ্চাধ্যায় নিবৃত্তি-পরায়ণ। ইহার সার কথা গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন। এই মিলন মানব মানবীর দেহাসক্তি নহে; কাম-প্রণোদিত আত্ম-সুখেচ্ছা-পরায়ণ নরনারীর প্রাকৃত বিলাস-চিত্র নহে; ইহা সেই অপ্রাকৃত মদনমোহনের সহিত চিন্ময়ী পরা প্রকৃতির প্রেম বিলাস বৈচিত্র্য। শ্রীমতি রাধিকা এই গোপীগণের অগ্রণী। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।"

এই মহামিলন বৈষ্ণবের ধ্যানের বস্তু, ভক্তির চরম আদর্শ, রাগানুগা ভজন-পরায়ণদিগের উপজীব্য। বিরহ, মিলন, অন্তর্দ্ধান যাহা কিছু, তাহা কেবল রস-পুষ্টির জন্য—ভক্তগণকে শিক্ষা দিবার জন্য—প্রেমভক্তিরূপ ক্ষুরধারবৎ শাণিত মার্গ জীবকে দেখাইবার জন্য।

মানব-মানবীর মিলনে কাম আছে; কিন্তু মন্মথ-মন্মথের সহিত তাঁহার নিজ প্রকৃতির মিলনে কাম থাকিবে কিরূপে? শক্তি ও শক্তিমানের মিলন নিত্য মিলন, অবিচ্ছিন্ন মিলন রস-সমুদ্রের সহিত ভাবতরঙ্গের নব নব উচ্ছ্বাস। যাহা নিত্য তাহা সর্ব্বকালে সত্য; সর্ব্বজনের ভিতর দিয়া সেই লীলারস প্রবাহিত হইতে পারে। মায়াসমুদ্রে ভাসমান জীবের ইহা দুরাশার কথা হইলেও নিরাশার কথা নয়। কারণ জীবও তাঁহার প্রকৃতির বাহিরে নয়; বস্তুতঃ সর্ব্বাত্মার সহিত সর্ব্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। তবে যে সে লীলা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার হেতু লীলার অনস্তিত্ব নহে, পরন্তু সেই লীলা-দর্শনোপযোগী মানসিক চক্ষুর অভাবই ইহার কারণ। মহাপ্রভু রঘুনাথকে এই মানসিক সেবার উপদেশ দিয়াছেন—"ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।" মনের বহির্ম্মুখী ভাবনিচয়কে সম্যক্‌ভাবে একমুখী করিয়া, দেহাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সেই নিত্য মিলন দেখিতে চেষ্টা করিলে, তিনি নিশ্চয়ই প্রকট হইবেন। তিনি যে গোপীদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই সত্য-সংকল্প সত্য-ব্রতের সংকল্প যে অচল অটল। তাঁহারই বাণী

মধ্যেব মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।

অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ১০।৪৭।৩৬ *

এই অনুস্মরণ বা মানসিক চিন্তা রাগানুগা ভজনের প্রাণ। মহাপ্রভু এই অনুস্মরণ পণালী দেখাইবার জন্যই অবতীর্ণ। এই অনুস্মরণ তীব্রতা প্রাপ্ত হইলে, সেই ধ্যেয় বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু চিত্তে স্থান পায় না। জীব গোস্বামী এই স্মরণের স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মন দ্বারা শ্রীভগবানের যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'সামান্য স্মরণ'। মন তখন বহির্ম্মুখী বটে, কিন্তু অন্তর্ম্মুখী হইবার প্রবণতা জাগিয়াছে। যখন মন বহু বিষয় হইতে 'এক' বিষয়ে আবদ্ধ থাকে, তখনই ধারণা। গীতায় ইহা 'ধৃতি' নামে কথিত হইয়াছে,— "শনৈঃ শনৈরুপরমেদ বুদ্ধ্যাধৃতি গৃহীতয়া।" তৎপরে 'ধ্যান'—এই ধ্যান অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলেই, 'ধ্রুবানুস্মৃতি'। কেবল ধ্যেয় বস্তুর স্ফুরণের নাম 'সমাধি'। সে অবস্থায় 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান থাকিতে পারে না; থাকে কেবল কি এক রূপের স্রোত। সে রূপ প্রাকৃত রূপ নহে, কারণ সে রূপ চির নূতন—চির-সুন্দর, চিরমধুর। সে রূপ যে দেখিয়াছে, সেই বলিয়াছে,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।

তখন— আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥

এই অনুস্মরণ বা অনুধ্যান রাগানুগাভজনের প্রধান ভিত্তি। ইহাই নরোত্তমের "সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা"। ইহা কল্পনা নহে, প্ররোচনা নহে, বাস্তব সত্য।

কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ইহার নিত্যতা
অদ্ভুত ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা বাথা॥

যাহাতে এই নিত্য মিলনের স্রোত জীব-হৃদয়ে সহজে প্রবাহিত হয়, প্রেমের এই মিলন-চিত্র জগতের জীবকুলের বুদ্ধি-দর্পণে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, জীব-প্রকৃতি ভগবানের স্বরূপ-প্রকৃতি হ্লাদিনী শক্তিতে পরিণত হইয়া যাহাতে ভক্তের পরিপোষণে সমর্থ হয়, তজ্জন্যই রসিক-শেখরের এই মানুষী ক্রীড়া।

---

* অশেষ বৃত্তি হইতে বিমুক্ত মন অর্থাৎ যখন মনের শেষ হয়, তখন সম্যক্‌ভাবে আমাতে আবিষ্ট করিয়া নিত্য আমাকে স্মরণ করিলে অচিরাৎ আমি উপস্থিত হইব।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যং শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশই এই লীলার মুখ্য তাৎপর্য্য। তবে যে তাহাতে আমরা কামচিত্র দেখিতে পাই, ইহার কারণ আমাদের আত্মগত জন্ম-জন্মান্তরীন কামের অভিব্যক্তি। যদি সেই লীলা দর্শনের ইচ্ছা থাকে, তবে গোপীদিগের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারা এখনও লিঙ্গদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবন মধ্যে নিত্য বিরাজিত। এ উক্তি সেই সর্ব্বভূত-হৃদয় শুকদেবের—

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।

তদনুস্মরণধ্বস্ত-জীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥১০।৮২।৪৭

সেই গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি ভাগবতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। সেই গোপবালাদিগের আত্মোৎসর্গ দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত; দেবকুল, ঋষিকুল, ব্রহ্ম;—মহর্ষি দেবর্ষি সেই গোপীভাবে আত্মহারা। সর্ব্ব সমর্পণ করিয়া "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণব্রজ" এই বাক্যের সার্থকতা করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। এ মিলনে গোপীদিগের আত্মচিন্তা নাই, আপনাদের সুখ কামনা নাই; আছে কেবল কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যমূলক ফলানু-সন্ধান-বর্জ্জিত অহৈতুকী মনোগতি। কিন্তু এ প্রেমেও অভিমানের সঞ্চার হইয়া, এ মিলনেও কৈতব আসিয়া জুটিল।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।

আত্মানং মেনিরে স্ত্রীনাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি। ১০।২৯।৪৭

ভাবিলেন "আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই; ভগবান আজ মনুষ্য রূপে আমাদের সহিত রমন করিলেন! আমরা আজ জগতের মধ্যে ধন্য হইলাম।" গোপীগণ! সত্যই তোমরা ধন্য—তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জগতে যে আদর্শ রাখিয়া দিলে, তাহা অতীব অপূর্ব্ব! তোমরা জগতে আজ ত্যাগের গুরু;—জগত তোমাদিগকে সেইভাবে দেখুক। তোমরা আপনাকে সেইভাবে দেখিতে গেলে কেন? যেই আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিলে, অমনি একটু অহংকার জাগিয়া উঠিল; অমনি ভগবান অন্তর্হিত হইলেন।

ভক্তগণ! ভাল করিয়া দেখুন এ অভিমানটুকুও সেই প্রেমময়কে দূরে লইয়া গেল। আর মান-গর্ব্বিত ভিন্নদর্শী বিশিষ্টতার মোহে আচ্ছন্ন 'আমি' আপনাকে ভক্তজ্ঞান করিয়া, ভেদ ভাবে সেই অখিল রসমূর্ত্তির সহিত মিলনের

আশায় বসিয়া আছি। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, দুর্জ্জয় গৃহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, কৃষ্ণ-সঙ্গম-সৌভাগ্য-অভিমানে আজ গোপীরা যাঁহার সঙ্গমে বঞ্চিত হইল, পূর্ণ আমিত্বের অভিমান লইয়া সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা বাতুলতা। ভগবানের যাঁহারা হ্লাদিনী শক্তি হইবেন, তাঁহাদের এই আমিত্বাভিমান লোপ হওয়া চাই; অবিদ্যার লেশ থাকিলে চলিবে না। তা'ই বিরহাগ্নি দ্বারা সেই অহংকার নাশ করিবার জন্য ভগবানের অন্তর্দ্ধান। সেই অঙ্গ সঙ্গে শ্রীমতীর এ অভিমান হয় নাই; তা'ই অন্তর্দ্ধান-সময়ে শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এখানেও সেই ভ্রম—"সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাং"। এ ত' হইবার কথা; কারণ তিনি দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই ভাব মনে আসিতেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান। অভিমানের মূল ভেদাত্মক বিশিষ্টতা: যেখানে বিশিষ্টতা, সেখানে কৃষ্ণ নাই। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিলে, হয়ত' শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়; বাহিরে প্রেমিক সাজিয়া বৈষ্ণবাভিমানী বা ধর্ম্মাভিমানী হইয়া, কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বস্তুতঃ চাই না; চাই ধন, মান, যশ, কামিনী-কাঞ্চন। যদি কখনও চাই, তা'ও ঐ বিষয়ের জন্য। তা'ই অন্তর্য্যামী আমাদের প্রার্থিত বস্তু অবিরত যোগাইতেছেন। আমাদের বিরহ হইবে কোথা হইতে? মিলনের পর না বিরহ? মিলনের সঙ্গে যাহার খোঁজ নাই তাহার বিরহ? গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল, তাই তাঁহার অন্তর্দ্ধানে তাহাদের বিরহ গীত। বিরহের পর যে মিলন, সে মিলনে কেবলই অমৃত ক্ষরণ। ভক্তের বৃত্তি তখন ভগবানে পূর্ণরূপে লীন। তাহাতে অন্য চিন্তা স্থান পায় না। ঐ দেখুন,

> প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া　　তা'র গুণ সঙরিয়া,
> মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
> রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি　　কহে হা হা হরি হরি,
> ধৈর্য্য গেল হইল চপল।

রত্নলাভ করিয়া ধনবান ব্যক্তি সেই বহুমূল্য রত্ন হারাইলে, তাহার আর অন্য চিন্তা থাকে না; ক্ষুৎপিপাসা পর্য্যন্ত লোপ পায়। কেবল সেই রত্নের গুণ-স্মরণ এবং তজ্জনিত সন্তাপ, তখন প্রধান অবলম্বন। গোপীগণের প্রেম অতীব অদ্ভুত;

> আত্ম সুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার।
> কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥

ইহার ধারণা আমরা করিতে পারি না; ভজন সাধন ত' দূরের কথা। আমাদের সকল ব্যবহার বিশিষ্ট 'আমির' সুখের জন্য। বিশিষ্ট 'আমির' প্রীতির জন্য ব্যবহার, গোপীভাবের সাধনার প্রতিকূল। দেহাভিমানী 'আমি' এ পথের পথিক হইতে পারে না; মমত্বাভিমানী 'আমি' এ ভজন পথ হইতে বহুদূরে। গোপীদের যে নিজ দেহে প্রীতি ছিল না এমত নহে, তবে সে প্রীতি কৃষ্ণের জন্য, তাঁহাকে অর্পিত এবং তাঁহার সম্ভোগ-সাধন বলিয়া গোপীদিগের সকল সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসিত। যখনই গোপীগণ আপনাকে আপনার জন্য ভাবিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত। যখন গোপীগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। গোপীবল্লভ আপ্তকামের এই প্রেমের ভজনে হাসিতে হাসিতে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

আর বাকী থাকিল না 'অহং' এবং ধর্ম্মাভিমান 'স'এ ন্যস্ত করিয়া শ্রীমতী রাধিকার সহিত গোপীগণ এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। জীবন্মুক্ত গোপীগণ রাসমণ্ডলে আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে মিশিয়া গেলেন। মধুর লীলার ইহা শারদীয় পূর্ণিমা—ভক্তগণের চরম আদর্শ—মানুষের সহিত ভগবানের চরম একত্ব। এই নূতন ভাবের শুভ্র আলোক-রশ্মি দেবতাদিগকেও মুগ্ধ করিল; ভক্তগণ সেই লীলার অপূর্ব্ব চিত্র মানস চিত্রে দেখিবার জন্য পিপাসিত হইয়া উঠিল। ধন্য গোপীগণ! আজ তোমরা জগতের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিলে; তোমাদের অকৈতব প্রেমে শাস্ত্রযুক্তি ভাসিয়া গেল; ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে সর্ব্বেশ্বর বাঁধা পড়িলেন। যদিও শ্রীভগবান তাহাদিগকে পরিতপ্ত করিবার জন্য অন্তর্হিত হন নাই, তথাপি তিনি অভূতপূর্ব্ব এই প্রেমের ত্যাগ ধর্ম্মে মুগ্ধ হইলেন। যাহারা ইহলোক, পরলোক, বেদধর্ম্ম, স্বজন, পরিজন ত্যাগ করিয়া এই ঘোররূপা ঘোর-সর্ব্বানির্বেবিত রজনীতে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের ঋণে তিনি আবদ্ধ হইলেন; তাই বলিলেন,—

ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ

যামাভজন দুর্জ্জর গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥১০।৩২।২২

গোপীগণ! শ্রীভগবান আজ তোমাদের সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ। বাস্তবিক তোমরা যেমন দুর্জ্জয় গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছ! তিনি ত' সেরূপ করেন নাই। তোমরা একনিষ্ঠ; তিনি ত' "সো বহুবল্লভ কান।" "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য" বাক্যের ষোল আনা তোমরা পূর্ণ করিয়াছ; তাহার বাক্‌চাতুর্য্যে তোমরা ভুলিও না। তিনি যে বলিতেছেন 'দেবতায় পরমায়ুকাল

পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত সাধু ব্যবহার করিলেও ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না'; ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তিনি ত' প্রতিজ্ঞা-বদ্ধই আছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্তাংস্তথৈব ভজাম্যহং,—

তাহার কি হইবে? তাঁ'র প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করুন! জগৎ বুঝুক যে ভগবান ভক্তের বশ; ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে কত আপন করিতে পারা যায়। তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই যে তোমাদের সাধু ব্যবহার প্রতিকৃত হউক বলিতেছেন, ইহা ত' ভালই। ঋণ পরিশোধের পন্থা জানা থাকিলে, সেই পন্থা অবলম্বন করিলেই ত' হইল। ভাল কথা, তিনি নিজে অঋণী হইতে পারিবেন না; পারিবেন কেন? বহু-নিষ্ঠায় কখনও এক-নিষ্ঠার ঋণ শোধ হয় না। হে সত্য-সংকল্প ভক্তের প্রাণধন—ভক্তের মহিমা কীর্ত্তনে পটু শ্রীকৃষ্ণ! ভক্তকে তুমি ভালরূপে জান! ভক্ত তোমার হৃদয়; এ ত' তোমারই কথা। তোমার আবার ঋণ অঋণ কি? এও সেই ভক্তের মহিমা ব্যঞ্জনা। তুমি গোপীদিগের নিকট ঋণী হও বা না হও, জগৎ একশ'বার গোপীদিগের নিকট ঋণী। হে জগন্নাথ! জগতের এই ঋণেই ত' তোমার ঋণ। সেই ঋণ পরিশোধ চিন্তাই তোমার কাল-অঙ্গ গৌর করিয়াছে। চিন্তার দ্বারা রূপের পরিবর্ত্তন বাস্তব সত্য। যেমন—

কীট পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাংস্তেত প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎস্বরূপতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপম্ সংত্যজন॥

শ্রীমতীর কান্তি চিন্তায়, কাল-অঙ্গ গৌর হইয়া গেল; সুশীলতার ঋণ শোধের জন্যই ত' শ্রীমতীর ভাব অবলম্বন! গোপীদিগের ঋণ শ্রীমতীর ভাব অবলম্বনেই শোধ হইতে পারে; কারণ গোপীগণ সেই কল্পলতিকার কিশলয় ও পত্র-পুষ্প—

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥

এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। চিন্তার প্রাবল্যে দুই তনু এক হইয়া গেল। দ্বৈত-ভাব অদ্বৈতে পরিণত লইল। ভক্ত দেখিতে পাইল—"রাই কানু দুঁহু তনু, এক হৈয়া আছে"। নরোত্তম ঠাকুর ধ্যানে এই চিত্র দেখিতে পাইলেন,—

রাই অঙ্গ ছুটায়,　　　　উদিত ভেল দশ দিশ,
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ,　　　　গৌর নিকুঞ্জ বন,
রাইরূপে চৌদিগে পাথার।

গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল,
রাইরূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয়, অপরূপ রূপ নয়,
দুঁহু তনু একই মিলিত ॥

বৃন্দাবনের এই চিত্র,—নবদ্বীপে প্রকত গৌরাঙ্গ। বৃন্দাবনে যুগলে এক ; নবদ্বীপে তাহা একে যুগল বা একে দুই ; তিনি একাধারে রাধাকৃষ্ণ। ইহা রূপ গোস্বামীর ধ্যানের বস্তু : "অন্ত কৃষ্ণ বহিগৌর"। ভাব ও কান্তি অবলম্বন সেই ঋণ পরিশোধ জন্য ;—আর জগতের জীবকে বুঝাইবার জন্য,—"হে জগতের জীব যদি আমাকে পাইতে চাও, তবে গোপীভাব অবলম্বন করিতে হইবে। আমার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য, আমাকেই শ্রীমতীর ভাব অবলম্বনে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে" বলিয়া কাঁদিতে হইতেছে।" এই ভাব ভিন্ন অন্যভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। গোপীর আনুগত্য ভিন্ন রাগানুগা মার্গের অন্য সাধনা নাই—

সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী-ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবায় সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

এই সাধনার পন্থা দেখাইবার জন্যই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ। এই দিব্যোন্মাদে বিশিষ্ট ভেদাত্মক অভিমত্বের পূর্ণ লোপ। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি ইহার মূল ভিত্তি। এ প্রেমে মান অভিমান নাই। আদর অনাদরে হ্রাস বৃদ্ধি নাই ; সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া সেই প্রাণনাথের প্রেমমূর্ত্তি। তাই মহাপ্রভু ভাবাবেশে বলিলেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ ॥*

এই গোপীভাবের বিরহ উচ্ছ্বাসে তাঁহার নীলাচলে বাস ; বঁধুর, কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠা ও তীব্র অনুরাগই তাঁহাকে সমুদ্রের বেলাভূমিতে আনয়ন করিয়াছে !

---

* প্রেমাবেশে বাহুপাশে বান্ধিয়া সে মোরে।
পেষণ করুক এই পদারতা মোরে ॥
অথবা দর্শন দান না করিয়া হায়।
পরম মর্ম্মহতা করুক্ আমায় ॥
সে লম্পট যা খুসি তা' করুক বিধান।
আমারই সে প্রাণনাথ কভু নহে আন।

ভাই সব, যদি মহাপ্রভুকে বুঝিতে চাও, তবে সেই বৃন্দাবনের লীলা স্মরণ কর; সেই আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগলমূর্ত্তি ধ্যান সহায়ে দেখিতে চেষ্টা কর; দেখিবে সেই নিকুঞ্জ কাননে—

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল,
মদন-মদালসে ভোর।
ভুজে ভুজ বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন,
যেন কাঞ্চন মণি যোড়॥

আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মূর্ত্তি, আজ মানস-কুঞ্জে এক হইয়া গিয়াছে। বাস্তব কথা এই যে, কেবল লীলা-রস পুষ্টির জন্যই দেহ-ভেদ; নতুবা এক প্রাণ এক মন—

দুঁহু তনু এক মন, নিবিড় আলিঙ্গন,
দুঁহু জন একই পরাণ।

সে চিত্র ভক্তের বড় লোভনীয়; যেন ত্রিভঙ্গিম তমাল-তনু প্রেম-লতিকায় বেষ্টিত; যেন নব জলধরের কোলে স্থির বিদ্যুতের আভা। সে মিলনে—এক টুকুও বিচ্ছেদ নাই—

ভুজে ভুজে দোঁহে দোঁহা বাঁধি।
পবন পশিতে নাহি সন্ধি॥

এই যুগল-মূর্ত্তি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ। যে এই গৌরাঙ্গ দর্শন করিয়াছে সে নিশ্চয়ই বলিবে—

এ তিন ভুবনে যার, তুলনা দিবার নাই,
গোরা মোর পরাণ পুতলী।

তাহার জানা চাই—গোরা মোর পরাণ পুতলী। নতুবা গৌরাঙ্গ দর্শন হইবে না; সেই প্রেমাবতার প্রেমের প্রকট চিত্র দেখাইবার জন্য ভক্ত-বেশে,—

না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে,
যাচিয়া দেওল প্রেমধন॥

ভিতরের কথা—গোপীদিগের ঋণশোধের জন্য রাগাত্মিক-ভাবে স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন। এ কথা অতিশয় গূঢ়;—কেবল "দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার।"

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥

তা'ই স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন।—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা।
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশোবা মদীয়ঃ॥
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ।
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী গর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ *

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এমনই শক্তি! আজ শ্রীকৃষ্ণ সেই মাধুর্য্যের আকর্ষণে রাধা ভাব অবলম্বন করিলেন! জগৎ একবার ভাবিয়া দেখ, সেরূপই কিরূপ আর সে প্রেমইবা কিরূপ? সে প্রেমে স্মৃতিতে বিস্মৃতি, দিবসে রজনী জ্ঞান; সে প্রেম অদ্ভুত—সে প্রেম অপ্রাকৃত—সে প্রেম নিরুপাধি—কে তাহার বর্ণনা করিবে?

সজনি প্রেমকো কো কহ বিশেষ।
কানু ক' কোরে কলাবতী কাতর
কহত 'কানু পর দেশ'।

সেই প্রেমের ভাব লইয়া অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-সত্ত্বা বিদ্যমান থাকিলেও রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ যেন রাধিকার ভাষায় বলিতেছেন,—

কাঁহা গেও সো বন্ধু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
এ যেন,— হেম আঁচলে বন্ধ যৈছন খোঁজি
ফিরত আনহি ঠাঁই॥

এই প্রেমের চিত্র অভিনয় করিতে করিতে, মহাপ্রভু এখনও ভক্তের সম্মুখে প্রকট। কারণ সে লীলার নায়ক ভক্তের পরাণ পুতলি গোরা . সে লীলার আবির্ভাব তিরোভাব কেবল ভাষার কথা। কে আছ প্রেমিক! হাত পাতিয়া সেই প্রেম ফল গ্রহণ কর। সময় যেন বহিয়া না যায়? (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

---

* শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ? তিনি সে প্রেম কিরূপে আস্বাদন করেন, আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বা কিরূপ, আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধাই বা কিরূপ আনন্দলাভ করেন, এইরূপ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপ সমুদ্র মধ্যে রাধাভাব সম্বলিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

মোক্ষ]

মুখস্ পরা।

মেঘের মত উদাস ভরা, মূর্ত্তি কা'র ও হেরি।
অগ্নি জলে আঁখির পরে, দেখলে ভয়ে মরি॥
বিমুখ হয়ে রয়েছ বসে, শুষ্ক পাংশু মুখে।
জিজ্ঞাসিলে শ্বাসটি ফেল গভীর দুঃখ শোকে!
চিনেছি এবার তোমায় বন্ধু! আর কি কভু ডরি!
মুখটি গুঁজে মধুর হেঁসে, যাচ্চ কোথায় স'রি?
এস ওগো শ্রান্তি-হর, এস আমার মিতা।
মুখস্‌খানি খুলে এস, ঘুচুক ব্যাকুলতা॥

———

মোক্ষ]

ঔপনিষদিক দর্শন ও যোগমায়া।

সর্ব্বাত্মভাবই আবার সর্ব্বেশ্বর আত্মার যে সর্ব্বস্ব তাহা নহে। সেই অপার অনধিগম্য পুরুষকে কে কবে বাক্য ও মনের দ্বারা গোচর করিতে পারিয়াছে? তিনি যে চিরদিনই পিছাইয়া যান্। "It is unattainable because it for ever recedes· You can enter the light, but you can never touch the flame." —Light on the Path,

তুমি যতই যাইবে ততই আরও যাইতে হইবে—এ যাত্রার শেষ নাই, পরিসমাপ্তি নাই। ক্ষুদ্র জীব আমরা—অহঙ্কারের দাস —বিশিষ্টতার মোহে বদ্ধ। তা'ই আমরা অপার অনন্ত অসীম; গতির দিকে চাহিতে ভয় করি—পিছাইয়া যাই, ভাবি পাছে আমার নামরূপের এত সাধের পোষা 'আমি'টী হারাইয়া যায়। তা'ই আকাশ বাতাস অন্তরেন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় সকলেই তাঁ'র কথা—তাঁ'রি গান—তাঁ'রি সৌন্দর্য্য দেখাইলে ও শুনাইলে আমরা আমাদের 'আমিটাকে' ছাড়িতে চাহি না। আমাদের—

"সব সখি মেলি শুতায়ল পাশ, চমকি চমকি ধনী ছোড়য়ে নিশ্বাস।
করইতে কোড়ে মোড়ই সব অঙ্গ, মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল ভুজঙ্গ"
(বিদ্যাপতি)।

তিনি পরাগতি। তাঁর যে ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছায়া—এই 'অহম্'টা,—তার দিকে তাকাইয়া দেখ ত' ভাই ; সেও কি পরাগতি নহে—সেও কি সমস্তঃদ্বন্দ্বের প্রতিঘাত সহিয়া সহিয়া প্রস্ফুটিত হইতে হইতে কোন এক অনির্দ্দেশ্য পথে চলিতেছে না ? সেও কি শব্দের ভাষায় "অ" হইতে "হ" পর্য্যন্ত—আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত –অ-ক্ষরের ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া অনির্দ্দেশ্য অবোধ্য "ম্"কারের দিকে চলিতেছে না ? তাই আমরা বস্তুর কোনটাতেই আট্‌কাইয়া থাকি না ; কোন বিশিষ্ট বস্তুই আমাদিগকে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে পারে না ; কিয়ৎক্ষণ ভোগের পর আবার মন অন্য পদার্থ সম্ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়।

উপনিষদে এজন্য আত্মতত্ত্বের বা ভগবৎ তত্ত্বের দুইটী বিভাবই (aspects) বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে। উপনিষদে ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ং"ও বলিয়াছে, "সর্ব্বং খল্বিদং"ও বলিয়াছে। ঐ "একমেবাদ্বিতীয়ং" তাঁর পর ভাবের (transcendent aspect) ইঙ্গিত করে ; ও "সর্ব্বং খল্বিদং" তাঁর 'সর্ব্ব'ভাবের পরিচায়ক। স্বরূপে যিনি পর, বিবর্ত্তে তিনিই সর্ব্ব। সেই পর-পুরুষ এমন যে,—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

তাঁহা হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতি মুহূর্ত্তে উদ্ভূত ও মুহূর্ত্তেই তাঁহাতে লীন হইতেছে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে শেষ (exhaust) করিতে পারে না। তিনি চিরদিনই অক্ষররূপে বিরাজিত ও সর্ব্বে অধিষ্ঠিত আছেন। যেমন কোটি কোটি বস্তু তাঁহা হইতে গ্রহণ করিলে তাঁহার ক্ষয় হয় না—তেমনি কোটি কোটি বস্তু যোগ করিয়াও তাঁহার ইয়ত্তা বা পরিমাণ করা যাইতে পারে না। উপনিষদের অনেক স্থলেই আকাশের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা করা হইয়াছে। যেমন ঘটাকাশ বা পটাকাশ, আকাশকে কমাইতে পারে না, কেবল কাল ও স্থান (time and space) রূপ মৌলিক একটী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিজ্ঞাপনের ভাব দেখাইয়া থাকে ; তদ্রূপ ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব কোটি কোটি জগতেও পরিমাপিত করিতে পারে না।

চন্দ্র তাঁ'র জ্যোতি আঁকে, সূর্য্য তাঁ'র প্রভা ও প্রাণ আঁকে ; আকাশ মহাশূন্য তাঁর শব্দ ও পরিসর আঁকে—বায়ু তাঁর স্পর্শ আঁকে ও "সর্ব্ব" শরীরের ভিতরে ও বাহিরে সুরধুনীর প্রেমধারা বহাইয়া দিয়া যায়। শ্রীভগবানের মহারাসে

প্রত্যেক গোপিকাই স্ব স্ব ভাবানুযায়ী তাঁর রূপ, পার্শ্বে,—অন্তরে, বাহিরে নিরীক্ষণ করে। কিন্তু তিনি মানের অতীত;—তিনি গোপিকাবর্য্যা মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজরমণী-মণি তাঁর হ্লাদিনীকেও বিষাদের আঁধারে ডুবাইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়া যান্। তিনি নিম্নে প্রদত্ত অনন্ত রাশির (infinite series).

A (জাতি) = a_1(ব্যক্তি) + a_2 (ব্যক্তি) + a_3 (ব্যক্তি + a_4 (ব্যক্তি) + &c. বড় Aটার ন্যায় ভাবাভাব অগ্রাহ্য করিয়া "সর্ব্বান অতিরিচ্য বর্ত্ততে"। এই পরভাবে তখন তাহাতে কোন বিশেষণই প্রযুক্ত হইতে পারে না। তখন তিনি নিষেধ মুখে—

"তদ্বা এতক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্র বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" (বৃহদারণ্যক, অধ্যায়—৮ম ব্রাহ্মণ) এইরূপে উক্ত হয়েন। এই সর্ব্বের তাঁহাতেই উদ্ভব--তাঁহাতেই লয় হয়। তিনি "সর্ব্বেশ্বর" "পর পুরুষ", ও তাঁর চিদ্বিভাব তখন "সর্ব্ব-নাশিনী"।

একটী সামান্য মৃৎপিণ্ড লইয়া দেখুন. ঐ সামান্য বা অণুর মধ্যে তিনি অনীয়ান্ হইয়াও তবু যে কি অপার অনন্ত মহিমায় প্রকাশিত হইতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? বস্তু সত্বার শব্দ বা দ্যোত্য (denotation or connotation) সম্পূর্ণ কে কবে দিতে পারিয়াছে? কে কবে কোন জিনিষকে পূরাভাবে সংজ্ঞা দিতে পারে? তাই তিনি আমাদের কাছে বড় হইয়াও যেরূপ পূরাপূরি, ছোট হইয়াও ঠিক সেইরূপ পূরাপূরি হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন।

God is as perfect in an atom as in the whole universe" মানুষ কবে তাহার চিত্তকে এক জায়গায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে?—সে যে আজ কত দিন থেকে "পর" পুরুষের অভিসারে চলিয়াছে। তাই "সর্ব্ব" তা'কে "পূর্ণের" —"পরের" বিভ্রম দেখাইয়াও ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে অবিরাম ছুটে; অবিরাম গতিতে "বহুর" দিকে ছুটিয়াও, সেই মায়ার অতীত পুরুষেরই পাছে পাছে—বিরজার পরপারের দিকেই ছুটিতেছে। সর্ব্ব তাকে ব্যক্ত বহুত্বের মধ্যে ছুটাইয়া পরভাবের ইঙ্গিত দেখাইতেছে।

তাই সর্ব্বের সর্ব্বত্রই পরিণাম। সর্ব্বের মাপ-কাটি জীবের কল্যাণার্থ প্রতি-নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,—"জীব! তুমি ত' প্রত্যহই ধন, জন, পুত্র, পরিবার, বিষয়, বৈভব সকলের দাসত্ব স্বীকার করিতেছ। তোমার 'আমি'টাকে অনুক্ষণই ক্ষুদ্র বিশিষ্ট ভাবের সহিত জড়াইয়া ফেলিতেছ ও তাহার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে নিজে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ; তোমার ত'

দাসগিরি করাটা সহিয়া গিয়াছে,—অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে। তবে একবার ভাব ত' জীব! তুমি "কৃষ্ণদাস"। তোমার অভিমানটা একটু উচ্চ সুরে চড়াইয়া বাঁধ। যদি জলই খাইতে হয়, পচা ডোবার পচা জল না খাইয়া হ্রদের বা গঙ্গার সুনির্ম্মল বারি পান কর, তবে ত' আনন্দের অমৃতের অধিকারী হইবে।" এই রূপে সর্ব্বের সর্ব্বময়কে উপলব্ধি বা আপন করাইতে "সর্ব্ব" সর্ব্বদাই আমাদের আমিটাকে একটু একটু ক'রে উচ্চ সুরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। জীব জগৎ সবাই এই মহাযাত্রার পথে পথিক; কাহারও বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নাই। সর্ব্বের 'আমি'টা যেন ব্যাকুল হইয়া, জীবের 'আমিটা'কে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। অথবা 'সর্ব্ব' ক্রমেই "পর"কে প্রকাশিত করিতে করিতে—পরের ছবি দেখাইতে দেখাইতে চলিয়াছে। কিন্তু 'পর' যে অসীম—পর যে সর্ব্বদাই ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়—"ব্যতিরিচ্যতে"; তা'ই সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতি, পর-পুরুষকে কেবল ছবি, কেবল ইঙ্গিত, কেবল ইসারা করিয়া যাইতেছে। প্রকৃতি তা'ই নর্ত্তকী।

দর্শনের পরিভাষায় এই 'সর্ব্ব'ও পরের খেলাকে অন্বয় (immanence) ও ব্যতিরেক (transcendence) বলে। অন্বয় কেমন? যেন একটা ঢাকনি আছে,—কিন্তু ঢাকনিটার বা উপাধিটার অন্ধি-সন্ধিতে অরূপ রূপ ছাপাইয়া উঠিতেছে; যেন একটা মহারাসের নৃত্য চলিতেছে। কত রঙ, কত ছবি, কত ভঙ্গী, যেন নটবরকে নাট্য দেখাইয়া যাইতেছে। ইহাই তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা। আর ব্যতিরেক?—সর্ব্বদাই কি যেন একটা ভাব সকল বিশিষ্টতাকে (trans-cedo-) অথবা বি-অতি-রিচ্যতে) ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া চলিতেছে। "নেতি-নেতি"—কোনটাই 'এই' 'এই' করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ধরিয়া, তাঁহার সবটাকে দেখাইতে পারিতেছে না,—'আরও কিছু, আরও' আরও, তাঁহার এই মহিমা বাঞ্জিত করিয়েছে। ব্যতিরেক মুখে তিনি পরপুরুষ, আর অন্বয়মুখে তিনি সর্ব্বময়; তাঁর চিতিশক্তি সর্ব্বময়ী প্রকৃতি। এই কথাই পরমভাগবত শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের নয়ন সমক্ষে ধরিয়া দিতেছেন; যথা—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।

যে পদার্থ অন্বয় ব্যতিরেক রূপে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই বিষয়েরই জিজ্ঞাসা করিবেন। এই সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বেশ্বরের

'ঘোমটা পরা ছায়া'ই অমর-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণ ভুলাইয়া "কান্না ভাঙানো গান" গাহিয়া দিয়া গিয়াছে। উহারই ভাষা "কাণের ভিতর দিয়া" বৈষ্ণব কবির "মরমে পশিয়া" প্রাণ আকুল করিয়াছিল, এবং তাঁর "প্রতি অঙ্গকে" "প্রতি অঙ্গের" জন্য কাঁদাইয়াছিল, যথা—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

কিন্তু এই ভাব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাত্মিকা 'বিদ্যার" শরণাপন্ন হইতে হইবে। "বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"। যিনি যোগেশ্বরের যোগমায়ার শরণাপন্ন হন নাই, তাঁ'র পক্ষে ভাবের দুয়ার রুদ্ধ। দেখুন গোপিকাগণ—যাঁরা কৃষ্ণ প্রেমের একমাত্র মহাজন, তাঁরা কি করিয়াছিলেন? মহারাসের অধিকারী হইবার জন্য তাঁরা কাত্যায়নীর মহাবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়া অনন্তহৃদয়ে ডাকিতেছেন ;—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

"হে কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিনি! মহাযোগ-বিধায়িনি! কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে পৌছাইয়া দিতে পারে না, তাঁর সহিত নিত্যযুক্ত করিয়া দিতে পারে না। হে অধিশ্বরি! হে দেবি! নন্দ-গোপের পুত্রকে আমাদের স্বামী করিয়া দাও—তোমাকে নমস্কার করি।" তাই আমাদের শত সহস্র উপাসক সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্রই "গায়ত্রী" উপাসনা বিহিত হইয়াছে; সকলেরই স্ব স্ব সাধনানুকুলা গায়ত্রী আছে। মায়ার—অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তির বিভ্রম দূর করিতে—'আমি আমার' ইত্যাকার ছিন্নজ্ঞান সংহার করিতে, তাই রাম প্রসাদ প্রাণ ভরিয়া সেই "তিমিরে তিমির হরা"কে ডাকিয়াছিলেন। তা'ই খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের উপাসকবর্গের God the Son বা যীশু খৃষ্টকে বিশ্বাস না করিলে পরিত্রাণের দ্বিতীয় উপায় নাই। কারণ সেই শক্তিই একমাত্র "পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।" কোথায় সে মহানের ঐ মহীয়সী শক্তি—ভাই! হৃদয়ের অন্তঃস্থলে "অনু"-সন্ধান করিয়া দেখ কোথায় তিনি! তিনি সেই 'এভ্যঃ পরং অব্যয়ং" কে (গীতা ৭।১৩) দেখাইতে

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা" ॥ গীতা—৭।৪

বাহিরে,—জীবের বাহিরে, অষ্টধা বিভক্তি। আর অন্তরে "মায়াশক্তি বিলাস

কল্পিত "মহাব্যোমোহসংহারিণী" রূপে, জীবরূপে (জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ) আমরা যাকে Consciousness বলি সেইরূপে প্রতিষ্ঠিতা। যে দিন আমরা "অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া consciousness বা চিচ্ছক্তির দৈবী প্রকৃতি (divinity of consciousness) দেখিতে পাইব—সে দিন হইতেই "ঘটে ঘটে" সর্ব্বময় ও পরাৎপরের পরমজ্যোতিঃ নয়ন গোচর হইবে। আসুন আমরা আজ তাঁহারই উপাসনা করি, সমস্বরে আমাদের ধীকে প্রেরণা কত্তে কর্ত্তে তাঁহাকেই আবাহন করি :—

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোক্ষ]

উপনিষদ প্রতিপাদ্য ভূমা।

আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রবল চর্চ্চা হেতু বেদান্ত শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ ও বিদ্বান শাস্ত্রজ্ঞ সম্প্রদায়ের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা সংস্কৃত ও উপনিষদ চর্চ্চা দ্বারা শাস্ত্রনিপুণ, তাঁহারাও প্রবৃত্তিমার্গে থাকা এবং পাশ্চত্য বিজ্ঞান অধিক আগ্রহ সহকারে অনুশীলন এবং শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অভাব বশতঃ বেদান্তের যথার্থ মর্ম্ম করামলকের ন্যায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উভয় নৌকায় পা দিয়া বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা চর্চ্চা তাহাদের পক্ষে প্রলাপবৎ হয়। উপনিষদের গম্ভীর মর্ম্ম এতদূর গুহ্য, যে উহা সাধারণ বিদ্বানের জিনিস নহে। সমস্ত বেদান্ত প্রতিপাদ্য "ভূমা" উপলব্ধির বিষয়, বৃত্তি জ্ঞানের বিষয় নহে। পৃথিবীর ইতর সাধারণ জাতি প্রবৃত্তি মার্গে থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদের বিজ্ঞানও তদনুসারে গঠিত। কেবল একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্র নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ দেন; সুতরাং উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? সকাম কর্ম্ম জগৎ জ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম্ম ভূমা-জ্ঞান; অতীব বৈরাগ্য, একাগ্রতা এবং কাম ক্রোধাদির সমূলে উন্মূলন দ্বারা যাঁহারা নিবৃত্তি মার্গে স্থিত ও নিষ্কাম কর্ম্মে রত থাকিয়া, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি এবং গুরু ও ভগবানের কৃপা নিবন্ধন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মগত ও একাগ্র-চিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহস্র সহস্রের মধ্যেও কদাচ দুই একজন "ভূমার" প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হন। আমি অতি হীনমতি। ছান্দোগ্য

উপনিষদে ভগবান সনৎকুমার যেরূপ নারদ মুনিকে "ভূমার" উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে নিরপেক্ষ ভাবে ব্রহ্ম জ্ঞানেচ্ছু পাঠক মণ্ডলীর বোধ সৌকর্য্যার্থে, যতদূর সুগম রীতিতে লেখা যাইতে পারে, তাহা লিখিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম বলিতে পারি না। ইহা পাঠ করিয়া মুমুক্ষু পাঠকবৃন্দের মধ্যে সুকৃতিশালী ও ভগবৎ কৃপা-পরায়ণ দুই এক জনেরও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অল্পমাত্র উপকার হইলে, শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

নারদ, সনৎকুমার সংবাদ।

'তস্তোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।'

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ভগবন্! আপনি বলিয়াছিলেন উদ্দালক মুনি শ্বেতকেতু পুত্রকে বুদ্ধিমান জানিয়াও জিজ্ঞাসিত না হইলে, তাঁহাকে আত্মার সুখস্বরূপতা বর্ণন করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ভগবান সনৎকুমার ত' নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা বিনা আত্মার সুখস্বরূপতা কথন করিয়াছিলেন। ভগবান সনৎকুমার নারদ মুনিকে যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ করুন। এই প্রকার শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, শ্রীগুরু কহিলেন,—হে শিষ্য পূর্ব্বে কোন কালে অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত এই ত্রিতাপে তাপিত হইয়া নারদ মুনি একান্ত দেশস্থিত ভগবান সনৎকুমারের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, "হে ভগবন্, যে ব্রহ্ম এই জগতের অধিষ্ঠান এবং যে ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিদ্বান পুরুষ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদির অধ্যাসরূপ সর্ব্বলোক হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ আপনি উত্তম রূপে জানেন; অতএব হে ভগবন্, যে ব্রহ্মজ্ঞান 'সর্ব্ব' লোক নিবৃত্তির কারণ, সেই ব্রহ্মজ্ঞান আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করুন।" হে শিষ্য, নারদ মুনি যখন সনৎকুমারকে এইরূপ বলিলেন, তখন সনৎকুমার মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া, নারদের অজ্ঞান নিবৃত্তি করিবার জন্য কহিলেন,—"হে নারদ, তুমি সর্ব্ব লোকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং তোমার যত প্রকার বিদ্যা জানা আছে, সেই সমস্ত বিদ্যা তুমি আমাকে বল; পশ্চাৎ আমি তোমাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের উপদেশ দিব।" অনন্তর নারদ সনৎকুমারকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, এই দুই রূপে দুই দুই প্রকারের যে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্বণ এই চারি বেদ; ইতিহাস পুরাণ বা পঞ্চম বেদ, বেদম্ (ব্যাকরণ); পিতৃগণ সম্বন্ধীয় পৈত্রবিদ্যা,

রাশি বা গণিত শাস্ত্র; জীবের উৎপাতাদির স্বরূপ নির্ণয়কারী যে দৈবশাস্ত্র নিধিশাস্ত্র, তর্ক প্রধান অক্ষপাদ প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র এবং বেদস্থিত প্রশ্নোত্তর ভাগ, যাহাকে শ্রুতি বাকোবাক্যম কহিয়াছেন। নীতিশাস্ত্র বা একায়ন নিরুক্ত শাস্ত্র এবং সেই নিরুক্ত শাস্ত্রের যে ভাগে সর্ব্ব দেবতাকে সর্ব্বাত্ম রূপে কথিত হইয়াছে, যাহার নাম বেদবিদ্যা; তদ্ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট যে নিরুক্ত শাস্ত্র, শিক্ষা কল্প এই তিনকে শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে, তাহা শুশ্রূতাদি বৈদক গ্রন্থ সহিত আয়ুর্ব্বেদ, যাহা ভূতবিদ্যা নামে কথিত হয় তাহা এবং শান্তি পুষ্টি আদি ফল প্রাপ্তিকারী যে নানা প্রকার মন্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা সহিত ধনুর্বিদ্যা, যাহাকে ক্ষত্রবিদ্যা কহে, নক্ষত্র বিদ্যা (জ্যোতিষ) সর্পের যে দেব-শরীর তাহাকে বশীভূত করিবার সাধন যে গারুড় বিদ্যা (সর্পদেব বিদ্যা)। জন বিদ্যা (গীতাদি দ্বারা সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জনকারী গান্ধর্ব্ববিদ্যা।) এই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিদ্যা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি। পরন্তু বেদের তাৎপর্য্যের বিষয়রূপ যে মোক্ষের সাধন তাহা আমি জানি না। হে ভগবন্! যদ্যপি সামান্য বেদের অর্থ আমি জানি, তথাপি বেদে তাৎপর্য্যের বিষয়-ভূত যে অদ্বিতীয় আত্মা, সেই আত্মাদেবকে আমি জানি না। আমি কেবল বেদমন্ত্রের পাঠ মাত্র অবগত আছি; মন্ত্রের যথার্থ অর্থ জানি না। হে ভগবন্ পূর্ব্বে আপনাদের ন্যায় মহাত্মা পুরুষের মুখে শুনিয়াছি, আত্মাকে জানিলে, মূল কারণ সহিত সর্ব্বলোক হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হে ভগবন্, যেরূপ ইহলোকে তিন কোণ বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত পঙ্গু পুরুষের মহান্ লোক প্রাপ্তি হয়, সেই রূপ অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত দুঃখ দ্বারা আমি সর্ব্বদা সন্তপ্ত হইতেছি, দুস্তর শোক সাগরে মগ্ন আছি এবং সেই অগাধ শোক-সমুদ্রের অপর পারে যাইবার জন্য আমি সর্ব্বদা ইচ্ছা করিতেছি। অতএব হে দীন দয়ালু সনৎকুমার, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া এই শোকরূপ সমুদ্র হইতে পার করুন।”

হে শিষ্য, নারদ মুনির এই প্রকার দীনতা পূর্ব্বক বচন শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহাকে ‘অরুন্ধতী ন্যায়’ দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বোধ করাইবার জন্য বলিলেন, “হে নারদ, পূর্ব্বোক্ত যত প্রকার শাস্ত্র তুমি অধ্যায়ন করিয়াছ, সেই সমস্ত শাস্ত্র বাক্ বা শব্দরূপ। যদি কদাচিৎ ইহলোকে শব্দরূপ নাম না থাকে, তবে কোন পুরুষ কোনও বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না। নাম দ্বারাই সকল বস্তুর ব্যবহার হয়; সুতরাং এই নাম সর্ব্ব বস্তুরূপ হইয়া থাকে। এরূপ সর্ব্ব বস্তুরূপ বাক্‌কে তুমি ব্রহ্মরূপে চিন্তা কর। হে নারদ, তোমার চিত্ত দ্বৈত বাসনা দ্বারা

কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যখন তুমি সেই পূর্ব্ব-অভ্যস্ত বস্তু বা নাম বিষয়ে ব্রহ্ম ভাবনা করিবে, তখন তোমার চিত্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে জানিবার উপযুক্ত হইবে। ইহলোকে যে পুরুষ সমস্ত শব্দরূপ নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, সেই পুরুষের নাম দ্বারা সম্বদ্ধ সর্ব্ব জগতে স্বতন্ত্রতা রূপ ফলপ্রাপ্তি হয়।" নারদ বলিলেন,—"হে ভগবন্, এই শব্দরূপ নামে ব্রহ্ম-দৃষ্টি মাত্রে জীবের শোক নিবৃত্তি হইবে না; সুতরাং যে বস্তু সেই নাম অপেক্ষা অধিক, সেই বস্তু আমাকে বলুন।" নারদ দ্বারা এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ সনৎ-কুমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তর উত্তর সূক্ষ্মতর নিরূপণ করতঃ, বাগেন্দ্রিয় হইতে আশা পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ তত্ত্বের বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং সেই ত্রয়োদশ তত্ত্বের বিষয়ে এক এক তত্ত্বের ব্রহ্মরূপে উপাসনা—কথন করিতে লাগিলেন; এবং যেরূপ নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনাকারী পুরুষ সেই নাম দ্বারা সম্বদ্ধ সমস্ত জগতে স্বতন্ত্রতা রূপ ফল প্রাপ্ত হন, সেইরূপ বাসনাদি ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্মরূপে উপাসনাকারী পুরুষ সেই বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্বদ্ধ সর্ব্ব জগতে স্বতন্ত্রতা রূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রকার বাগাদি ইন্দ্রিয়ের উপাসনার ফল বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে সেই বাগাদি ত্রয়োদশ তত্ত্বের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে। (১) হে নারদ, এই শব্দ রূপ নাম বাগেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং এই শব্দরূপ কার্য্য হইতে সেই বাক্ রূপ কারণ অধিক। (২) বাগেন্দ্রিয়কে আপনার কার্য্যে ইচ্ছারূপ মনই প্রেরণ করে; সুতরাং বাগিন্দ্রেয় হইতে ইচ্ছা রূপ মন অধিক। (৩) এই কার্য্য আমার করিবার যোগ্য বা অযোগ্য, এই প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য রূপ দুই বিকল্পকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিষয় করিতে সমর্থ যে সঙ্কল্প রূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি; সেই সঙ্কল্প-রূপ বৃত্তিই ইচ্ছা-রূপ মনকে উৎপন্ন করে; সুতরাং সেই ইচ্ছা রূপ মন হইতে সঙ্কল্প অধিক। এক্ষণে মন হইতে সঙ্কল্পের অধিকতা বিষয়ে যুক্তি নিরূপণ করা যাইতেছে। হে নারদ, যে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পযুক্ত হন, সেই সঙ্কল্পবান্ পুরুষই এই সমস্ত মানস ব্যাপার করিয়া থাকেন: সেই মানস ব্যাপারের পর তিনি বাগেন্দ্রিয়ের ব্যাপার করেন; বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারের পর নামরূপ শব্দের ব্যাপার করেন; শব্দের ব্যাপার বিষয়ে সমস্ত বেদাদি শব্দসমূহ অন্তর্ভূক্ত আছে। সেই শব্দসমূহ বিষয়ে, সুখ প্রাপ্তিকারী সর্ব্ব কর্ম্ম স্থিত হয়। এই প্রকার পরম্পরারূপে সেই সঙ্কল্পই সর্ব্ব কর্ম্মের হেতু সিদ্ধ হয়; কারণ যজ্ঞাদি সর্ব্ব কর্ম্ম উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করণ বিষয়ে এই সঙ্কল্পই কুশল। আর

স্বর্গাদি লোক এবং পৃথ্বী আদিভূত যাহা চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন করে, সেই বিশ্বের উৎপত্তি, সঙ্কল্পরূপ নিমিত্ত বিদ্যমান হইলে 'পর' হইয়া থাকে। সঙ্কল্প বিনা এই জগতের উৎপত্তি হইবে না; কারণ লোকের ও ভূতের সঙ্কল্প দ্বারাই ত' বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এবং সেই বৃষ্টির সঙ্কল্প দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সঙ্কল্প দ্বারা এই ভূতের ইন্দ্রিয় সহিত প্রাণ উৎপন্ন, প্রাণের সঙ্কল্পদ্বারা মন্ত্র উৎপন্ন, মন্ত্রের সঙ্কল্প দ্বারা কর্ম্ম উৎপন্ন, সেই কর্ম্মের সঙ্কল্প দ্বারা ধর্ম্মরূপ অপূর্ব্ব উৎপন্ন, সেই ধর্ম্মরূপ অপূর্ব্বের সঙ্কল্প দ্বারা স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে লোক, ভূত, বৃষ্টি, অন্ন, প্রাণ, মন্ত্র, কর্ম্ম, অপূর্ব্ব এই সমস্ত শব্দ দ্বারা সেই লোকাদির অভিমানী দেবতা গ্রহণ করিতে হইবে। সেই চেতন দেবতা বিনা জড় লোকাদি বিষয়ে সেই সঙ্কল্প সম্ভব নহে। এই প্রকারে সঙ্কল্পই সর্ব্ব জগতের কারণ. সুতরাং সঙ্কল্প মন হইতে অধিক।

এক্ষণে সেই সঙ্কল্প হইতে সামান্য জ্ঞানরূপ চিত্তের অধিকতা বিষয়ে বর্ণন করা যাইতেছে। (৪) হে নারদ, এই সর্ব্ব জগতের কারণরূপে কথিত যে সঙ্কল্প, সেই সঙ্কল্পও তখন হইবে, যখন পূর্ব্বোক্ত সামান্য জ্ঞানরূপ চিত্ত হইবে। সেই চিত্ত বিনা সঙ্কল্প হইবে না। এই প্রকার অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা এই চিত্তই সেই সঙ্কল্পের কারণ সিদ্ধ হয় এই চিত্তের অধিকতা লোকেও প্রসিদ্ধ আছে; কারণ ইহলোকে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষও যখন অনুসন্ধান রূপ চিত্ত রহিত হন, তখন সকলে তাঁহাকে অনাদর করে। ইহলোকে যে পুরুষ অনুসন্ধান-রূপ চিত্ত বিশিষ্ট হয়, সেই পুরুষের মুখ হইতে সকলে লৌকিক বচন ও বৈদিক বচন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করে, এবং তিনি যে ধর্ম্ম বিধান করেন, তাহা লোকে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অঙ্গীকার করে। এই অনুসন্ধান রূপ চিত্ত যখন সুখ সাধনতা রূপে এবং দুঃখ সাধনতা রূপে পূর্ব্বানুভূত পদার্থের সাদৃশ্যতা সম্মুখ দেশবর্ত্তী পদার্থকে বিষয় করে, তখনই সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় সঙ্কল্প হয়। সুতরাং সেই অনুসন্ধান রূপ চিত্ত সেই সঙ্কল্প হইতে অধিক। (৫) বৃত্তি জ্ঞানের প্রবাহরূপ যে চিন্তা, সেই চিন্তারূপ ধ্যান পূর্ব্ব সংস্কারের উদ্বোধ দ্বারা সেই স্মৃতিরূপ অনুসন্ধানের জনক হয়, এজন্য সেই চিন্তা রূপ ধ্যান সেই অনুসন্ধান রূপ চিত্ত হইতে অধিক।*

---

* হে নারদ, স্বর্গ-লোক, অন্তরীক্ষ-লোক, ভূমিলোক, এই তিন লোক এবং আকাশাদি পঞ্চভূত এবং হিমাচলাদি পর্ব্বত এবং, দেবতাদিগের সমান শম দমাদি সম্পন্ন মনুষ্য এই সমস্ত নিশ্চলতা রূপে স্থিত হইয়া, ধ্যানকারী পুরুষের ন্যায় প্রতীত হয়। এই কারণে ধ্যান অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। আর ইহলোকে আপনার শমদমাদি গুণ দ্বারা যে পুরুষ মনুষ্যের মধ্যে পূজ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পুরুষ ধ্যানের যৎকিঞ্চিৎ ফল পাইয়াছেন মাত্র জানিবে। এই ধ্যান বিনা এবং

(৬) ইহলোকে যে বস্তুর সামান্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিশেষ জ্ঞান বিষয় করে, সেই বস্তুর ধ্যান করা যায়, এবং সামান্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিশেষ জ্ঞান এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বারাই জ্ঞাত হয়। এই কারণে সেই বিশেষ জ্ঞানরূপ বিজ্ঞান, সেই ধ্যান হইতে অধিক।* (৭) অন্ন গ্রহণ দ্বারা উৎপন্ন যে অবয়বের বৃদ্ধি রূপ বল, যে বল হইতে সর্ব্ব শত্রু ভয় প্রাপ্ত হয়, এরূপ বলযুক্ত মন দ্বারাই সেই বিজ্ঞান সিদ্ধ হয়; এইজন্য বল বিজ্ঞান হইতে অধিক। (৮) সেই বল ভূমি রূপ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেই ভূমি রূপ অন্ন সেই বল হইতে অধিক। (৯) সেই ভূমি রূপ অন্ন, বৃষ্টিরূপ জল হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং সেই জল সেই ভূমি-রূপ অন্ন হইতে অধিক। (১০) ইহলোকে যখন উষ্ণতা রূপ তেজের অধিকতা হয়, তখনই এই জলে বৃষ্টি হয়; সুতরাং সেই তেজ সেই জল হইতে অধিক। (১) এই আকাশ সেই তেজের আধার রূপ; (১১) সুতরাং সেই আকাশ তেজ হইতে অধিক। (১) এখানে যদ্যপি তেজ হইতে বায়ুর অধিকতা বলা উচিত ছিল, তথাপি যেরূপ উষ্ণতা রূপ তেজ জলের বৃষ্টির কারণ, সেইরূপ এই বাহ্য বায়ুও সেই জলের বৃষ্টির কারণ। এইজন্য সেই বায়ুর তেজ বিষয়ে অন্তর্ভাব করিয়া, সেই বায়ু যুক্ত তেজ হইতে আকাশের অধিকতা কথিত হইয়াছে। আর সুষুপ্তির শেষভাগে যে পূর্ব্ব দৃষ্ট আকাশের স্মরণ হয় সেই স্মরণই সেই আকাশের উৎপত্তির কারণ; সুতরাং সেই স্মরণরূপ কারণ সেই আকাশরূপ কার্য্য হইতে অধিক। (১৩) এই কার্য্য এই প্রকার হইবে, এই প্রকার যে আশা, সেই আশাই সেই স্মরণের কারণ হইয়া থাকে। হে নারদ, ইহলোকে যে পুরুষ কামনা-রূপ আশাযুক্ত হয়, সেই আশাবান্ পুরুষই সেই স্মরণ দ্বারা সর্ব্ব পুণ্য পাপ কর্ম্ম করেন, এবং সেই পুণ্য পাপ কর্ম্মের সুখ দুঃখ রূপ ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত উভয় লোকে ভ্রমণ করেন। যে পুরুষ সেই আশা রহিত হন, সেই নিষ্কাম পুরুষ সেই স্মরণও করেন না এবং অন্য কোন ব্যাপারও করেন না। এই কারণে

জন্মান্তরে মহানতা রূপ ফল লাভ হইবে না। পরনিন্দুক অধম পুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত থাকে। এরূপ চিত্তের বিক্ষেপ ধ্যানযুক্ত মহান্ পুরুষ প্রাপ্ত হন না; কিন্তু তিনি মহামান্য হন। এই কারণে ধ্যান চিত্ত হইতে অধিক। ৫।

* এক্ষণে ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞানের অধিকতা যুক্তি দ্বারা বর্ণন করা যাইতেছে। হে নারদ, ঋগ্বেদ হইতে অভ্যুদয় যজ্ঞ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বাগেন্দ্রিয়ের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থ এবং তাহা হইতে অধিক পদার্থ এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়। কারণ ভক্ষণ করিবার যোগ্য যে নানা প্রকার অন্ন, সেই অন্নস্থিত মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত এই ছয় রস, সেই ছয় প্রকার বলকেও এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়; এবং ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্ব ব্যবহারও এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়, এই কারণে বিজ্ঞান ধ্যান হইতে অধিক।

আশা স্মরণ অপেক্ষা অধিক। এরূপ আশাকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, সেই পুরুষ সর্ব্ব মনোবাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্ত হন এবং সত্য সঙ্কল্প হন। হে শিষ্য, এই প্রকার ভগবান্ সনৎকুমার নারদ মুনিকে বাক্, মন সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজ, আকাশ, স্মরণ, আশা, এই ত্রয়োদশ তত্ত্ববিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব তত্ত্বের অপেক্ষা উত্তর উত্তর তত্ত্বের অধিকতা যুক্তিসহ বর্ণন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে সর্ব্বত্র যুক্তি দেওয়া গেল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র (৺কাশীধাম)।

ধর্ম্ম)

প্রণব-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

আমরা গত বৎসরে প্রণব তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া, মাত্রা ও পাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে, মাত্রা শব্দে শাস্ত্র আত্মগত ও বীজরূপে স্থিত বিশেষ ভাবের জ্ঞাপক পদার্থ বুঝায়। ইংরাজীতে যাহাকে exponent বলে, 'মাত্রা' ও কতকটা সেইরূপ। যেমন $(a+b)^n = a^n + a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + a^{n-3}b^3 \ldots b^n$। এখানে আমরা ভেদ-বুদ্ধির দায়ে পড়িয়া একটী দ্বৈত-মূলক উদাহরণ লইলাম। "n" টী মাত্রা স্বরূপ, "a + b" টী ব্রহ্ম বা ভগবৎ চৈতন্যের অহং ভাবের স্বরূপ। আর অপরদিকে অভিব্যক্ত পর্য্যায় বা 'Series' টী পাদের স্বরূপ। যেমন সম্মোহন বিদ্যার দ্বারা মুগ্ধ রামকে "তুমি স্ত্রীলোক" এই কথা বলিয়া 'স্ত্রী মাত্রা' বা ভাব গ্রহণ করান হইলে, যেমন তাহার 'আমি'জ্ঞান স্ত্রীলোক বুদ্ধির দ্বারা রঞ্জিত হয়, এবং স্ত্রীলোকের মত হাবভাব ঘোমটা টানা, সন্তান-পালন প্রভৃতি এক অনন্ত ব্যক্ত পর্য্যায়ের সৃষ্টি হইয়া যায়। সহজে বুঝিবার জন্য ভগবৎ মাত্রাকেও এইরূপে দেখিলে চলিতে পারে। ভগবান যখন তাঁহার ঘন পরাৎপর ভাব পরিত্যাগ করিয়া, আপনার লীলারস আপনিই অনুভূতি করিবার জন্য যেন একদিকে "স" বা অহম্ রূপে 'একোহম্' ভাবে অবস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহার সর্ব্বভাব অপরদিকে বিশিষ্ট "সর্ব্ব" বা "বহু" রূপে প্রত্যুপস্থাপিত হইল, এবং অমনি 'বহুস্যাম প্রজায়েয়ম্' বাণী নিঃসৃত হইল। অমনি নানা রংয়ের, নানা ভাবের, বহুত্ব লইয়া অনন্ত প্রজার

সৃষ্টি হইল; ঘন সর্ব্বাত্মিকা ভাবের "সর্ব্ব" জ্ঞানটী দেশ ও কাল (Space and Time) এই দুই মহাভাবের সাহায্যে ছিন্ন বিশ্লিষ্ট বহুভাবে numerical infinity ব্যবস্থিত হইল। পর শুদ্ধ সূর্য্য যেমন ঘন একরস সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে, প্রত্যেক অনুগুলিতে, আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন, সেইরূপে স্থির ঘন ভগবানের অহম্টী প্রাকৃতিক তত্ত্বগুলি প্রত্যেক অনুতে অনুতে জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া,—কোথায় কোন তরঙ্গে দেবতা সৃষ্টি, কোথায় পিতৃগণের সৃষ্টি, কোথায় বা মানবের সৃষ্টি প্রভৃতি অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত সৃষ্টিতে অহম্‌রূপে ব্যবস্থিত হইয়া বিশিষ্ট বিধা বা বিবিধ ভাবে আপনাকে 'রটস্তি' বা প্রকাশ করিয়া বিরাটরূপে প্রতীয়মান হইলেন। এই বিরাট অবয়বের কথা ভাগবতে 'মহাপুরুষ সংস্থান' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। এই বিরাটের বিশ্বব্যাপী মহান্ দেহে, প্রত্যেক অনুতে এক তিনিই প্রতিভাত হইতেছেন। "পাদস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতম্ ভুবি"। "He is the every drop of this ocean of immortality"—Secret Doctrine.

পুরাণে কি আশ্চর্য্য কৌশলে এই মাত্রা-তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে!! ভগবান মহাদেব দক্ষালয়ে তাঁহার সদ্ভাব Existence and Being বা সতীদেহ ত্যাগ রূপে যখন জগতের জন্য ত্যাগ করিলেন তখন সেই সৎ মাত্রায় তখনকার মানসিক সৃষ্টির সকল ভাবই অনুপ্রাণিত হইয়া গেল। তারপর দেবাদিদেব সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যাভাবকে পরিত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া আপনাতে আপনি রহিলেন, তাঁহার 'অহম্' ভাব "সর্ব্ব" ভাব হইতে সরিয়া যাইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। কাজে কাজেই ব্যক্ত ভাবের 'অহম্' গুলিও লীন হইতে চলিল; সৃষ্টি ধ্বংস হইতে লাগিল। তারপর দেবতারা আনন্দময়ীকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য কামকে পাঠাইলেন। এইবার আনন্দময়ীর ক্ষেত্রে ভগবানের স্বরূপ ভাব বা কুমারের সৃষ্টি হইল। ধ্যানভঙ্গ কালে কোন কোন পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যেমন দেবি চৈতন্যময়ী মহাদেবের সম্মুখে এক এক ভাবে উপস্থিত হইলেন, অমনি মহাদেবও "রে সতি রে সতি কান্দিল পশুপতি, পাগার শিব পরমেশ"—উন্মত্তের মত মহাদেব, মহামায়ার সেই ভাবে আপনার অহম্‌কে স্থাপিত করিলেন; অমনি এক জাতীয় জীবের সৃষ্টি হইল। মহামায়ার এই দশবিধা ভাবকে দশমহাবিদ্যা রূপে অভিহিত করা হয়; এবং এক এক মহাভাবের সহিত এক এক গ্রহের সম্বন্ধ আছে। জীবের যে গ্রহ, তাহা হইতে বুঝা যায়, সে কোন মহাভাব হইতে উৎপন্ন। এইরূপ দশ জাতীয়

জীবকে Monad বলে। কেহ কেহ এই সৃষ্টিকে একাদশ ভাবে ব্যবস্থিত বলিয়া প্রসূত ভাবগুলিকে একাদশ 'রুদ্র' নামে অভিহিত করেন। যে যাহা হউক মূল মহাভাব গুলিকে মাত্রা রূপে আমরা দেখিতে পারি। যেমন যেমন মাত্রা, তেমনি ভাবের সৃষ্টি।

তারপর আমাদের ব্রহ্মার সৃষ্টিতে বা ইংরাজী বাইবেলের Genesis নামক অধ্যায়ে এই 'মাত্রার' খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৃষ্টির নাম অবিদ্যা সৃষ্টি; এবং ইহার গতি বাহিরের দিকে, ভেদ বিশেষের অভিমুখে; কিন্তু তাহা হইলেও মাত্রার মূল তত্ত্বটী সমানই রহিয়া যায়। ব্রহ্মা হাসিলেন, অমনি জ্যোৎস্নাময়ী এক তনু উৎপন্ন হইল। সেই তনুকে আশ্রয় করিয়া গন্ধর্ব্বাদি জীব সকল রহিল। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলেন, অমনি দৈত্যরূপ তামসীতনু উৎপন্ন হইল। ওদিকে বাইবেলের ঈশ্বর বলিলেন "Let there be light and there was light; Let there be water and there was water" অর্থাৎ সৃষ্টি কর্ত্তা যেমন অগ্নি তত্ত্বের কথা মনে করিলেন, অমনি বাহ্য জগতে আলোক ও অগ্নি-তত্ত্বের সৃষ্টি হইল যেমন তিনি জল-তত্ত্বের কথা মনে করিলেন, অমনি বাহ্য জগতে জল এবং বাসনার সৃষ্টি হইল। সৃষ্টি কর্ত্ত তাঁহার আপনার 'আমি'তে যে মাত্রা আরোপ করিলেন, অমনি বাহিরের 'সর্ব্বভাবে' সেই মাত্রা ব্যাকৃত হইয়া অনুরূপ প্রজা ও তত্ত্ব সৃষ্টি করিল।

অভিব্যক্ত ভাবগুলির ভিতর দিয়া মৌলিক তত্ত্বের স্থাপনা বা ব্যঞ্জনাকে পাদ বলে॥ Libraryতে অনেকগুলি পুস্তক দেখিয়া, তাহা হইতে পুস্তক ভাবের অভিব্যক্তি 'পাদ'; পদাত ইতি পাদঃ। ইহাই পাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ। তারপর এক আধারে অবস্থিত বিভিন্ন অভিব্যক্তির সমষ্টিকেও পাদ বলে। সম্মোহিত রামের স্ত্রীত্ব "বুদ্ধি" বা "মাত্রা"টী, স্ত্রীলোকসুলভ ব্যক্ত ক্রিয়াদি ব্যাপারের মধ্য দিয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে। মাত্রা অহং ভাবের মূলে বলিয়া মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া বুঝিতে পারা বড় দুরূহ; কিন্তু প্রকাশিত সর্ব্বভাবের মধ্য দিয়া ঐ ভাব সহজে বুঝিতে পারা যায়। মাত্রা নাম-শক্তি; 'পাদ রূপ' শক্তি। অ'কার' উ কার' ম-কার ও অর্দ্ধমাত্রা ইহা প্রণবের মাত্রা বা অহং ভাবের বিকাশ॥ বৈশ্বানর তৈজস প্রাজ্ঞাদি প্রণবের পাদ বা সর্ব্বাত্মিক ভাবের বিকাশ॥ অকাররূপ প্রথম মাত্রায় আপ্তি ব ব্যাপ্ত ভাবই মূলভাষা' সেইজন্য কি জীব, কি শিব উভয়েই, অহম্ বা আত্মতত্ত্ব অকার মাত্রায় তাঁহার সর্ব্ব ব্যাপিত্বতে all pervasiveness অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই অকার

মাত্রাকে আমরা 'অহমের' আপ্তি রূপে বর্ণিত করিতে পারি। এই মাত্রাটী পাদরূপে ব্যবস্থিত হইলে, উহা বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্ত অঙ্গ, একোনবিংশতি মুখ স্থূল-ভুক্ ও বৈশ্বানররূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাকে পাদ বলে; যেমন রামরূপ জীব মনুষ্যরূপ মাত্রার সাহায্যে, মনুষ্যত্ব রূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং "পাদ" 'সর্ব্ব' ভাবের বিকাশ ও সর্ব্বাত্মক তত্ত্বের আভাস দেয়।

যাহা পাদ,—তাহাই মাত্রা; অর্থাৎ পাদ ও মাত্রায় প্রভেদটী কেবল ভাষার প্রভেদ মাত্র; কেবল অবস্থার বিভিন্নতা মাত্র সূচিত করে,। 'মাত্রাশ্চ পাদাঃ পাদাশ্চ মাত্রাঃ' ইহাই মাণ্ডুক্যোপনিষদের উপদেশ। এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, পরে শাস্ত্রোপদিষ্ট অনেক তত্ত্বের অবভাস সহজেই হইতে পারে। সেইজন্য আমরা ইহা বিশদ্‌ভাবে বুঝিবার জন্য স্থূল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। প্রত্যেকেই জানেন যে আমাদের 'অবিশেষ আমি'রূপ জন্ম-জন্মান্ত-স্থায়ী একটি জীব ভাব আছে। ঐ জীবটী বিভিন্ন জন্মেও বিভিন্ন কর্ম্মের বশে 'রাম', 'কেরাতুল্লা', 'টমাস' প্রভৃতি মানবরূপে প্রকাশিত হয়। শুদ্ধ 'অহং' বা জীবে যেরূপ কর্ম্মমাত্রা পড়ে, তদ্রূপ ব্যক্ত মনুষ্য ভাবের 'আমি' প্রকাশিত হয়। যেমন আমরা প্রয়োজন অনুসারে হস্ত পদাদি ব্যবহার করি, সেইরূপ আমাদের জীবটীও কর্ম্মবশে ও ভগবানের ইচ্ছায় স্থূল জগতে নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া কার্য্য করে। Amœba নামক কোষাণুর (cell) কথা অনেকেই জানেন, এই কোষাণুর হস্ত পদাদি নাই, উহার সমস্ত শরীরটীই হস্ত, পদ, উদর প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হয়। আমাদের শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন বুদ্ধি আছে, Amœbaর তদ্রূপ নহে; উহার সমস্ত শরীরটীই এক একটী ক্রিয়াতে প্রয়োজিত হয়। খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইলে, সমস্ত দেহটী লম্বা হইয়া হস্তে পরিণত হয়, এবং খাদ্য গ্রহণের পর সমস্ত দেহটী কুঞ্চিত হইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। চলিতে হইলে সমস্ত অঙ্গটীই পদরূপে চলে; খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করিতে হইলে সমস্ত শরীরটীই উদররূপে পরিণত হইয়া পরিপাক করে। সুতরাং সমস্ত শরীরে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াতে Amœbaর ক্ষুদ্র 'অহম্‌টী' এক রূপেই থাকে। আমরা যেমন 'আমার হস্ত' 'আমার পদ' এইরূপ শব্দ-ব্যবহার করি, Amœba যেন 'আমিই হস্ত' 'আমিই পদ' এইরূপ ভাষায় আত্ম প্রকাশ করে। তবে আমাদের চৈতন্য জাগ্রত অবস্থায় থাকে, আর ঐ Amœba চৈতন্য সুষুপ্তি অবস্থায়, যেন ঘুমের ঘোরে, এই সমস্ত কার্য্য করে।

আমাদের জীবটীও Amœbaর ন্যায় বিভিন্ন মাত্রার বশে, বিভিন্ন মানব বুদ্ধিতে তাঁহার 'আমি'টীকে প্রলম্বিত করিয়া, এক এক জন্মে, এক এক রূপে, মানব ভাবে, স্থূল জগতে অবতীর্ণ হইয়া, উপযোগী খাদ্য সঞ্চয়ের পর, মৃত্যুর পর, পুনরায় স্বরূপ ভাবে আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া লয়। জীবের শুদ্ধ 'আমি'টী 'আমি রাম ও ব্রাহ্মণ' এই মাত্রাতে রামের 'আমি' হইয়া প্রকাশিত হয়; ইহাই মাত্রা শক্তির খেলা। 'আমিটী' আমিই থাকিয়া যায়, কেবল তাহার উপর ব্রাহ্মণত্ব, রামত্ব প্রভৃতি মাত্রা বা exponent আরোপিত হয়। তারপর সংসারে সর্ব্ব বস্তুর সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে রামের 'আমি'টী হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্য, সুখ দুঃখ, প্রভৃতি ভাবের সাহায্যেই নানা ভাবে, নানা কার্য্যে, আপনাকে বিস্তৃত করে। এই অভিব্যক্তির প্রত্যেক ভাবটীকে সাধারণ মানব বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট করিয়া দেখে, তাহার পক্ষে প্রত্যেকটী যেন একটী বিভিন্ন ও অসংশ্লিষ্ট আত্ম-প্রকাশ। আজিকার হাসির সহিত কল্যকার ক্রন্দনের সম্বন্ধ নাই; অদ্যকার সুখের সহিত পর মুহূর্ত্তের দুঃখ অসংশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। এইরূপে মানব পাপ, মোহ, অবিদ্যা, ও ভেদ-বুদ্ধির সহিত তাহার জীবনে তরঙ্গায়িত, জাতি, আয়ু, ভোগ, প্রভৃতি সামান্য ভাবেও বিয়োগ, দুঃখ, উল্লাস, উন্মত্ততা রূপ বিশিষ্ট বিকাশগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখিতে না পাইয়া স্রোতের সহিত ভাসিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যখন সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে জীবনের সমস্ত ব্যাপারগুলিকে এক করিয়া দেখিতে শিখে, তখন বুঝিতে পারে যে, জীবন ব্যাপী অনন্ত ভাব রাশির মধ্যে একই 'আমি' সমরূপে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। ঐ 'আমিতে' জীবনের ঘটনার ক্রিয়া, আশা, প্রযত্ন প্রভৃতি সকল ব্যাপারই সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তখন সে বুঝিতে পারে যে ঐ আমিটী বাস্তবিক রাম নহে, যে উহাতে জড় ও জীব প্রভৃতির প্রভেদ নাই। যদি এই 'আমি'টী কেবল রাম হইত, তাহা হইলে রাম দেহপাত করিয়া প্রিয়জনের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিত কি? রামরূপ মাত্রার ভিতর দিয়া ঐ 'আমি'র প্রকাশ আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু পরে সমগ্র জীব ও সমগ্র জগত,—দেশ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি অনন্ত মহত্তর ভাবরাশির মধ্য দিয়া এই 'আমি' অভিব্যক্ত হইয়া কি মহান্ ভাবের দিকে প্রধাবিত হইয়া ছুটিতেছে। যদি এই 'আমি'টী অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক হইত, তাহা হইলে কামনার সাহায্যে ও কামের ভাষায় অনন্ত জগত বস্তুকে তাহার আপন করিবার জন্য যাইত কি? ঐ 'আমি'টী মৃত্যুকেও

আলিঙ্গন করিয়া—মৃত্যুর পরপারে গিয়া 'আমি আছি' বলিয়া ফুটিয়া উঠে। এই আমি' মন ও বুদ্ধির ভাষায় জগদ্বস্তুকে আপনার জ্ঞানরূপে পরিণত করিয়া,আমি ও জগত উভয় ভাবের আপাতঃ প্রভেদ যে মিথ্যাভূত,ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। বলিতে পার, ভাই ! কোন্ "আমির" বশে 'আমি 'রাম' জ্ঞানের বাহিরে স্থিত প্রিয়জনকে বক্ষে ধারণ করিলে, এক মহান্ আনন্দে 'রাম' ভাব ও প্রিয়বস্তু ভাব, দুইটীই ডুবিয়া যায় ? বলিতে পার কোন্ ভাবে জ্ঞানের মুহূর্ত্ত 'আমি রাম' ও জ্ঞানের বস্তুটী মিশিয়া গিয়া এক অখণ্ড জ্ঞান-রূপে প্রতীত হয়। এই 'আমি'কে বৈশ্বানর বা প্রথম পাদ বলে ; উহাতে বিশ্ব ও নরভাব উভয় ভাবই মিশিয়া যায়। উহা একদিকে রামের 'আমি' ও অপরদিকে 'সর্ব্ব' ভাবে বিশ্ব রূপে বিতন্বত হইয়া আছে। উহা দ্বারা রামের 'আমি' ও বিশ্ব অনন্তরূপে, নানা রঙ্গে ও নানা ভাবে মিশিয়া গিয়া, কি আমাদের বুঝাইয়া দিতেছে না, যে নানাত্বের উপরে,—রসের রসরূপ—ভাবের ভাবরূপ, কি এক মহান্ আমি আপনাকে অনন্তরূপে প্রতিস্থাপিত করিয়াও অনন্ত মাধুর্য্য ও অনন্ত কল্যাণ গুণের আধাররূপে আপনাকে আপনি উদ্ভাসিত করিতেছে। ইহাই বৈশ্বানর শব্দের প্রকৃত অর্থ ; তাই আচার্য্য বলিলেন,—বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ ; যদ্বা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব বিশ্বানরঃ, সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ." "অর্থাৎ সমস্ত নরগণের অনন্ত প্রকারের সুখাদি আনয়ন করেন বলিয়াই শ্রীভগবানের এই আত্ম-প্রকাশকে বিশ্বানর বলে। কিম্বা যে মহান্ আমি বিশ্ব ও নর এই উভয় ভাবেই একরূপে—সমরূপে বর্ত্তমান, যিনি সমস্ত পিণ্ডাত্ম হইতে অভিন্ন, যিনি তাঁহার লীলাবতারে তাঁহার এই সমরূপী প্রথম অভিব্যক্তি বা পাদ বুঝাইবার জন্য এক কণা তণ্ডুল ও শাক ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিশ্ব তৃপ্ত হইয়া গেল, সেই পরাৎপর ভগবানের সমরূপ ও সামবেদের ভাষায় ইঙ্গিত বা ঘন সর্ব্বাত্মক ভাবকেই বৈশ্বানর বলে। "পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি" তাঁহার এই পাদ বা মহাভাবে বিশ্ব-ভূত রহিয়াছে।

যে মহান্ গতির বশে মাত্রা বা অহমের দিকে সমস্ত ভাবগুলি একে একে মিশিয়া গিয়া 'অহম্' এই প্রত্যয়ের মধ্যে শ্রীভগবানের ব্যঞ্জনা হয়, যে মহান্ গতির বশে, বৈশ্বানর বা সামবেদের ভাষার মধ্য দিয়া, 'উৎকর্ষ' বা ঋক্‌বেদের ভাষার মধ্য দিয়া ভগবানের স্বরূপ ভাব ফুটিয়া উঠে,—যে চৈতন্যের ঘনরস ইঙ্গিতে এই ব্যক্ত মহাভাষা বা ভাবগুলি নিঃশেষে শ্রীভগবানে মিলিয়া যায়,

সেই পরাগতি প্রবৃত্তি বা চৈতন্যের মূল প্রবণতাকে প্রণব বলে। এই গতিই বাস্তবিক শ্রীভগবানের একমাত্র আত্মপ্রকাশ। ইহাই জীবের এক মাত্র আকর্ষণ, গতি ও পথ। সেই জন্য মুণ্ডক উপনিষদে প্রণবকে ধনু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন জ্যা-আরোপিত ধনুর ভিতর এক মহান্ শক্তি প্রসুপ্ত প্রায় "latent" হইয়া থাকে ও ঐ শক্তির বশেই শরটী লক্ষ্যের দিকে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ কি জগদ্ভাবে, কি জীবের বিকাশের মধ্যে একটি আশ্চর্য্যময়ী প্রবণতা বা পরাভিসারিণী, "Transcendent" গতি আছে, যাহাকে বুঝিতে পারিলে 'জীব' ও 'জগত' 'আমি' ও 'সর্ব্ব' এই উভয় ভাবের প্রকাশগুলি ঘন হইয়া মিশিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হয়। যিনি ব্যক্ত, বিচ্ছিন্ন, ভাবরাশির মধ্যে এই সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তি দেখিতে পান, যে সুরসিকের চক্ষে সমস্ত জগদ্ব্যাপার ঘন হইয়া শ্রীভগবানকে বা 'আত্মাকে' দেখাইতে সক্ষম হয়, তাঁহারই প্রণব ধনু লাভ হইয়াছে। যিনি ইন্দ্রিয়ে, কামে মনে ও বুদ্ধির খেলার মধ্যে এই পরাভিসারিনী, পর পুরুষাভিমুখিনী, কুলনাশিনী, চৈতন্যময়ীকে দেখিতে পাইয়াছেন, যে সুরসিক জগতের সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তাভিমুখী এক মহান্ গতি দেখিতে পাইয়াছেন, তিনিই প্রণব-ধনু ব্যবহার করিতে পারিবেন। যিনি "সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু" হইয়াও গুরুর অঙ্ঘ্রিপদ্মে প্রাণ সমর্পন নিবন্ধন, শ্রীগুরুদেবের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কামিনীর আলিঙ্গনকেও সেই নিত্য ঘন, সুখ-স্বরূপ আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীগুরুদেব আপনার ভগবৎ স্বরূপত্বে বীর্য্য দান করিয়াছেন, যিনি সেইজন্য অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বে বিকাশের মধ্যে পরম মহাভাব বা পদ দর্শণ করিতে পারিয়াছেন, যিনি সেই মহান্ একের জন্য মন বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই প্রণব-তত্ত্ব-বেত্তা। 'সর্ব্ব' আর তখন বিচ্ছিন্ন বহু নহে। মহাবিদ্যা মহামায়া, বিদ্যাভাবে এই আত্মার অভেদত্ব রূপ ভাবার সাহায্যে তখন 'সর্ব্ব' 'আত্ম' স্বরূপে মিশিয়া গিয়া, সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যারূপ পরম লোকে তাঁহাকে লইয়া যায়। তখন শ্রোত ও শ্রোতব্যের মোহ পড়িয়া গিয়া তিনি দেখেন যে—

"যাহা পশে কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশত বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে উঠে ফুটে॥

তখন তিনি দেখেন যে, বাস্তবিকই "নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে"

আর একটু বাঙ্গালা করিয়া বলিতে গেলে, প্রণবের ভাষা যিনি বুঝিতে

চাহিবেন, তাঁহাকে ভেদ বিশেষ বিবক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি আপনার পুত্রের প্রতি স্নেহটীকে এমন করিয়া দেখিতে শিখিবেন, যাহাতে পুত্র ভাবের ভিতর দিয়া সেই অবিরাম আত্মার আকর্ষণ চিনিতে পারেন, সুরতাং তাঁহার পক্ষে নিজে নিঃসন্তান হইলেও অপরের পুত্রস্নেহ দেখিয়া সেই পরমাকর্ষক আত্মতত্ত্বের অভ্যাস সুগম্য হইবে। কিন্তু যে পুত্র স্নেহে মুগ্ধ ও বিশিষ্ট পুত্রজ্ঞানে আবদ্ধ, সে ত' কখনও বুঝিতে পারে না যে,

"নবে পুত্রকামঃ পুত্রপ্রিয় ভবতি, আত্মকামঃ পুত্রপ্রিয় ভবতি।"

এই জ্ঞান ফুটীতে গেলে, তোমার আপন পুত্রটীকে তুমি যেমন ভালবাস, অপরের পুত্রস্নেহেও যে সেই এক আকর্ষণেরই ফল, ইহা বুঝিয়া আর আপন পুত্রের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবেনা। তখন সকলের পুত্র কিসে ভাল থাকে—তাহাদের কিসে মঙ্গল হয়, এইরূপ প্রবৃত্তি আপনা আপনি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। বিশিষ্ট পুত্র ও বিশিষ্ট পুত্রের স্নেহ মায়িক হইলেও, যতক্ষণ বিশিষ্টতা বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই মহামায়া অবিদ্যারূপে খেলেন। কিন্তু যাই সার্ব্বজনীন জ্ঞানের সাহায্যে সকল জীবের অপত্যস্নেহ এক বলিয়া বুঝিয়া, সেই জ্ঞানের মধ্যে আত্মার খেলা বা আকর্ষণ দেখিতে পাইলে, যখন সার্ব্বজনীনতা সর্ব্বত্বতায় পরিণত হইবে তখন বাস্তবিকই দেখিতে পাইবে যে প্রত্যেক বালক শরীরে শ্রীভগবানই আকর্ষক রূপে খেলেন। তখন মহামতি যীশুর ন্যায় বলিতে পারিবে, "Suffer the little chilren to come to me, for theirs the kingdom of Heaven"। সুকুমার মতি—সুকুমার বালকদিগের ভিতর যে আকর্ষণ তত্ত্ব দেখিতে পাইতেছ, সেটীকে 'আমির' সহিত মিশাইয়া দাও, দেখিবে যে শিশু ও বালকরূপে সেই ভগবানই খেলিতেছেন। সার্ব্বজনীন বুদ্ধি "Universality" বড়ই দুর্লভ। ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বশে আমরা উহা শিখিতে চাহিনা। চাহিলে কি ভূত সকলের প্রত্যহ মৃত্যু দেখিয়াও দেহাত্ম বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিতাম? চাহিলে কি হিন্দু সন্তান হইয়া বিশিষ্ট অহংকারের ভোগসিদ্ধি করিয়া জীবন ব্যয়িত করিতাম? তারপর সার্ব্বজনীন জ্ঞান ভগবানে মিশাইয়া দিয়া সর্ব্বাত্মিকা মহাবিদ্যার আরাধনা আরও দুর্লভ। তাহা হইলে কি নিজের ভিতর, কি ভক্তভাবে—কি বৈদান্তিক ভাবে শ্রীভগবানের বিকাশ আকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্য শরীরে ও ভূতগ্রামে সেই ভগবানকে কর্ষণ করিতাম? অন্য শরীরে প্রকাশিত ভগবানকে নিত্য অবমাননা করিতাম?

আগামীবারে প্রণব-ধনু বা সর্ব্বাত্মিকা দেবীর স্বরূপ এবং আত্মার কথা বলিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলঙ্ক বেদান্ত।

কাম]

বাসহীন ফুল

করে কে যতন বাসহীন ফুলে,জগত মাঝারে হায় ?
কেহ না আদরে নরনারীগণ, (তুমি) আদরে ধরগো তায়।
ধুতুরা আকন্দে কেবা ভালবাসে, কে লয় আদরে তুলি ?
তুমি দয়াময়! স্থান দাও সবে, দিতে লাগে পুষ্পাঞ্জলি।
যদিও গো বটে নাহিক সুবাস জবা ও অপরাজিতা।
তাহারাও স্থান পায় ও চরণে, তুমি কাঙ্গালের পিতা।
পরশে তাদের (ও) মলয় সমীর, হেলে দুলে করে খেলা।
তাহারাও লাগে পূজা উপচারে হোক্ সকলের ফেলা।
চন্দ্রমা তাদের (ও) বিলায় কিরণ, সুরস (ও) ত' করে স্নেহ।
(শুধু) সুবাস তাহার ছোটে না চৌদিকে, (তাই) করেনা যতন কেহ।
নাহি কাজ প্রভু যশ অপযশে, কি কাজ মান অপমানে ?
(যেন) নীরবে ফুটিয়া নীরবে রহিয়া, থাকিগো নীরব ধ্যানে।
সমভাবে তব কৃপা বিতরিছ, ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান,
(আমি) কানন মাঝারে বিশুষ্ক কুসুম, পাব কি চরণে স্থান ?
প্রেম ভক্তিহীন জানিনা সাধন, দিবে কি চরণ দীনে ?
(তব) কৃপা কণাবিন্দু বরষিয়া প্রভু, তারিবে কি ভাগ্যহীনে ?
দয়া ধর্ম্ম যত দেহের সুবাস, আবরিয়া আছে পাপে।
চঞ্চল যে মন হয় নাকো বশ, দহি সদা সেই তাপে।
(তব) প্রেমের সাগরে দাওহে ভাসায়ে, দেখাও তোমার জ্যোতি।
চির ব্রহ্মানন্দে করহে মগন, স্থির ক'রে দাও মতি।
(সদা) কাম ক্রোধ আদি যত শত্রুগণ, পাপের সাগরে টানে।
বারেক স্মরিতে দেয় না তোমায়, সদাই কুপথে আনে।

তুমি দয়াময় দেহ পদাশ্রয়, মধু গন্ধ হীন ফুলে।
নীরবে শুকায়ে যেন ঝরে পড়ি, তোমার চরণ মূলে।
উঁকি দিতে গিয়া দেখি হৃদি মাঝে, জ্বলে ঘোর পাপানল।
আমি বাসহীন ফুল কাজে কি লাগিবে,—পাব কি চরণে স্থান?

শ্রীমতী মানময়ী দেবী।

কাম] সংযম ও চিত্তশুদ্ধি।

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভাগ্যোদয় হইলে সাধু সঙ্গ লাভ হয়, এবং সেই সাধুসঙ্গ লাভ হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।" এই সাধুক্তির মধ্যে সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পরিলে যে, ভগবানকে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটী ক্ষুদ্র নদী কোন বৃহৎ নদীর সহিত মিলিত হইয়া যেমন অনায়াসে সাগর সঙ্গম লাভে সমর্থ হয়; তদ্রূপ জীব ভাগ্যোদয় বশতঃ সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারিলে, ক্রমে তৎ-সহবাসে জ্ঞান লাভ করতঃ ভক্তি ও ভগবৎ-সেবা জনিত প্রেমানন্দ অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু ভ্রমণ করিতে হইলে, জীব কোন্ ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিবে? উন্মার্গগামী হইয়া কলুষিত ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিলে, সেই সাধুসঙ্গ লাভোচিত ভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে কি? যেমন সেই ক্ষুদ্র নদী কোন বৃহৎ নদীর অভিমুখে ধাবিত না হইয়া কোন কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলময় সমতল ক্ষেত্রে গমন করিলে, তাহার পরিণাম অতি শোচনীয় হয়, ক্রমে স্রোতবেগ রুদ্ধ হইয়া, গলিত পত্রাদি দ্বারা কলুষিত-সলিলা হইয়া, পূতিগন্ধ বিস্তার করতঃ স্বাস্থের হানিজনক হইয়া পড়ে, তদ্রূপ জীব উৎপথগামী হইলে, প্রলোভন বিতাড়িত, উন্মত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদা পরবশ হয়; মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় অবিরত কামনা দ্বারা প্রলোভিত হইয়া অসৎকে সৎ বলিয়া জ্ঞান করে, এবং অবিদ্যা ও মায়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে নাচাইতে থাকে; পরিশেষে বিশ্ব জীবের শান্তি নাশের কারণ হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ জীবের সাধু সঙ্গোপযোগী ভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব যে জ্ঞানের সুপক্ক ফল, ভক্তি, ভগবৎ-প্রীতি ও ভগবৎ-সেবা জনিত প্রেমানন্দ লাভ এবং যে কর্ম্মের পরিসমাপ্তি সেই জ্ঞান,—সেই কর্ম্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে

করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হইতে পারে। কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইলে, কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে না। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এতৎ সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, —

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩ ॥৪। ভাঃ গীঃ

কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু এটী তাহার ভ্রম; কেননা কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে, তথায় জ্ঞানোদ্ভেদের কোনই আশা নাই। এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান নিজ প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন ;—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩ ২৬। ভাঃ

এস্থলে 'কর্ম্মসঙ্গী' অর্থে যাহার কর্ম্মে আসক্তি আছে তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এরূপ কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞ পুরুষের প্রথমত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে, জ্ঞান লাভের আশা কিরূপে ফলবতী হইতে পারে? অতএব তাহাকে সহসা কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ না দিয়া, বিদ্বান্ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সহ নিজে কর্ম্মাচরণ করতঃ তাহাকে কর্ম্মের উপদেশ দিবেন।

বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে। কর্ম্মানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় সংযমের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ট। যেহেতু উদ্ধত ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্মের দ্বারা কোন রূপেই চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আবার কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় হইতে বিরত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে তাহাদিগকে না ফিরাইতে পারিলে, কিরূপে ভগবানের ধ্যান সম্ভবপর হয়? অনেকেই 'সংযম' অর্থে 'নিগ্রহ' মনে করেন, এবং হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোন কর্ম্ম না করিয়া কেবল ভগবদ্ধ্যান করিবার প্রয়াস করেন। এটা মূঢ়তার কার্য্য, কেননা যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হইতে মন না ফিরিল, তখন কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া তাহাদিগকে নিস্তেজ করার লাভ কি? এতৎ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥৩।৬। ভাঃ।

কোন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতির পক্ষে একজন প্রবল শত্রুকে কারাবদ্ধ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করা অপেক্ষা, তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহাকে আয়ত্তাধীন করিয়া অন্তরঙ্গ করাই শ্রেয়স্কর। কেননা এরূপ করিলে তাহার সাহায্যে অন্য শত্রুরও সেইরূপ আয়ত্তাধীন ও অন্তরঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ না করিয়া, নিয়ত সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেই, চিত্তশুদ্ধির প্রত্যবায়গুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইবে, চিত্তশুদ্ধি জন্মিলেই জ্ঞানালোক প্রাপ্তির আর বিলম্ব রহিল কৈ? উদ্ধত স্বভাব—অশিক্ষিত তেজোবান্ তুরঙ্গমের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, বিপথগামী হইয়া, আরোহীর প্রতিক্ষণেই বিপদের আশঙ্কা; কিন্তু সেই অশ্ব সুশিক্ষিত হইয়া আয়ত্তাধীন হইলে, সহজেই তৎ সহায়ে সুখে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তাহাকে সুশিক্ষার দ্বারা আয়ত্তাধীন না করিয়া, তাহার ঔদ্ধত্য নিবারণার্থ পদচ্ছেদন করিয়া খঞ্জ করিলে, আরোহীর কি লাভ হয়? তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আয়ত্তাধীন করিতে পারিলেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ করিয়া আর কি ফল? এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গণ কাহার অধীন হইবে? ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি; মন হইতে শ্রেষ্ঠ; এবং যিনি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান বলিয়াছেন;—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ ৩। ৪২। ভাঃ।

অতএব ইন্দ্রিয়গণকে বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত মনের অধীন করিতে হইবে; ইহারই নাম ইন্দ্রিয় সংযম। একটী সুশৃঙ্খলা বিশিষ্ট শান্তিময় গৃহস্থের বাটীতে ক্ষুদ্র নফরটি হইতে প্রধানতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কে কার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, তাহার নিয়ম নিরূপিত থাকে। কিন্তু পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ আজ্ঞাকর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেও, সমস্ত কার্য্যেই তাহার আজ্ঞাপালনের সঙ্গে গৃহকর্ত্তার সন্তোষ সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়া থাকে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত মনের অধীন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু ভগবৎ প্রীতিই যেন সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কর্ম্ম সকলের পরিসমাপ্তিই জ্ঞান এবং চিত্তশুদ্ধির উপায়ই কর্ম্ম। দ্রব্যময়ী ও জ্ঞানময়ী ভেদে কর্ম্মের দুইটী অবস্থা। ভগবান বলিয়াছেন;—

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪। ৩৩। ভাঃ ॥

কর্ম্মের দ্রব্যময়ী অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যের দিকে চিত্ত অর্পিত হয়। মনের মধ্যে দ্রব্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতিকৃতি জাগরূক থাকে; ক্রমে কর্ম্ম করিতে করিতে সেই প্রতিকৃতিগুলি স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—কোন ছাত্রকে একটী গল্প পড়িতে দিলে, প্রথমে তদন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রতি এবং জীব জন্তুর বিশেষ বিশেষ আকৃতির প্রতি তাহার মনোনিবেশ হয়। পরে অনেকবার পড়িতে পড়িতে তাহার আর সেইরূপ মনোনিবেশ থাকে না, কেবল সেই গল্পের সার উপদেশটীর দিকেই তাহার চিত্ত ধাবিত হয়।

কর্ম্ম সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—নিষিদ্ধ কর্ম্ম, কাম্য কর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম। হিংসা দ্বেষাদি দ্বারায় প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম,—নিষিদ্ধ কর্ম্ম। চিত্তশুদ্ধ্যর্থী ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। স্বর্গাদি সুখভোগের কামনায় যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা কাম্য কর্ম্ম। এ কর্ম্মও তাহার পক্ষে হিতকারী নয়। তবে সেইরূপ সুখপ্রাপ্তির আশায় যদি ভগবৎ প্রীতি উৎপাদনে প্রয়াস পায়, তবে ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তির সময় তাহার হৃদয়ে ভগবৎ-সেবা-সুখ পূর্ব্বকাঙ্ক্ষিত সুখ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করে। ধ্রুব স্বীয় জননীর নিকট "বৎস! অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া, নিজ ধর্ম্ম দ্বারা শোধিত চিত্তে সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবানের উপাসনা কর। তিনি ভিন্ন অন্য কেহই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারিবে না" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বিবিধ বিধি বিধানে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত বর প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীহরি গমন করিলে তিনি বিলাপ করিয়াছিলেন।

"স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতোবত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেণ ফলীকারা নিবাধনঃ ॥৪।৯।৩৫। ভাঃ।

অর্থাৎ "আমি এমন ক্ষীণপুণ্য এবং এরূপ মূঢ় যে, মোহবশতঃ শ্রীহরির নিকট 'অভিমান' ভিক্ষা চাহিলাম। যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তি রাজার নিকট সতুঁষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, আমার প্রার্থনা ঠিক সেইরূপই হইয়াছে।" তবেই দেখা যাইতেছে যে, ফলাভিলাষী হইয়া ভগবৎ প্রীতিলাভ করিলে, দিব্য-জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকে। এখন নিত্যকর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে আশক্তি রহিত হইয়া উদ্‌যাপন করিলে, অনায়াসে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। অনাশক্তি অর্থে স্পৃহা-শূন্যতা এবং অভাবানুভব-রাহিত্য বুঝায়। এই বস্তু আমাদের আছে, এই জ্ঞানে তাহার প্রতি স্পৃহা এবং যাহা আমাদের নাই তজ্জনিত অভাবের অনুভব এই দুইটীই আশক্তির লক্ষণ। আমার একটী উত্তম পরিচ্ছদ আছে; সেইটী পরিয়া বেড়াইতে যাই। যদি কখন সেটী না পরিয়া বেড়াইতে গিয়া তাহার অভাব অনুভব না হয়, অর্থাৎ আমি আজ পোষাকটী পরিয়া আসি নাই, পরিয়া না আসাটা ভাল হয় নাই, ইত্যাকার ভাব যদি আমার মনে উদয় না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমার অনাশক্তি জানিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত অনিত্য বস্তুতে অনাশক্তি জন্মিলেই দিব্যজ্ঞান লাভ হইবে।

অতএব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অবিরত অনাশক্ত ভাবে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও স্থির হয়, এবং চিত্ত স্থির হইলেই ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ হয়। একখানি দ্রুতগামী বাষ্পীয় যানের আরোহী বহির্দৃষ্টি করিলে, দেখিতে পায় যে বৃক্ষাদির মধ্যে কোন কোনটা সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, আর কতক-গুলি পশ্চাদাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু গাড়ী থামিলেই দেখিতে পায় যে বৃক্ষ সচল নয়—অচল। তখন তাহার পূর্ণাবয়ব দৃষ্টি গোচর হয়। সেইরূপ চিত্ত চঞ্চল থাকিলে ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু সেই চিত্ত স্থির হইলে সেই হৃদয়স্থ সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ হয়; ভক্তি-পূর্ণ প্রেমানন্দের উদয় হয়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস।

গঙ্গাস্নানে।

করি তীর্থস্নান,—
লভিতে অনন্ত পুণ্য অক্ষয় অম্লান!
দূর দূরান্তর হ'তে এসেছে ছুটিয়া।
ধর্ম্ম-লুব্ধ অগণিত মুক্তিকামী হিয়া॥
ভীমক্রুদ্ধ রাহুগ্রস্ত ক্ষীণ চন্দ্রালোকে।
প্রকৃতির রৌপ্যকান্তি মুহ্যমান শোকে॥
প্রকাশিছে হৃদয়ের বেদনা অপার;
হেন কালে অদমিত প্রলুব্ধ হিয়ার।
সুমহিম তাড়নায় লক্ষ নরনারী,
উন্মত্ত হৃদয়াবেগে দু'বাহু প্রসারি';—
ভকতির সুধামাখা করি হরিগান;
পবিত্র জাহ্নবী জলে করে তীর্থস্নান।
কাতারে কাতারে,—
ছুটিছে অসংখ্য যাত্রী এপারে ওপারে,
সর্ব্বপাপ বিনাশিনী পূত জাহ্নবার;
আঁখি হ'তে বিন্দু বিন্দু ঝরে প্রেমনীর
অটল বিশ্বাসে পূর্ণ, চির মোক্ষকামী
কোটী হিন্দু সন্তানের।
দাঁড়াইয়া আমি,
অসংখ্য যাত্রীর মাঝে ভাবিতেছি হায়;
কে বলিছে হিন্দুধর্ম্ম আজি লুপ্ত পায়!
শতবর্ষ অতীতের কোন্ শুভক্ষণে,
কখন কি বলে'ছিল প্রশান্ত নিঃসনে;
ভারতীয় সভ্যতার বিমল উষায়,
বসিয়া গম্ভীর চিত্তে তপোবনচ্ছায়,—
ভারতের ত্রিকালজ্ঞ যোগীশ্বরগণ,
বর্ষে বর্ষে যোগে যোগে তাহারি স্পন্দন—
আজ(ও) জাগে ত্রিংশ কোটী হিন্দু চিত্ত
ভরি পরাণে অপরিমেয় পুলক বিতরি।
তা'ই পুনঃ আজ—
তেয়াগিয়া সংসারের শত লক্ষ কাজ,—
ছুটি এরা আসিয়াছে জাহ্নবীর তীরে;
স্থবির, যুবক, শিশু, পরস্পরে ঘিরে।
প্রত্যেক হৃদয় ভরি' উঠে উছলিয়া।
দেবতার শান্ত গীতি কি মধু অমিয়া।
আজি রাজপথ,—
অযুত তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সিন্ধু-বক্ষঃ মত,
অগণিত মানুষের কলকণ্ঠ স্বরে;
মুখরিত হ'য়ে উঠে নৈশ বিশ্বপুরে—
তালহীন, সুরহীন বিমিশ্র ভাষায়।
নাহি ক্লান্তি, নাহি শ্রম, সব ছুটে যায়
তাপ-দগ্ধ হৃদি ল'য়ে বক্ষে জননীর;
কি যেন ত্রিদিব-হর্ষে সকলে অধীর।
কহিছে সবাই যেন বিশ্বমানবেরে,
'কোথা কে আছিস্ তোরা আজ
বেঁটে নে'রে
জননীর স্নেহাশীষ পবিত্র নির্ম্মল;
হৃদয়-সরসী হ'তে শান্ত শতদল।
আহরিয়া, আয় সবে আয় আয় ছুটে,
জননীর স্নেহভাণ্ড নিয়ে যা'রে লুটে।
বিশ্বভরা প্রেম, পুণ্য, হাসি, গান মাঝে
মায়ের মঙ্গল হাসি হের ওই রাজে।

তীর্থের সলিল স্পর্শে কেরে পুণ্যবান্!
লভে যা লভে যা ওরে স্বর্গের সন্ধান।

* * *

মধুময় কি যেন কি আহ্বান শুনিয়া;
ছাড়ি মোর ক্ষুদ্র নাড় এসেছি ছুটিয়া
পাপী আমি, দীন হীন হৃদি খানি ল'য়ে
তোমার কোলের কাছে, রয়েছি দাঁড়ায়ে।
হে জননী, পরাণের হে চিরনন্দিনি!
হে আরাধ্য দেবী মোর ত্রিলোক বন্দিনি!
তোমার ও অতুলন স্নেহ বিন্দু লেশ,
আমারে করিয়া দান সর্ব্ব অবশেষ,
অনন্ত আলোক রশ্মি দাও দেখাইয়া;—
তোমারি সঙ্গীতে মুগ্ধ মোর ক্ষুদ্র হিয়া।
শুনিতে পাইবে যবে মৃত্যুর আহ্বান।
স্বরগ আশীস-পূত পবিত্র কল্যাণ
বরষিত হবে মোর দীর্ণ শিরোপরি,
আর আমি স্থির নেত্রে ও চরণ স্মরি,—
অচেনা সে দেশ পানে করিব প্রয়াণ
যেথা না পশিতে পারে পৃথ্বীর সন্ধান।
তুমি তব স্নেহ-বক্ষে নিও মোরে টানি;
আমার আরাধ্যা অয়ি, হে দেবী কল্যাণি!

শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

অর্থ]

মৃত্যুপথ।

(গত বৎসর ফাল্গুন সংখ্যার পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

সূক্ষ্ম শরীর বিচার।

কারণ স্বরূপিণী আনন্দময়ী প্রকৃতি হইতে তাবন্ত জগতের সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, যথা শ্রুতি—"আনন্দ ময়োঽভ্যাসাৎ"। ১২। বেদান্ত-১অঃ ১ পাদ।

ব্রহ্ম আনন্দময় ও তৎ প্রকৃতি আনন্দময়ী। আনন্দময় ও আনন্দময়ীর মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে এই বিবর্ত্তন। যথা—

সচ্চিদানন্দের মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে, ছুটে মহা বিবর্ত্তন প্রবাহ যখন।
অব্যক্তির মহাব্যক্তি আলোক বিকাশ, বিদ্যুতের, হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ।
ক্রমে সূক্ষ্ম বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থূলতর,—গ্রহ, উপগ্রহ, জীব, হয়-বিবর্ত্তিত।
ক্রমে স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে অমর, কারণ সচ্চিদানন্দে, হয় নিবর্ত্তিত॥

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি"। শ্রুতি। তৈত্তিরীয়।

এক মহানন্দ, এই অনন্ত কোটি বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও হন্তা। এই আনন্দ-

সাগরে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত নক্ষত্র বিকশিত হইতেছে এবং লয় পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আনন্দাদ্ব্যেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
আনন্দে এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক॥ শ্রুতি।

বিশ্ব আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবিত রহে, এবং অন্তকালে আনন্দে বিলীন হয়। অতএব আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক হইতে পারে?

কোন্ পদার্থের নাম আনন্দ? শুক্রই আনন্দ—আনন্দই শুক্র। শুক্রমূলী যে কাম, তাহার স্মরণে আনন্দ—ব্যবহারে আনন্দ—রক্ষণে আনন্দ—ত্যাগে আনন্দ। যে পদার্থ শরীর হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনন্দ দিতে বিরত হইতেছে না,—যাহার স্মরণ হইতে ত্যাগ পর্য্যন্ত আনন্দ জন্মায়, তাহা আনন্দময়।

আনন্দের সহিত শুক্রের কি সম্বন্ধ? আনন্দ না হইলে শুক্রের উৎপত্তি হয় না।

শুক্রের সহিত সূক্ষ্ম শরীরের কি সম্বন্ধ? একই সম্বন্ধ। শুক্রই সূক্ষ্ম শরীর।

অস্মদাদির সূক্ষ্ম শরীর শুক্র, জগতের সূক্ষ্ম শরীর সূর্য্য; একটি ব্যষ্টি, আর একটি সমষ্টি; একটি ক্ষুদ্র, একটি বৃহৎ, একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতি পুরুষ হইতে, আর একটি মহান্ প্রকৃতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে সূক্ষ্ম শরীর দুই প্রকার যথা।—

দ্বেধা সূক্ষ্ম শরীরং স্যাৎ সমষ্টি ব্যষ্টি ভেদতঃ।
সমস্তৈক্যৈক বুদ্ধিস্থঃ সমষ্টিঃ স্যাদরণ্যবৎ॥ ১৯॥
ভেদবুদ্ধিকৃতাব্যষ্টির্বিজ্ঞেয়া বৃক্ষবত্তথা।
সমষ্টিঃ সূক্ষ্ম দেহানামুপাধি, পদ্মজন্মনঃ॥ ২০। বেদান্ত সংজ্ঞা।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে সূক্ষ্ম শরীর দুই প্রকার,—প্রত্যেক জীবদেহে ব্যষ্টিরূপে, সমস্ত জগতে সমষ্টিরূপে বিরাজমান। সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহের উপাধি হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্ব। সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব উপলক্ষে ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা কহে। যে নিয়মে, যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি; সেই নিয়মে, সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে জগতের সূক্ষ্ম শরীর উৎপত্তি। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

নানাপ্রকার শৃঙ্গারং, শৃঙ্গারো মূর্ত্তি মানিব
চকার সুখ সম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ॥
ততঃ স চ পরিশ্রান্তস্তস্যাযোনৌ জগৎপিতা।
চকার বীর্য্যাধানশ্চ নিত্যানন্দঃ শুভক্ষণে॥

* * * * * *

অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাংগর্ভং দধারহ।
শত মন্বন্তরং যাবজ্জ্বলন্তি ব্রহ্মতেজসা॥

* * * * * *

শত মন্বন্তরাতীত কালেহতীতেহপি সুন্দরী।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরং॥ প্রকৃ-২অঃ॥

অপিচ—অন্তর্গর্ব্ব প্রজাপতিবপশ্যৎ প্রকৃতিং পরাং।
সাসূয়তহৈমমণ্ডং যদ্রূপং চাক্ষুষং ভবেৎ॥ শ্রুতি

অপিচ—দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌপরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সা ভূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং॥ ভাগবত ৩।২৬॥

অপিচ—মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্মতস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত॥ গীতা॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহৎযোনিবহংবীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪। ১৪অঃ॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমং। দাশু
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৭॥ ১৩অঃ।

স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে যেমন আমাদের সন্তানের সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ একই নিয়মে মহান্ পুরুষ ও মহান্ প্রকৃতি সংসর্গে চিজ্জড়ত্ব-প্রমুখ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সূক্ষ্ম শরীর বা মহত্তত্ত্ব আবির্ভাব হয়। যে কিছু বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলনে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতি তাহাদের কারণ অর্থাৎ জননী স্বরূপা এবং মহান্ পুরুষই বীজাধানকারী পিতৃ স্বরূপ। পিতা যেমন সন্তান লাভের কামনায় পত্নীর যোনিদ্বার পথে গর্ভে রেতঃ সেক করিয়া থাকেন, পরব্রহ্মও তদ্রূপ প্রকৃতির যোনিপথে চিদাভাস রেতঃ সেক দ্বারা এই সৃষ্ট পদার্থ সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পিতার শরীরে পুত্রের সূক্ষ্ম অংশ সমূহ যেরূপ সংযুক্ত থাকে এবং পিতা যেমন রেতঃরূপে স্বয়ংই রূপান্তর ধারণ করিয়া পত্নীগর্ভে প্রবিষ্ট

হন ও যথাকালে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে এই সৃষ্ট পদার্থ পুঞ্জে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন। প্রলয়ে ভূত সমূহ অতি সূক্ষ্মরূপে পরব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। তিনি যখন "আমি বহু হইব" যেন এইরূপ বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া চিদাভাসরূপে প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, তখনই হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহাই জগতের সূক্ষ্ম শরীর। যেরূপ যৌন সংসর্গ প্রণালী অবলম্বনে জীব-প্রবাহ অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, সৃষ্টির আদি ক্রমও তদনুরূপ; ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যোনি পথের উল্লেখ হইয়াছে।*

জন্মকালে অস্মদাদির পিতা হইতে যেমন একাধিক সূক্ষ্ম শরীর নির্গত হয়, তদ্রূপ সৃষ্টি সময়ে পরম পিতা হইতেও অসংখ্য সূক্ষ্ম শরীর প্রাদুর্ভূত হয়; যথা—

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ব বাসনা মানসৈঃ সহ।
জায়তে জীব এবং হি যাবদাহূত সংপ্লব ॥ ভাগবত গীতা ॥

অপিচ—অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্যনিস্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ ॥ মনু ১৫॥১২ অঃ ॥

অপিচ—বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তেঽক্ষরস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়াভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকীশ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥ পঞ্চদশী-৪পরি ॥

অপিচ—নিঃসরন্তি যথালোহপিণ্ডাতপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তিহি ॥ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ॥

অপিচ—যথা বাতবশাৎ সিন্ধু বুৎপন্নাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥

সৃষ্টিকালে জীবাত্মা পূর্ব্বের অভিলষিত বাসনার সহিত পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। এই সূক্ষ্ম শরীর পরমাত্মার দেহ হইতে অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিনিঃসৃত হইয়া উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিতে স্থিতি করতঃ চিজ্জড়াত্মক নানা দেহকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করেন। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল নিঃসৃত হয়, অথচ বস্তুতঃ এক বস্তু হইলেও 'ইহা লৌহপিণ্ড' 'এই সকল স্ফুলিঙ্গ' এইরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যবহার হয়; সেইরূপ পরমাত্মার সকাশ হইতে এই সকল সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা সকল নিঃসৃত হইয়াছে, অথচ ফলতঃ এক বস্তু হইলেও পৃথক পৃথক ব্যবহারাপন্ন হইতেছে। এই প্রকার সৃষ্টি হইতে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জীবাত্মা বার বার দেহ আশ্রয় করিয়া, জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারে বারংবার যাতায়াত করিয়া থাকে। সৃষ্টিকালে কারণ-শরীর স্বরূপিণী জৈবিক ও ভৌতিক

* জগতের আদি সৃষ্টি ক্রম "সবিতা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। পং সং।

ধর্ম্মিণী প্রকৃতি হইতে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম অবয়ব বিশিষ্ট ভৌতিক সূক্ষ্ম শরীর অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে, এবং যেমন অদৃষ্ট, জীবকে তদনুযায়ী স্থূল-দেহ রচনা করিয়া দেয়।

শুক্রও তেজ, সূর্য্যও তেজ। বিশেষ এই যে, আমাদের শরীরোত্থিত তেজে জলীয়াংশ বহুলতা প্রযুক্ত শুক্র তরল ভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে তেজোময় পুরুষের শরীরোত্থিত তেজ শুক্র বা সূর্য্য তেজ ভাবাপন্ন। প্রত্যুত ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, এই সূর্য্যে জল নাই। একটী ক্ষুদ্র তেজ হইতে উদ্ভূত, অন্যটি মহাতেজ হইতে নির্গত; সুতরাং ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয়বিধ সূক্ষ্ম শরীরই তৈজসাত্মক। যথা—

তৈজসানিন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।
প্রাণস্যহি ক্রিয়াশক্তি র্বুদ্ধে বিজ্ঞানশক্তিতা॥ ভাঃ-৩।২৬।৩০॥

ক্রিয়া ও জ্ঞান রূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দুই প্রকার হয়; যথা কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ই তৈজস অর্থাৎ তেজ বা রজো প্রধান অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; যেহেতু প্রাণের ক্রিয়া-শক্তি ও বুদ্ধির জ্ঞান-শক্তি আছে। সুতরাং প্রাণ তৈজস হওয়াতে তদীয় ক্রিয়া-শক্তি বিশিষ্ট কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলও তৈজস; এবং বুদ্ধির তৈজসত্ব হেতু তদীয় জ্ঞান-শক্তিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের তৈজসত্ব আছে জানিবে। সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চভূতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেজোময় ধাতু সমূহের দ্বারা বিরচিত; এ নিমিত্ত তাহা তৈজস। সূক্ষ্ম দেহের ভৌতিকত্ব অতি সূক্ষ্ম। ভূতগণের আদ্য উপাদান ও অন্তিম সংশোধিত পরিণাম স্বরূপ যে তেজ-শক্তি সমূহ, তাহাই সূক্ষ্ম দেহের উপাদান। সে শক্তি মহত্তত্ব সম্পন্ন প্রকৃতি স্বরূপিণী।

সূক্ষ্ম-শরীর সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা মহা সূক্ষ্ম দ্রব্য ধাতু বিশিষ্ট; পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ তাহাতে বিদ্যমান আছে। ঐ সূক্ষ্ম ভূতগুলি তন্মাত্রাত্মক। তন্মাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতের অনুমান-সিদ্ধ সূক্ষ্ম অবয়ব, তাহা চক্ষু গ্রাহ্য নহে। স্থূল চক্ষু যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ, চক্ষুর দর্শন শক্তিটি সেরূপ নহে; তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তথাপি তাহা আছে ইহা সকলেই মানে; সুতরাং তাহা অনুমান-সিদ্ধ হইল। পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্র সকল ঐরূপ অনুমান-সিদ্ধ। জ্যোতি পদার্থটী স্থূল হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়; কিন্তু সেই স্থূল জ্যোতির বীজরূপী তৈজস শক্তি, যাহা সর্ব্বপদার্থে আগ্নেয় ধাতু-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছে,—যাহাকে দেখা যায় না, অথচ যাহা উপযুক্ত

আশ্রয়রূপ ও উত্তর সাধকরূপ উপাধি লাভ করিবামাত্র ব্যক্ত হয়, তাহাকে রূপ-তন্মাত্র বা তৈজস-পরমাণু বলে। তাহার সে রূপ কেবল অনুমান-সিদ্ধ। প্রত্যেক জাতীয় তন্মাত্রই অতি সূক্ষ্ম ভূত পদার্থ। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎসমূহ ভৌতিক শক্তির আদিম বিশুদ্ধ অবয়ব। তাহাই জগদুৎপত্তির পক্ষে সূক্ষ্ম উপাদান স্বরূপ। প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তে যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ঐ সকল উপাদানে জীবের সূক্ষ্ম দেহ বিরচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তন্মাত্র, সৃষ্টি কার্য্যোন্মুখী ঐশী-শক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতিরই স্ফুরণ মাত্র। তৎসমূহ জীবের অনাদি ভোগশক্তি ও তদীয় উত্তর-সাধকরূপ ভোগ্য পদার্থীয় শক্তির ধর্ম্মবিশিষ্ট। জীবের ভোক্তৃত্ব শক্তি ও বাহ্য সৃষ্টির ভোগ-দানের শক্তি, এ উভয় শক্তির মূলে একই প্রকৃতি-শক্তি। সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রকটন কালে সেই প্রকৃতি ভোক্তৃ-মাত্রা ও ভোগ্য মাত্রায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। উহার মধ্যে এক ভাগ জীবরূপ ভোক্তৃ-কেন্দ্র ধর্ম্মকে রচনা করে, অন্য ভাগ সেই ভোগ প্রার্থনা পূরণার্থে ভোগ্য-পদার্থকে বিন্যাস করিয়া থাকে। যথা,—রস-তন্মাত্র রূপশক্তি জীবের রসনেন্দ্রিয়কে রচনা করে পক্ষান্তরে তাহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি জলীয় পরমাণু সেই রসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জল রূপে পরিণত হয়। এইরূপে সমস্তই তন্মাত্র শক্তির কার্য্য, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ তাহাদেরই রচনা। প্রাণ উহাদের সমষ্টি-প্রবণ রাজসিক শক্তি এবং মন তাহাদের সমষ্টি-প্রবণ সাত্ত্বিক শক্তি এবং কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারণের ন্যায় ঐ সকল বিশিষ্ট সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আপনার মধ্যেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে সকল ইচ্ছা-সূত্রে মন স্বীয় সূক্ষ্ম দেহকে পরিচালন ও বিস্তৃত করে, তাহা প্রকৃতিরই সূক্ষ্ম-দেহগত শক্তি মাত্র। এই সমস্ত ব্যাপার সাধারণতঃ কেবল অনুমান-সিদ্ধ। মন, ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্য দ্রব্যের সূক্ষ্ম শক্তি, এ সকল কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নহে। এই অনির্ব্বচনীয় অত্যদ্ভুত সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে অসংস্কৃত বুদ্ধির প্রবেশ অসাধ্য, কিন্তু যোগবলে উহা প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই সাংখ্য বলিয়াছেন —"ইত্যেষ প্রকৃতে সর্গ"; ইহা অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-রহস্য বুদ্ধির ভেদভাব মূলক তামসিকতার মূল।

কারণরূপী বীজ ও তাহার অঙ্কুর স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহ, উহাই স্থূল দেহের বীজ। তথা প্রকৃতির ভৌতিক ধর্ম্মই উপাদান, পরিণামী ও সমবায়ী কারণ, এবং অদৃষ্ট তাহাকে অঙ্কুরিত করণার্থ জলসেক স্বরূপ। বটকণিকাতে যেমন অদৃশ্যভাবে ভাবী প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাদনের বীজশক্তি বিলীন থাকে,

অর্থাৎ তদন্তর্গত সেই অদৃশ্য শক্তি যেমন মৃত্তিকা ও জল সহযোগে ক্রমে উত্তুঙ্গ তরুবর রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ঐ সূক্ষ্ম দেহরূপ অদৃশ্য বীজ-শক্তি, অদৃষ্ট রূপ ভূমি এবং অনাদি তৃষ্ণারূপিণী জলসেক সহকারে অঙ্কুরিত ও ভাবী স্থূল দেহরূপে উদয় হয়। অতএব স্থূল উৎপাদনের বীজত্ব ঐ সূক্ষ্মেই আছে।

জীব পরলোক গমন সময়ে দেহারম্ভক বা দেহ ভাবের প্রবণতাযুক্ত পঞ্চ সূক্ষ্ম-ভূত সঙ্গে লইয়া যায়। তাহাই তাহার ভাবীদেহের অপ্রকট বীজ স্বরূপ। "তস্মাৎ বীজৈর্বেষ্টিত এব পরলোকং গচ্ছতীতি"॥ জীব স্বীয় ভাবী জন্মের স্থূল শরীরের বীজের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরলোক গমন করে। তাহ অদৃষ্ট স্বরূপ, প্রকৃতি-নিষ্পন্ন ও কর্ম্মপালিত এবং বাহ্য প্রবণতা পূর্ণ বীজ; সুতরাং পরলোকে তাহা সুলভ নহে ও সেইজন্য তাহা সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহ সেই বীজের দ্বারা অনুস্যূত। ভাবার্থ এই যে মৃত্যুর পর বাজ যে কোন লোকে যে কোনরূপ শরীর ধারণ করে, তাহা বস্তু-তন্ত্র নহে; তাহা কেবল তাহার স্বীয় কর্ত্তৃ-তন্ত্র। মৃত্যু সময়ে স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহ জীবের সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে গিয়া জীবের অদৃষ্টানুযায়ী অন্য স্থূল দেহ সম্পাদন করে।

সূক্ষ্মদেহ যেন প্রতি জন্মের স্থূল দেহের মেরুদণ্ড ও পঞ্জর স্বরূপ। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে ঐ সূক্ষ্ম দেহের আধ্যাত্মিক আকার যেরূপ বিরচিত হয়, স্থূল পঞ্চভূত সেই মূল আকৃতির উপর তদনুযায়ী স্থূল দেহ বিন্যস্ত করিয়া থাকে। জীব শুভাদৃষ্ট জন্য যদি স্বর্গবাসী হন, তবে তাহার সূক্ষ্ম দেহের পবিত্রতা অনুসারে উৎকৃষ্ট তেজোময় এবং স্বচ্ছ শরীর লাভ হইয়া থাকে। যদি দুরদৃষ্ট বশতঃ নরকে পাতিত হয়, তবে তাহার তদবস্থাপন্ন সূক্ষ্ম দেহের মালিন্যানুরূপ যাতনা ভোগের উপযোগী কোনরূপ দেহ জন্মে।

কারণ শরীর হইতে সৃষ্টিকালে যে সমস্ত শারীরিক সূক্ষ্ম শক্তি অঙ্কুরিত হয় এবং জন্ম-জন্মান্তর ও লোক-লোকান্তর ব্যাপিয়া যাহা জীবের সঙ্গে থাকিয়া প্রয়োজনীয় দেহাদির বিধান করে, অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ে স্থূল দেহ, স্বর্গীয় কলেবর, নারকী দেহ, স্বপ্ন দেহ ও সঙ্কল্পিত ইচ্ছাময় দেহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সূক্ষ্ম দেহ। তাহা তন্মাত্রা নামক, কেবলমাত্র অনুমান দ্বারা সিদ্ধ অতি সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূতমাত্রা দ্বারা বিরচিত। সুতরাং তাহা অস্মদাদির ইন্দ্রিয় গোচর নহে; তাহা কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শী ইন্দ্রিয় দ্বারাই দৃষ্টিগম্য হয়; অথবা ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে যাঁর দৃষ্টিশক্তি পরমাণু দর্শন যোগ্য হইয়াছে, সেই মহাপুরুষই উহা দেখিতে পান।

সৃষ্টিকালে প্রকৃতিরূপ বীজ হইতে একদিকে জীবের বাসনা ও কর্ম্ম উদ্ভব হয়, অন্যদিকে দশবিধ ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম শক্তিযুক্ত অঙ্গ ও তত্তদঙ্গে স্থূলাবির্ভাব স্বরূপ স্থূল দেহ সংঘটিত হয়; অপরদিকে তাহাদের ভোগ্য বাহ্য বস্তু সকল যথোপযুক্তরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। বাহ্যতঃ স্থূল দেহ সংলগ্ন যে চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয় নহে, এবং তাহাকে সূক্ষ্ম অঙ্গ বলাও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তত্তদিন্দ্রিয়ের গোলোকে দীপ্তিমান শব্দ স্পর্শাদি গ্রহণের যে সূক্ষ্ম শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাকে ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মাঙ্গ বলাই উদ্দেশ্য। মন বুদ্ধ্যাদিরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বিরচিত আভ্যন্তরিক তেজোময় দেহকে সূক্ষ্ম শরীর কহে।

সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশাঙ্গ বিশিষ্ট। ১১ ইন্দ্রিয়+৫ তন্মাত্রা+১ বুদ্ধি= ১৭। কেহ কেহ পঞ্চ-তন্মাত্র স্থানে পঞ্চ প্রাণ গ্রহণ করেন। ফলিতার্থ একই, পঞ্চ প্রাণ বায়বীয় তন্মাত্রারই অন্তর্গত।

মহর্ষি কপিলোক্ত সূক্ষ্ম শরীর বর্ণন যথা;—পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎ কার্য্যত্বং ভোগাদেকস্যনেতরস্য।৮। সাংখ্যদর্শন-৩অঃ। পূর্ব্বে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। তখন স্থূল শরীর সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং সুখ ও দুঃখ, লিঙ্গ-শরীরেরই কার্য্য, স্থূল শরীরের নহে। সুখ দুঃখভোগ লিঙ্গ-শরীরেই হয়, ইতর শরীরে অর্থাৎ স্থূল শরীরে নহে। আগে লিঙ্গ-শরীর, পরে তদুপরি স্থূল শরীর। যখন স্থূল শরীর সৃষ্টি হয় নাই, তখন লিঙ্গ-শরীরেই ভোগ প্রবর্ত্তমান ছিল; এবং এখনও সেই নিয়ম চলিতেছে। সেই কারণে মৃত দেহ লিঙ্গ পরিশূন্য হওয়ায় সে দেহ সুখ-দুঃখ বর্জ্জিত হয়।

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্। ৯—সাং দঃ লিঙ্গ শরীর সপ্তদশাবয়ব, অর্থাৎ একাদশেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও পঞ্চ-তন্মাত্র, এই সপ্তদশ অবয়ব যুক্ত একটি দেহের নাম সূক্ষ্ম শরীর। অহঙ্কার বুদ্ধিরই অন্তর্গত, প্রথমে ইহা একই ছিল। প্রথমে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ জন্মেন। ব্রহ্ম সেই এক অখণ্ড লিঙ্গের সমষ্টি-শরীরে অহমভিমানী। লিঙ্গ-দেহ বুদ্ধি প্রধান; সেই জন্য লিঙ্গ-দেহে ভোগ হয়। জীব সাধারণের— কর্ম্ম সাধারণের প্রভাবে প্রথম সমষ্টি সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে তাহাদের বিশেষ কর্ম্ম জন্য ব্যষ্টি সৃষ্টি হইয়াছে। লিঙ্গ-শরীরী জীবের অন্য নাম কর্ম্মাত্মা, কর্ম্ম পুরুষ বা কামদেহী। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবকুমার যখন স্বীয় বাসস্থান বনগ্রামে প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাহার হৃদয় বড় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বহুদিনের স্মৃতি-সিন্ধু মথিত করিয়া অব্যক্ত যাতনা তাহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিতে লাগিল। অক্ষয়চন্দ্রের উপদেশ হৃদয়ে জাগরুক থাকিলেও তাহার পরাজয় হইল; গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। অগত্যা হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য, বনগ্রাম—নিম্ন-প্রবাহী জয়দেবের মধুর গীতের প্রধান শ্রোতা অজয় তটে গ্রামের বাহিরে একান্তে উপবেশন করিয়া রহিল। তখন মরীচিমালী স্বীয় কর সঙ্কোচন পূর্ব্বক বিশ্ববাসীকে স্নিগ্ধ করিয়া বিশ্রামার্থ অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। যেদিকে তিনি বসিয়া আছেন, সেদিকে লোকের বড় গমনাগমন নাই; নিবিড় বৃক্ষরাজি তখন তাঁহার একমাত্র অনুসঙ্গী। সায়ংকালের আরতির বাদ্য বাজিয়া গেল,—তাঁহার সেদিকে লক্ষ্য নাই। মনে হইতেছে তিনি অজয়ের উছলিত তরঙ্গ নৃত্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া আছেন,—কিন্তু তাহা নহে। নিকটে ফেরুপাল প্রহর জানাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু সে সেই একভাবে। কচ্ছপাদি জলজন্তু মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইতেছে; কিন্তু নবকুমারের দৃষ্টি, শ্রুতি কিছুই বাহিরের দিকেই নাই। দারুণ চিন্তা-সাগরে ভাসমান, সময়ে সময়ে এক একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহার সজীবত্বের প্রমান দিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, যদি বাড়ী গিয়া দেখি মা আমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন—যদি গিয়া দেখি যে, আমার পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী স্বামীর নিরুদ্দেশে উদ্বন্ধনে ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্তের কোন এক নিভৃত কন্দরে লুকাইয়া আছে, তখন আমি কি করিব? অনুতাপের জলন্ত অনলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। মনে পড়িল একদিন বিনোদিনী তাহার পদযুগল ধরিয়া বলিয়াছিল, "একদিন আমার অনুরোধ রক্ষা কর,—একদিন একটু মিষ্ট কথা বলিয়া আমার প্রাণ শীতল কর,—জন্মের সাধ একদিন মিটাও"। উঃ ভয়ানক কথা! আমি

তাহার বিনিময়ে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে নবকুমার স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে পারিত না, আজ তাহারই জন্য তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

সহসা বৃক্ষান্তরাল হইতে কে যেন বলিয়া দিল,—"তোমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, তোমার পত্নী জীবিত।" একি, মোহ না প্রহেলিকা! না বনদেবী কৃপা বশে হৃদয়ের যন্ত্রণা আর দেখিতে পারিতেছেন না! কিম্বা তাহার মাতাই দেশান্তর হইতে সন্তানের এই অসীম যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, বৃক্ষান্তরাল হইতে এই কথা জ্ঞাপন করিলেন! নবকুমার এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত, তাই মনে মনে বলিতে লাগিল,—বিনোদিনী! আমি তোমার নিকট বড়ই অপরাধী, এ অপরাধ আমার জ্ঞানকৃত, তাই এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পবিত্র ভাগীরথী তরঙ্গে জীবন ত্যাগ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিলাম; কিন্তু সন্ন্যাসীর করুণায় অন্যরূপ বুঝিলাম। এখন তোমার নিকট আমার এই কৃত পাপের ক্ষমা চাই। অজ্ঞানান্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাত্যাবিতাড়িত পত্রের ন্যায় কতদিকে ঘুরিলাম, কিন্তু এখন বেশ স্পষ্ট বুঝিতেছি, তুমি যদি সরল অন্তঃকরণে আমায় সেইভাবে গ্রহণ কর, তবে চিত্তের এই অনুতাপ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইতে পারে। সত্যই তুমি যদি জীবিত থাক, তোমার ন্যায় সতীর দেহস্পর্শে এই পাপ পঙ্কিল দেহ পবিত্র হইতে পারে। হেমলতার জন্য যন্ত্রণা এখন তিরোহিত হইয়াছে সন্ন্যাসীর অদ্ভুত শক্তিতে জানিতে পারিয়াছি যে, সে এক্ষণে ভাল আছে, তাহার কোনই কষ্ট নাই। কিন্তু এ যন্ত্রণা যে কিছুতেই হৃদয় হইতে অপনীত হইতে চায় না। যদি তোমায় না পাই, তবে তোমার রূপ ধ্যান করিতে করিতে ইহ জীবনের অবসান করিব। অক্ষয় দাদা বলিয়াছিল,—সংসারে এখনও আমার অনেক কর্ম্ম বাকী! যদি বিনোদিনীকে না পাই, তবে আমার কিসের সংসার! সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিজন বনে আশ্রয় গ্রহণ করিব। সেখানে বনের বিহঙ্গমগণ আমার দুঃখে দুঃখিত হইবে -বৃক্ষরাজি শন্ শন্ শব্দে আমায় সান্ত্বনা প্রদান করিবে—ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি আমার চরিত্র শ্রবণ করিয়া ভাবিবে, যে নরকুলে এমন অধর্ম্মাচারী পশুরও সত্ত্ব আছে। দাদা বলিয়া গিয়াছে, নিতান্ত হৃদয় ব্যাকুল হইলে ভগবানকে চিন্তা করিবে; কিন্তু চিন্তা কিরূপে করিব,—হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে! এখন একটু শান্তি চাই! ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা যতদূর সম্ভব, তাহা আমার বাকী নাই। পাপ সাগরে যতদূর ডুবিতে পারা যায়, আমার তাহা হইয়া গিয়াছে—এখন চাই একটু শান্তি!

চাহিয়া দেখিল রাত্রি অনেকটা হইয়াছে ; তাহার কিন্তু কিছুই বোধ নাই। তখন সেখান হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে গৃহের নিকট উপস্থিত হইল। গ্রামবাসী-গণ তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, গ্রাম্য কুক্কুরাদি জন্তু নিচয় মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছে। দুই একটী বাড়ী মাত্র এখনও লোকের অস্তিত্ব জানাইতেছে ; কোথাও বা আলোক-রশ্মি দেখা যাইতেছে। নবকুমার স্বীয় গৃহের সম্মুখে গিয়া দেখিল বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ। তখন নবকুমারের হৃদয় দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, মর্ম্মের ভিতর যেন অব্যক্ত যাতনা প্রাণের গ্রন্থি নিচয় যেন শত ছিন্ন হইতে লাগিল ; আর স্থির থাকিতে পারিল না। সন্ন্যাসীর উপদেশ—অক্ষয় দাদার উপদেশ, কোথায় ভাসিয়া গেল ; নবকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

কতক্ষণ নবকুমার এই ভাবে ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তবে মূর্চ্ছাভঙ্গের পর হৃদয়ে একটু বল আসিলে, সন্ন্যাসীর কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু কিছুই সে দেখিতে পাইল না : ধীরে ধীরে সুবদনির গৃহে প্রবেশ করিল। সেদিন সুবদনির স্বামী কার্য্যান্তরে ভিন্ন গ্রামে গিয়াছেন, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই ; তাই সুবদনি এখনও বসিয়া আছে। সহসা অন্ধকার মধ্যে একটী মনুষ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সুবদনি বলিল—"কে" ?

নবকুমার কম্পিত কণ্ঠে বলিল "একজন হতভাগা"। এ কণ্ঠস্বর সুবদনির পরিচিত হইলেও, সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। যেন খুব পরিচিত বলিয়াই বোধ হইল, কিন্তু তবুও কে, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া পুনরায় বলিল, "চিনিতে পারিলাম না,—আপনি কে" ?

নবকুমার ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলে, সুবদনি আলোক আনয়ন করিয়া দেখিতে পাইল যে "নবকুমার"। তখন সুবদনি কি বলিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! তাহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে জড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তাহাদের সংসারের সমস্ত দুর্দ্দশার কথা—বিনোদিনীর কথা সব মনে পড়িল ; নবকুমারকে দেখিয়াও যেন নয়ন বিশ্বাস করিতে চায়না। যাহা হউক সুবদনি অতি শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া, "আসুন আসুন" বলিয়া বসিবার জন্য আসন ও পদ-ধৌতের জল আনিয়া দিল। নবকুমার পদ প্রক্ষালন করিয়া নিস্তব্ধে আসন গ্রহণ করিল। এমন সময় সুবদনির স্বামী গৃহে ফিরিলেন ; তিনিও নবকুমারকে দেখিয়া অবাক্! তিনি বলিলেন "তারপর ভায়া, কতক্ষণ আসিয়াছ" ?

নবকুমার বলিল "এইমাত্র"। সুবদনি বলিল—"এতদিন কোথায় ছিলেন ?"

নবকুমারের তখন কথা বলিবার শক্তি নাই—হৃদয় যেন বোধ-শক্তি বিরহিত; কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পায় না। অতি কষ্টে বলিল,—"কোথায় আর থাকিব,—আমার থাকিবার স্থান এখনও তৈয়ার হয় নাই; ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমাদিগকে দেখিতে আসিলাম"। কথা বলিতে বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তখন সকলেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিল। ইতিমধ্যে সুবদনি কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিলে, বহু অনুরোধে নবকুমার সামান্য মাত্র গ্রহণ করিল; কিন্তু সে বিনোদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ইহারাও কিছুই বলিতে পারেন না; কাজেই কিছুক্ষণ ঐরূপ ভাবেই চলিল। দুই একটী কথার পর সুবদনির স্বামী বলিলেন,—"কি করিবে ভাই! সবই অদৃষ্টের ফল,—নইলে কি সোনার সংসার ছারখার হয় ?"

নবকুমার। অদৃষ্ট নয় ভাই—আমার কর্ম্মফল! জান ত' ভাই, আমি কি পাপ কার্য্যই না করিয়াছি! আমি হেমলতাকে পথের ভিখারী করিয়া কত বিপদেই না ফেলিয়াছি! আমার এরূপ না হইলে, পাপের যে একজন দণ্ড দাতা আছেন, ইহা লোকে জানিবে কিরূপে ? আর না জানিলে জগতে পাপের স্রোত ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। আমার ঠিকই হইয়াছে! এখন বল ত' ভাই, বিনোদিনী বাঁচিয়া আছে কিনা ? মা ত' মারা গিয়াছেন আমি বুঝিতেই পারিতেছি।"

"মায়ের মৃত্যু সংবাদ কে তোমাকে দিয়াছে ?"

"সংবাদ কেহই দেয় নাই, মনের বিশ্বাস জানাইলাম"।

"তোমার মাতার পরলোক গমনের পর বিনোদিনী আমাদের বাটীতেই থাকিত। সহসা আজ কয়দিন হইল সে আমাদিগকে না বলিয়া পলায়ন করিয়াছে; অনেক অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পাওয়া গেল না। আজও সেই উদ্দেশ্যে এক জায়গায় গিয়াছিলাম, সেখানে শুনিলাম, যে কিরূপে সে শুনিয়াছে যে, তুমি কাশীতে আছ, তাই সে কাশীযাত্রা করিয়াছে।"

নবকুমার মনে মনে বলিল, ধন্যা বিনোদিনী—তুমি ধন্যা! আমি নরকের কীট, তুমি স্বর্গের পারিজাত! আমার ন্যায় মর্কটের কণ্ঠে তোমার ন্যায় মতির হার শোভা পাইবে কেন ? এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্তের অবস্থা যেন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; আবার যেন আশার ক্ষীণ আলোক মর্ম্মপ্রান্তে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। মানুষের হৃদয়ে আশা না থাকিলে মনুষ্য জীবন নিতান্ত দুঃখের হইত। এইমাত্র নবকুমার সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়া

অরণ্যে গমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, আবার এখনি কি এক আশার কুহকে যেন স্বপ্নময় রাজ্যে নীত। তাহার মন যেন বিনোদিনীর নিকট চলিয়া গিয়াছে, সে যেন সত্য সত্যই তাহার সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া দুঃখের কথা জানাইতেছে। দুঃখ, নৈরাশ্য, ভীতি তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল; যখন সে জীবিত আছে, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেই—হইবে, এই অপার আনন্দে হৃদয় মত্ত হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর সরলতা আর তাহার দুর্ব্ব্যবহার,—দেখা হইলে কত কথাই বলিবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া নবকুমার বলিল, সুবদনি! বিনোদিনীর ঘরে আমাকে রাখিয়া আইস, আমি আজ সেইখানেই রাত্রি কাটাইব! হৃদয়ের অবস্থা বুঝিয়া তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া, আলোক ও বিছানা লইয়া সেই ঘরে তাহাকে রাখিয়া আসিলেন। বিনোদিনীর কাতর ক্রন্দনে যে ঘরে নবকুমার প্রবেশ করিত না, আজ সেই ঘরে মহা আনন্দে সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। নবকুমার ভাবিল, এই গৃহে বিনোদিনী শয়ন করিত, এই ঘরে বিনোদিনী তাহার জন্য বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিত। এই ঘরে বিনোদিনীর স্মৃতি মিশ্রিত! এই আমার নন্দন কানন, ইহাই আমার তপ-নিকুঞ্জ! নানা চিন্তায় কখন হর্ষ, কখন বিষাদ, কখন আশা, কখন নৈরাশ্যের মধ্যে পড়িয়া তাহার নিদ্রা আসিল না। বহুক্ষণ পরে নবকুমার তন্দ্রাভিভূত হইয়া তন্দ্রাঘোরে যেন দেখিতেছে,—বিনোদিনী পার্শ্বে বসিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতেছে, এবং নবকুমার যেন কাতর ভাবে বলিতেছে—"বল বিনোদিনী আমাকে ক্ষমা ক্ষমা করিলে কিনা? আমি বড়ই অপরাধী, আমার পাপের ক্ষমা নাই! আমি তোমাকে কত কষ্টই দিয়াছি! তুমি ক্ষমা না করিলে, আবার এ জীবন গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিব? এই কথা বলিতে বলিতে যেন তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; বিনোদিনী যেন তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া বলিতে লাগিল,—একি কথা বলিতেছ? তুমি আমার স্বামী, এ দেহ—এ মন তোমার; ইহাতে যদি দুঃখ বা সুখ কিছু হইয়া থাকে, সে ত' তোমারই হইয়াছে, তজ্জন্য আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছ কেন? আমি যে চিরকালই তোমার শ্রীচরণের দাসী।" এই বীণাধ্বনিবৎ কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিল। এ স্বর যেন মধু হইতেও মধুর, যেন সুধার ক্ষরণ। তাহার স্পর্শ যেন কতই মিষ্ট, এ বিনোদিনী যেন সে বিনোদিনী নয়।

সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নবকুমার উঠিয়া বসিল; কিন্তু বিনোদিনীকে স্বপ্ন দর্শনে তাহার চিত্ত যেন কিরূপ হইয়া গেল। বিনোদিনী আমার

অপরাধ গ্রহণ করে নাই। বিনোদিনী মানবী নহে—দেবী! গৃহের এক পার্শ্বে একখানি পত্রিকা পড়িয়াছিল, কুড়াইয়া দেখিল বিনোদিনীর হস্তলিপি। সাদরে গ্রহণ করিয়া দেখিল উপরে তাঁহারি নাম লেখা। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিল।—

জীবন সর্ব্বস্ব!

জানিনা তুমি কোথায়; জানিনা তুমি আমার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছ কিনা? কিন্তু আমার হৃদয় মন তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার চিন্তা, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন। আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন দেবদেবীর আরাধনা করি নাই; তোমার ভিতরেই ভগবানের প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য প্রার্থনা করি।

হৃদয় দেবতা! যদি কখনও এই পত্রিকা তোমার হস্তগত হয়, একবার পড়িও। আমার হৃদয়ের ভাষা মুখে ব্যক্ত করিয়া কখন তোমাকে শুনাইতে পারি নাই, তোমার আমোদ আহ্লাদের কখন অবসর পাই নাই; অধর পল্লবের সুধারাশি কখন উপভোগ করি নাই। কিন্তু তবুও তোমার চরণ-সেবিকা হইবার আশা এখনও পরিত্যাগ করি নাই। শুনিলাম তুমি কাশীধামে আছ, তাই কাশী যাত্রা করিলাম। জানিনা কাশীধাম কতদূর,—জানিনা তথায় যাইতে পারিব কিনা, জানিনা তুমি সত্য সত্যই কাশীধামে আছ কি না,—থাকিলেও দর্শন দিয়া আমার প্রাণের তীব্র পিপাসা মিটাইবে কি না? তবুও আমি কাশী যাইবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। বুঝিয়েছি যে ইহা বড়ই কঠিন ব্যাপার, এ পথে বিপদের সম্ভাবনা; কিন্তু তবুও সাহসে বুক বাঁধিয়া তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে যাত্রা করিলাম। তোমার স্মৃতি আমার পথশ্রম শান্ত করিবে,—হৃদয়ের জ্বালা দূর করিবে,—অবসন্নতা বিতাড়িত করিবে। আর যদি জীবন যায়, তবে তোমার চিন্তায় জীবন হারাইয়া পরজন্মে তোমাকেই লাভ করিয়া এ জন্মের সাধ মিটাইব।

তোমার রূপ উপভোগ করিতে চাহিনা—গুণ অগুণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চাহিনা,—ধন,মান, যশ, প্রণয়, ভালবাসা কিছুই তোমার নিকট আশা করি না; চাহি কেবল তোমার চরণের দাসী হইতে। প্রাণেশ্বর! যে দিন তুমি আমাকে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাও, সে দিন ব্যতীত তোমার অঙ্গ স্পর্শের সুখ কখনও উপভোগ করি নাই। কেন তুমি গৃহত্যাগ করিলে? প্রত্যহ পদাঘাত করিয়া গৃহে থাকিলেও ত' কোন ক্ষতি ছিল না! আমি ত'

তোমায় অনর্থক বিরক্ত করিতাম না। যখনই তুমি আমার অলঙ্কার চাহিয়াছ, মাতার অজ্ঞাতসারে তখনই তোমাকে অর্পণ করিয়াছি; কখন তাহার কারণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে তুমি কোন্ অপরাধে দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে?

অবশ্য বিধাতা যাহাকে কষ্ট দিবেন, তাহা কেহই খণ্ডাইতে পারে না; কিন্তু ইহাতে যে তোমারই কষ্ট হইল। তোমার হয়ত' কোন দিন আহার হয় না—কোন দিন পথশ্রমে ক্লান্ত, পদ-সেবার জন্য দাসীকে সঙ্গে লইলেই ত' চলিত। কতজন কতরূপ কথা বলে বটে কিন্তু আমার বেশ মনে হয় যে, তুমি খুব কষ্টেই সময় অতিবাহিত করিতেছ। আমি নিয়ত মহামায়ার নিকট তোমার মঙ্গলের জন্য মাথা খুঁড়িতেছি;—কিন্তু প্রাণে শান্তি নাই, আহারে রুচি নাই। মায়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে, আমার একটী দায়ের অবসান হইল; কারণ তোমার অবর্ত্তমানে মায়ের সেবা না করিলে প্রত্যবায় ঘটিত। যদি নিতান্তই ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে তুমি বাটীতে থাকিলে না কেন? আমি যেখানে হয় চলিয়া যাইতাম। যাহা হউক এখন শুনিলাম তুমি কাশীতে আছ। আমি এখানে বসিয়া সুখে গ্রাসাচ্ছাদন করিব, তাহা হইতেই পারে না; আমিও তোমার ন্যায় এক বসনে একাকিনী দেশ পর্য্যটন করিব, তোমার অনুসন্ধানে জীবনের অবশিষ্ট দিন যাপন করিব।

আরাধ্য দেবতা! হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া বিবাহের পর যখন তোমাকে স্বামীরূপে পাইলাম, সেই বালিকা বয়সে আমার কোন আবেগ ছিল না। স্বামীর মর্ম্ম বুঝিতাম না, বিবাহে তোমায় আমায় যে অচ্ছেদ্য বন্ধন হইয়া গেল, ইহা বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু যখন বুঝিলাম যে স্বামী স্ত্রীলোকের আরাধ্য দেবতা,—স্বামী দুঃশীল দুর্ভগ হউন, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি; সেইদিন হইতেই স্বামীর আরাধনায় মন দিয়াছি;—স্বেচ্ছায় তোমার করে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, ইহাই জীবনের মহাব্রত মনে করিয়া তোমারই অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছি।

কেহ কেহ বলে তুমি হেমলতাকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছ, কিন্তু আমার ইহা বিশ্বাস হয় না; কারণ হেমলতাকে আমি জানি, সে স্বর্গের দেবী! তাহার স্বভাব কখন জঘন্য হইতে পারে না। আর যদি তাহাই হইয়া থাকে, আমি তাহাতে বাধা দিতে চাহি না; চাহি কেবল তোমাকে দেখিতে. তাহাতে যদি বাধা থাকে, তবে শুনিতে চাহি তুমি সুখে আছ।

তোমার চরণ-সেবিকা—

বিনোদিনী।

চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদর ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, এমন স্বার্থহীনা নারী-জীবন কিরূপ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। যাক্ আমিও বিনোদিনীর অনুসরণে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিব। বিনোদিনী একাকিনী অসহায়া, বেশ যেখানে অসহায়া রমণী দেখিতে পাইব, তাহাকেই মাতৃজ্ঞানে মনে মনে পূজা করিব, এবং যথাসাধ্য তাহার অভাব মোচনের চেষ্টা করিব। যেখানেই পতি পুত্রহীনা আমার চক্ষে পড়িবে, তাহার যতটুকু পারি ক্লেশোপনোদনের চেষ্টা পাইব, তাহা হইলে বোধ হয় এই স্ত্রীহত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। হে ভগবন্! যদি বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার মঙ্গল কর।

প্রাতে উঠিয়া সুরদনি ও তাহার স্বামী আর নবকুমারের সন্ধান পাইল না।

(ক্রমশঃ)

অর্থ] হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহামুনি বেদব্যাসের অমৃতময় লেখনী-মুখ-নিঃসৃত বেদান্ত দর্শন সুধা সমাজে সুপরিচিত এবং বিশেষরূপে সমাদৃত; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। তবে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এই বেদান্ত দর্শনই দর্শনরাজ্যের সম্রাট্। প্রায় সকলেই ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। অধিক কি, সৌর, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণও বেদান্ত দর্শনকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুযায়ী করিতে অথবা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে বেদান্ত দর্শনের অনুমোদিত করিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং সকলেই আপন আপন সিদ্ধান্তকে ইহার অনুমোদিত মনে করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছেন। এতদ্দর্শনে মহাকবি কালিদাসের "অহমেবমতো মহীভুজঃ, ইতি সর্ব্বা প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ৎ" কথাটী মনে পড়ে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ অপূর্ব্ব গৌরব সম্পৎ অন্য কাহারো ভাগ্যে ঘটে নাই।

মহর্ষি-গোতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বেদব্যাস এইরূপে সনাতন ধর্ম্ম-সেতুর সুব্যবস্থিত ও দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, নাস্তিকতা নিরস্ত হইল; ধর্ম্মরাজ্যের অনর্থকর কোলাহল অন্তর্হিত হইল। প্রকৃতিপুঞ্জ পুনর্ব্বার

বেদ বিধি শিরোধারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং শান্তশীল সাধু হৃদয় নিরুদ্বেগ হইল। এইরূপে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধতাময় শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, তদ্রূপ ভারতের ধর্ম্ম জগৎও কিয়ৎকালের জন্য প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল বটে, কিন্তু সেই প্রশান্ততাই আবার অচিরে প্রবল প্রভঞ্জনাকারে পরিণত হইয়া বিষম ধর্ম্ম বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে বেদ বিরুদ্ধ প্রবল বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। তাহার তীব্র তাড়নায় বেদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়া গেল। বেদ বিরোধী বিষম বিপ্লব বন্যার প্রবল বেগে ঋষি প্রতিষ্ঠিত সেই পুরাতন ধর্ম্ম-সেতুর দৃঢ় বন্ধনগুলি একে একে খসিয়া যাইতে লাগিল। সমাজে উশৃঙ্খলতা পিশাচীর প্রচণ্ড তাণ্ডবে ধর্ম্মপ্রাণ সাধুহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, এবং কাতর কণ্ঠে ভক্তবৎসল ভগবানের স্তুতি গান করিতে লাগিল।

এমনই বিষম সময়ে—সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীতে শিবাবতার স্বামী শঙ্করাচার্য্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্করের শিশু জীবন অতি বৈচিত্র্যময়, কিন্তু তাহার আলোচন এখানে অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তিনি পূজ্যপাদ গোবিন্দপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শৈশবের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতেই, শাস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে সমুৎসুক হইলেন।

কথিত আছে যে, গোবিন্দপাদের গুরু আচার্য্য গৌড়পাদের নিকটে তিনি প্রথমে বিদ্যা শিক্ষা মানসে গমন করেন; কিন্তু বার্দ্ধক্য জনিত অপটুতা নিবন্ধন গৌড়পাদ স্বয়ং অধ্যাপনে অসম্মত হন এবং গোবিন্দপাদের নিকট প্রেরণ করেন। অধিকন্তু তাঁহাকে দুর্জ্জয় বৌদ্ধ বিজয়ের জন্য সচেষ্ট হইবার উপদেশ প্রদান করেন। সৎক্ষেত্রে পতিত বীজ যেমন যথাকালে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি শঙ্করের হৃদয়-নিহিত গৌড়পাদের সেই উপদেশ-বীজ উপযুক্ত সময় পাইয়া কার্য্যোন্মুখী হইল। তিনি বৌদ্ধ বিজয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি প্রধানতঃ বৌদ্ধেরই অভিমত লোকপ্রিয় বিজ্ঞান-বাদ অবলম্বন করিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে, বৌদ্ধ বলেন—প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশশীল বুদ্ধি-বিজ্ঞানই আত্মা। শঙ্কর বলিলেন—বিজ্ঞান যে আত্মা, একথা সত্য, কিন্তু সে বিজ্ঞান ক্ষণিক বুদ্ধিবৃত্তি নহে; পরন্তু "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি কথিত নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিজ্ঞান। বৌদ্ধ বলেন,—দৃশ্যমান বাহ্য জগৎ সত্য নহে, ইহা কেবল আন্তর বুদ্ধি বিজ্ঞানের বিলাস বা কল্পনা মাত্র।

শঙ্কর বলিলেন,- বাহ্য জগৎ—কেবল বাহ্য জগৎ কেন, ব্রহ্মেতর পদার্থ মাত্রই অসত্য বা মিথ্যা বটে; কিন্তু তা বলিয়া তোমার আমার কল্পনাপ্রসূত নহে। পরন্তু "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতি বোধিত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের সঙ্কল্প প্রসূত। বৌদ্ধ বলেন,—বুদ্ধি বিজ্ঞানের প্রবাহ বিচ্ছেদই জীবের মুক্তি। শঙ্কর বলিলেন,—মুক্তিতে বুদ্ধি-বৃত্তির বিচ্ছেদ ঘটে সত্য, কিন্তু তোমার মতে বুদ্ধি বিজ্ঞানই যখন আত্মা এবং বিজ্ঞানের প্রবাহ বিচ্ছেদে যখন আত্মারও উচ্ছেদ বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; অথচ আত্মোচ্ছেদ যখন কাহারো কাম্য বা প্রার্থনীয় হইতে পারে না বা হয় না, তখন বিজ্ঞান প্রবাহের বিচ্ছেদকে কখনই মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে পারে না। অতএব "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতি সম্মত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই মুক্তি। এবম্বিধ যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য নিবন্ধন কেহ কেহ শঙ্করের মতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলিয়া ঘোষণ করিয়াছেন; 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ" ইত্যাদি।

আচার্য্য শঙ্কর আপনার অভিমত অদ্বৈতবাদ দৃঢ়ী করণার্থ প্রসিদ্ধ ও সারগর্ভ কতিপয় উপনিষদের ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর প্রসন্ন গভীর বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই সমস্ত ভাষ্য মধ্যে বিবিধ শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির সাহায্যে বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন।

অনেকের বিশ্বাস শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদের নাম গন্ধও ছিল না। বস্তুতঃ এরূপ ধারণা অমূলক ভিত্তিহীন। শঙ্করের বহুকাল পূর্ব্বেও অদ্বৈতবাদের যথেষ্ট প্রচার ও প্রতিপত্তি ছিল। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও স্বমত সমর্থনের জন্য ভগবান উপবর্ষের মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং শঙ্করের পরম গুরু গৌড়পাদ কৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকায় অদ্বৈতবাদের বিশেষ সমর্থন রহিয়াছে। অধিক কি, অতি প্রাচীন যোগবাশিষ্ট ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থেও অদ্বৈতবাদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর কেবল চির পরিচিত সেই সিদ্ধান্তটিকেই নূতন ছাঁদে ঢালিয়া পরিবেশন করিয়াছেন মাত্র।

আলোচ্য অদ্বৈতবাদের প্রধান বিষয় তিনটী (১) ব্রহ্ম সত্যং, (২) জগন্মিথ্যা, (৩) জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ। (১) ব্রহ্মের সত্যতা (২) জগতের মিথ্যাত্ব, (৩) ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নত্ব। এই তিনটী মাত্র বিষয় লইয়াই অদ্বৈতবাদ পরি-

সমাপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈত মতে ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার। (১) স্বরূপ লক্ষণ (২) তটস্থ লক্ষণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি স্বরূপবোধক বাক্যগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্ম নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষে বাক্য ও মনের অতীত, তাঁহাকে কোন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না এবং সাধারণ মনের দ্বারাও ধারণা করা যায় না। এইজন্য "নৈব বাচা ন মনসা দ্রষ্টুং শক্যো ন চক্ষুষা" "অস্থূলং অনণু" "অশব্দমস্পর্শনরূপমব্যয়ং" ইত্যাদি শ্রুতিও কেবল নঞ ঘটিত শব্দ দ্বারা নিষেধ মুখে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মের অপর লক্ষণটী তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ লক্ষিত ব্রহ্ম সগুণ বা সবিশেষ। যেমন "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। এই সবিশেষ ব্রহ্মই জগৎ কারণ ঈশ্বর। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, যদিও শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় ভাবই বর্ণিত আছে, তথাপি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির তাৎপর্য্য। সবিশেষ ভাবটী মায়া কল্পিত, *কেবল উপাসনার উপযোগী মাত্র, নির্ব্বিশেষ ভাবই সত্য।*

অগ্নির অন্তর্নিহিত দাহিকা শক্তির ন্যায় সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মেরও অন্তর্নিহিত একটী শক্তি আছে, সেই শক্তির নাম মায়া। অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি প্রভৃতি ইহারই নামান্তর মাত্র। বেদান্তের মায়া আর সাংখ্যের প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। সাংখ্যের প্রকৃতি জড় পদার্থ হইলেও নিত্য সত্য ও স্বতন্ত্র: কিন্তু বেদান্তের মায়া অনাদি হইলেও অসত্য তুচ্ছ পদার্থ এবং পরতন্ত্র বা ঈশ্বরাধীন।

জগৎ মিথ্যাত্ব

অদ্বৈতবাদীর মায়া সৎ বা অসৎ নহে, তবে জ্ঞান বিরোধী বটে। কিন্তু জ্ঞানের অভাব নহে এমন কোন এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। এই মায়া শক্তির সহযোগেই ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব—ঈশ্বরত্ব উপস্থিত হয়। শেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন,— "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্," মায়াকে প্রকৃতি আর মায়োপহিতকে ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। কথিত মায়ার আবার দুই প্রকার শক্তি আছে। একটীর নাম আবরণ শক্তি, অপরটির নাম বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তি দ্বারা প্রথমে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সমাবৃত হয়, অনন্তর বিক্ষেপ শক্তি তদুপরি অপর একটী অবস্তুভূত বস্তু সৃষ্টি করিয়া দেয়। প্রথমে সম্মুখস্থ রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপটী অজ্ঞানে আবৃত হয়, দৃষ্টি গোচর হয় না; পশ্চাৎ সেই রজ্জুতে অপর একটী বস্তুর সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, তখন রজ্জুই সর্প হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ শক্তিদ্বয় সমন্বিত মায়া স্বীয় শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ সমাবৃত করিয়া

ঈশ্বরত্ব বা সবিশেষ ভাব সমুৎপাদন করে। লূতা (মাকড়সা) যেমন অপর কোনও বাহ্য বস্তুর সাহায্য না পাইয়া আপনার শরীর হইতে সূত্র নিষ্কাশিত করিয়া বিচিত্র জাল প্রস্তুত করিয়া থাকে, তেমনি শক্তিদ্বয় সমন্বিত মায়োপহিত ঈশ্বরও এই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দৃশ্যমান জগৎ মায়ার পরিণাম হইলেও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র, সুতরাং নিজে অসত্য অবস্তু হইলেও পরমার্থ সত্য ব্রহ্মের সত্বায় সত্বাবান্ হইয়া লোক ব্যবহারে উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। জীব যতদিন ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ না করিবে, ততদিন তাহার পক্ষে এই জগৎ সত্যবৎ প্রতিভাত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ।

অর্ঘ্য]

ব্রাহ্মণ।

হে ব্রাহ্মণ! হিমাদ্রি-শিখরসম ভারতের দীপ্ত শিরোমণি!
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির চেয়ে দেখ, আজিকার পঙ্কিল ধরণী।
কাতরে তোমারি পানে চেয়ে আছে, অপমানে মৌন নতশির।
আজিকার এ দুর্দ্দিনে, তুমি তারে স্বচ্ছ শান্ত উদার গম্ভীর।
বেদ মন্ত্র গাহি, পঙ্ক হ'তে তুলি ধর, মুছে দাও সব ব্যথা।
অকলঙ্ক দৃষ্টি দিয়ে ধৌত কর আজন্মের মৌন আবিলতা।
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে। হে ব্রাহ্মণ! মনে পড়ে সেই লগ্ন বেলা;—
যেদিন প্রথম সেই উষাখানি জেগেছিল, নিতান্ত একেলা।
উচ্চ হিমাচল শিরে, চরণে শিহরেছিল প্রণমিতা মূক।
বসুমতী, তুমি সেথা সদ্যঃস্নাত সৌম্যকান্তি অকলঙ্ক-মুখ।
বিপুল সে উষালোকে গেয়েছিলে কি প্রশান্ত—কি উদাত্ত গান!
অমনি চরণ তলে পঞ্চনদে জেগেছিল কি বিপুল প্রাণ!
মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন ঈশাণ কোণে প্রথম সে মেঘ;—
উঠেছিল পুঞ্জীভূত জলভারানত, তোমার পুলকাবেগ।
সেদিন আপনাহারা হৃদয়ের দ্বার খুলি, অনন্তের সাথে,—
ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছিল কি বিপুল গান! আজিও সে কল্পনাতে।

হৃদয় মুরছি পড়ে,—ভক্তি-নত, সেদিনের চরণের তলে।
মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন এ নিখিলের অনন্ত কল্লোলে।
তোমার সৌন্দর্য্য-গীতি,—অনন্তের পূর্ণ অনুভূতি সগৌরবে,—
মিশেছিল, তোমার অমর গীতে অমরতা পেয়েছিল সবে।
সেইদিন জলে, স্থলে, সরোবর পদ্মাকরে, সূর্য্য চন্দ্রালোকে,
ওষধিতে, দেবতা প্রত্যক্ষ করি, উঠেছিল শিহরি পুলকে।
আজিও এ দুর্দ্দিনের অশ্রুধারা মাঝে, সগৌরবে, হে ব্রাহ্মণ!
দাঁড়াও আসিয়া, বিশ্বাসে অটল, প্রেমপূর্ণ, ভক্তি-নত মন।
অন্তরে বাহিরে মাখি' পৌত পবিত্রতা, চন্দন চর্চ্চিত-কান্তি,—
শিরে জটাভার, হৃদয়ে পূরিয়া ল'য়ে কর্ম্মের পরম শান্তি।
ভুবনে রচিয়া তুল আবার সে শান্ত তপোবন, সামগানে,—
পূর্ণ করি নভস্তল, সঞ্চারিয়া প্রেমধারা নিখিলের প্রাণে।
আজিকার ধরণীতে পঞ্চনদ কলকণ্ঠে গেয়ে যাবে ধীরে।
প্রথম সে উষাখানি দেখা দিবে আজিকার গগনের শিরে।
তোমার চরণতলে লুটিয়া পড়িবে সবে ভক্তি-অবনত।
তোমার চরণধূলি মাখিয়া অমর হবে দেবতার মত।

শ্রীজগত্তারণ দাস।

অর্ঘ]

ঊর্দ্ধবাহু।

সে সময়ে মনটা বড়ই অস্থির। একটা অন্তর্দ্দাহ যাতনা ও শূণ্যতাব্যঞ্জক ব্যাকুলতায় জীবনটা তখন একরূপ ধর্ম্মহীন, উদ্দেশ্য বিহীন ও অবলম্বনশূন্য ছিল। হইবারই কথা, হাল ফ্যাসান অনুযায়ী যত কিছু অনাচার, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অগম্যা-গমন, পরচর্চ্চা, কুৎসা ও কুৎসিৎ আমোদ প্রভৃতি সকলেই যেমন করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপই করিয়াছি। সকলেরই মত ঐরূপ কার্য্যাবলীর জন্য যেরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি করা উচিত, তার কোনটাই করি নাই; তাহার ফলে এই অনির্দ্দেশ্য আকুলতা, অন্তর্দ্দাহ ও মানসিক প্রদাহ। চিত্তভার কথঞ্চিৎ লাঘবের নিমিত্ত সায়ং সন্ধ্যায় নদীতীরে বসিয়া থাকিতাম। পার্শ্বেই শিবমন্দির ও

সম্মুখে স্নানের ঘাট। ঘাটে বসিয়া প্রাচীনেরা অনেকে সন্ধ্যা-বন্দনা ও শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া মধ্যে মধ্যে শান্তিও পাইতাম।

ঘাটে মধ্যে মধ্যে দু'একটী সাধু আসিয়া থাকিতেন। কেহ কেহ দু'একমাসও থাকিতেন। সেই সময়ে একজন উৰ্দ্ধবাহু অবস্থান করিতেছিলেন। সাধুদের ন্যায় যথারীতি ধুনা, ভস্ম, আশা, চিম্‌টী প্রভৃতি জাঁকজমকের কোনই অপ্রতুল ছিল না। লোকও জুটিত, তবে অধিকাংশই গঞ্জিকার প্রত্যাশায়; সুতরাং আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে নিকট বা দূর হইতে দর্শন করা ছাড়া আর কোন উপকারিতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বিশেষতঃ এই সকল উৰ্দ্ধবাহু প্রভৃতি সাধুর দলকে কখনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। পূর্ব্বকথিত উৰ্দ্ধবাহুটী মৌনী; কিন্তু কি জানি যেন এই সাধুটীর প্রতি কতকটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম! তাঁহার মুখে কেমন একটা পূর্ণ প্রসন্নতা, সৌম্য, শান্তি ও সৌন্দর্য্য ছিল। চোখে এমন একটা উদাস লালিত্যমাখা ভাব ছিল, যাহাতে সহজেই বোধ হইত যেন ইনি এমন একটা কিছু স্বর্গীয় বা অপার্থিব বস্তু বা ভাব পাইয়াছেন,—যাহাতে এই শোক-দুঃখময় সংসারের সমস্ত জ্বালা-মালা ও অভাব অভিযোগ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

তাঁহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠ ভাবেই মিশিয়া পড়িলাম। মধ্যে মধ্যে বহু বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ও আলাপ হইত। কথাবার্ত্তা শব্দটা ঠিক হইল না, কেননা তিনি মৌনী। আমাদের যা কিছু মনো-বিনিময় চোখে চোখেই হইত। ইহাতে কোন অসুবিধাই ঘটিত না; কেননা বৈখরী বাকের মধ্যস্থতা আশ্রয় না করিয়াও, আলাপ অনেক সময়েই অধিকতর দ্রুত ও স্পষ্টভাবেই নিষ্পন্ন হইত। যাঁহাদের মূক বধির আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহারাই বুঝেন যে বিনা বৈখরী বাক্‌-সাহায্যে কিরূপে স্পষ্ট ও দ্রুতভাবে সকল বিষয়ক কথাবার্ত্তাই কহিতে পারা যায়। একদিন নিভৃতে তাঁহাকে আমার চিত্তবৈকল্যের কথা জানাইলাম। সাধু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে উপদেশ লিখিয়া দিবেন। তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম সংগ্রহ করিয়া দিলাম, সময় পাইলেই একাগ্র চিত্তে অনর্গল লিখিয়া যাইতেন। দুই তিন দিন পরে লেখা শেষ হইলে, আমাকে সেইটা বাড়ীতে লইয়া গিয়া পড়িবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

"আমার নিবাস বৰ্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী দামোদর তীরস্থ তিলুটী গ্রামে। আমি পল্লীগ্রামের স্বচ্ছল সংসার-ভুক্ত অৰ্দ্ধশিক্ষিত নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ

যুবক; কাজেই দৈনিক ও সাধারণ জীবন কিরূপভাবে অতিবাহিত করিতাম, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমি গল্প বা উপন্যাস লিখিতে বসি নাই; অথবা আমার গত জীবনের কলঙ্কিত কাহিনীর পুনরুল্লেখ করিয়া কাহাকেও চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ করিবার প্রবৃত্তি নাই; তবে যতটুকু উল্লেখ করা আবশ্যক, এস্থলে কেবল ততটুকুই অতি সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি।

ললিতার নিবাস আমাদেরই গ্রামে; সে আমার দূর সম্পর্কে আত্মীয়া। তাহার স্বামী বিনোদ পশ্চিমে কনট্রাক্টরী করিত। তাহার বাটীতে অন্য অভিভাবক বা লোকজন না থাকায়, আমাদেরই উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল। ললিতা যুবতী ও সুন্দরী; সুতরাং অগ্নি ও ঘৃতের একত্র সংযোগে যে ফল হয়, তাহাই ঘটিল। উভয়েই দ্রুত পাপের পিচ্ছিল পথে নামিয়া গভীর পঙ্কে পড়িলাম। গুপ্ত প্রণয়—নবীন কামজ অনুরাগ; অতৃপ্তি নাই—বাধা বিপত্তি নাই। কিন্তু এ সকল বিষয়ে লোক যতই বুদ্ধিমত্তার সহিত সাবধানতা অবলম্বন করুক না কেন, তাহা প্রকাশ হইয়াই পড়ে। লোকে এ বিষয় লইয়া কাণাকাণি ও সমালোচনা আরম্ভ করিল, প্রকারান্তরে স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে আমাদেরও দু'চার কথা শুনাইতে লাগিল; তাহাতে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করিলাম না।

সংবাদ আসিল বিনোদ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে এবং শীঘ্র আসিয়া ললিতাকে তাহার কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবে। এই সংবাদ আমাদের মস্তকে আকস্মিক বজ্রাঘাতের ন্যায় হানিয়া পড়িল। এখন উপায়! আমি ললিতাকে—অথবা ললিতা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে কি না? আমি ললিতাকে প্রাণের সহিত চাই, অথবা জগৎ সংসার বন্ধু-বান্ধব চাই? ললিতা আমাকে চায়, কিম্বা স্বামী চায়। বিচারে সাব্যস্ত হইল, আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ অসম্ভব, অসহ্য ও মৃত্যুবৎ; সুতরাং যেরূপে হউক, নিষ্কৃতিই বাঞ্ছনীয়। এক উপায়, বিনোদ আসিবার পূর্ব্বেই দূরদেশে গোপনে পলায়ন এবং দম্পতির ন্যায় বসবাস। তাহাতেও কিন্তু অনেক গোলযোগ, ভবিষ্যতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা,—অর্থাভাব ও লোক-লাঞ্ছনা।

আর একটা গুরুতর সঙ্কল্প মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিল। এটা যেমন ভীষণ, তেমনি কদর্য্য! যদি বিনোদের আগমন-বার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, আসিবার রাত্রেই তাহাকে ইহজগত হইতে 'সরাইয়া ফেলিতে পারা যায়, তাহা

হইলে একেবারেই নিষ্কণ্টক। কতকগুলি সুবিধাজনক যোগাযোগও ঘটিল; কেননা ঘটনাক্রমে বিনোদ যখন গ্রামে আসিবে, তখন রাত্রি গভীর! আর তার আগমন সংবাদ গোপন রাখাও সম্পূর্ণরূপে ললিতার আয়ত্তাধীন। সঙ্কল্প যেমন উদ্ভট ও দুরূহ, কার্য্যে পরিণত করাও ততদূর বিষম ও ভয়-সঙ্কুল।

ভয়, উদ্বেগ, উৎসাহ, আশা, পরিণাম, ভবিষ্যৎ, সন্দেহ ও বিবেকে বারম্বার বিচলিত হইতে লাগিলাম। কামান্ধ আমরা, তাই ইহার অপর বা কুফলের দিক্ মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিল না। সঙ্কল্প স্থির হইলে ব্রতী হইবার জন্য আবশ্যকানুযায়ী পুরশ্চরণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কুহকিনী আশা মরীচিকার জাল বিস্তার করিয়া কর্ণে বিষরাশি ঢালিয়া দিয়া উৎসাহ দিল,—ইহাই প্রকৃত পন্থা; একেবারে নিষ্কণ্টক হইয়া সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অর্থবলে সকল লালসার অজরামরবৎ তৃপ্তি সাধন ঘটিবে। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! ললিতাও ইহাতে সায় দিল এবং সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি অগ্রগামী হইয়া রাণীগঞ্জ ষ্টেসন হইতে বিনোদকে অর্ভ্যথনা করিয়া, একখানা গোশকটে আরোহণপূর্ব্বক গভীর রাত্রে গ্রামে পৌঁছিলাম। পথে আসিতে আসিতে তখনো সন্দেহদোলায় দুলিতেছিলাম; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সঙ্কল্প ও মন স্থির হইয়াছিল। সন্দেহে স্তিমিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও দৃঢ়ভাবে মনোমধ্যে বসিয়া গেল। ভগবানের কৃপায় এখনো পর্য্যন্ত বাধা ঘটিল না, গ্রামের কেহই তার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিল না। বিস্তারিত বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, সঙ্কেত মত ললিতা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবামাত্র, তুচ্ছ উদ্দাম এবং যৌবনের প্রলোভনে ও কামজ-মোহের তাড়নায় মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরপরাধ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ত নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও আত্মীয় নাশ করিলাম যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সহিত বিনোদের মৃতদেহ উদ্যান মধ্যে গভীর গহ্বরে প্রোথিত করিয়া, রক্তাক্ত বস্ত্র কতক ধৌত—কতক বা নদীবক্ষে পুঁতিয়া ফেলিলাম।

সাময়িক উত্তেজনার প্রশমন হইবামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ, ভয়, লজ্জা ও পরিণাম আশঙ্কায় ঘেরিয়া ফেলিল। চক্ষুদ্বয় রক্তিম ও কি যেন একটা অবসন্ন ও মত্তভাব। দুই তিন দিবস দিনের বেলায় বাহির হইতে বা লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না। এইরূপ পাপ সঙ্কল্প ও কার্য্যে চির-অনভ্যস্ত—আমার অত্যন্ত অনুতাপ জাগিল। সম্মুখে লোক আসিলেই ভয় হইত, বুঝিবা জানিতে পারিয়াছে, তাই ধরিতে আসিতেছে; ক্রমে নিশ্চিন্ত হইলাম।

কোথা হইতে ধর্ম্মের ঢাক অলক্ষ্যে বাজিয়া উঠিল। বুঝিলাম এইবার বুঝি পরিত্রাণ নাই, পাপের সাজা হাতে হাতে ফলিবার উপক্রম। রাণীগঞ্জের পথে বিদেশাগত গো-শকট দেখিয়া একটা চোর আমাদের পাছু লইয়া বাটীর ভিতরে আসিয়া লুকাইয়াছিল। সে বেচারা চুরি করিবে কি, আমাদের বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে তিন লম্ফে একেবারে গ্রাম ছাড়া। কি জানি কি ভাবিয়া, সম্ভবতঃ পুরস্কারের লোভে থানায় গিয়া এই সুসম্বাদ প্রদান করে! দারোগাবাবু মামুলী প্রথায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মন্থর গতিতে—নবাবী চালে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। লাস বাহির হইল,—আট দশ খানা গ্রাম জুড়িয়া হুলস্থূল, সমালোচনা, মন্তব্য, হৈ চৈ পড়িয়া গেল। লোকে চকিতে ব্যাপারখানা আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইল। গাঁয়ের মধ্যে আমাদের পোড়াব মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল। তবে একটা নূতন কথা শুনা গেল যে, গ্রামের প্রায় সকল জ্ঞান-বৃদ্ধই এইরূপ প্রণয়ের যে এইরূপ পরিণাম ঘটিবে তাহা নিশ্চিতরূপেই জানিয়া ও বুঝিয়াছিলেন। তবে প্রকাশ করিলে হঠাৎ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নাম জাহির হইবার আশঙ্কায় কেহই ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই। তবসার মধ্যে আমাদের যথেষ্ট অর্থবল ও লোকবল ছিল; সুতরাং সকলকেই কদলী প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

প্রবল তদ্বিরের জোরে ললিত আসামী না হইয়া কেবল সাক্ষী শ্রেণীভুক্তা হইল; কিন্তু অন্য উপসর্গ আসিয়া আমাকে অবশেষ জড়াইয়া ধরিল। নদীবক্ষে যে কাপড়গুলি পুঁতিয়াছিলাম, তাহার একখানা কোনক্রমে ভাসিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পুলিশের হাতে গিয়া পৌঁছায়; তাহারই রক্তচিহ্ন ও ধোপার দাগে আমিও গ্রেপ্তার হইলাম। মোকদ্দমা দাঁড়াইল—ইচ্ছাকৃত নরহত্যা; আমি মূল আসামী এবং সেই চোর সহায়ক। বিপুল অর্থব্যয়ে ও তদ্বিরের জোরে দায়রার বিচারে প্রমাণাভাবে আমি খালাস পাইলাম; কিন্তু চোরটার দ্বীপান্তর হইল।

দীর্ঘ হাজত বাসের পর মুক্তি পাইয়া দুই চারি দিন মুখ দেখাইতে পারিলাম না। তখন সর্ব্বস্বান্ত; সুতরাং মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও চাটুকারের দল সরিয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট শুধু সমাজে লাঞ্ছনা ও অপমান। কিন্তু ললিতার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক লাগিল। অবসর ক্রমে দুই চারিটী নাগর জুটিয়াছে; তাহার মন হইতে আমার স্থান মুছিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ক্রোধ

হইলে একেবারেই নিষ্কণ্টক। কতকগুলি সুবিধাজনক যোগাযোগও ঘটিল; কেননা ঘটনাক্রমে বিনোদ যখন গ্রামে আসিবে, তখন রাত্রি গভীর! আর তার আগমন সংবাদ গোপন রাখাও সম্পূর্ণরূপে ললিতার আয়ত্তাধীন। সঙ্কল্প যেমন উদ্ভট ও দুরূহ, কার্য্যে পরিণত করাও ততদূর বিষম ও ভয়-সঙ্কুল।

ভয়, উদ্বেগ, উৎসাহ, আশা, পরিণাম, ভবিষ্যৎ, সন্দেহ ও বিবেকে বারম্বার বিচলিত হইতে লাগিলাম। কামান্ধ আমরা, তাই ইহার অপর বা কুফলের দিক্ মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিল না। সঙ্কল্প স্থির হইলে ব্রতী হইবার জন্য আবশ্যকানুযায়ী পুরশ্চরণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কুহকিনী আশা মরীচিকার জাল বিস্তার করিয়া কর্ণে বিষরাশি ঢালিয়া দিয়া উৎসাহ দিল,—ইহাই প্রকৃত পন্থা; একেবারে নিষ্কণ্টক হইয়া সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অর্থবলে সকল লালসায় অজরামরবৎ তৃপ্তি সাধন ঘটিবে। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! ললিতাও ইহাতে সায় দিল এবং সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি অগ্রগামী হইয়া রাণীগঞ্জ ষ্টেসন হইতে বিনোদকে অভ্যর্থনা করিয়া, একখানা গোশকটে আরোহণপূর্ব্বক গভীর রাত্রে গ্রামে পৌঁছিলাম। পথে আসিতে আসিতে তখনো সন্দেহদোলায় দুলিতেছিলাম; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সঙ্কল্প ও মন স্থির হইয়াছিল। সন্দেহে স্তিমিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও দৃঢ়ভাবে মনোমধ্যে বসিয়া গেল। ভগবানের কৃপায় এখনো পর্য্যন্ত বাধা ঘটিল না, গ্রামের কেহই তার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিল না। বিস্তারিত বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, সঙ্কেত মত ললিতা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবামাত্র, তুচ্ছ উদ্দাম এবং যৌবনের প্রলোভনে ও কামজ-মোহের তাড়নায় মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরপরাধ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ত নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও আত্মীয় নাশ করিলাম। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সহিত বিনোদের মৃতদেহ উদ্যান মধ্যে গভীর গহ্বরে প্রোথিত করিয়া, রক্তাক্ত বস্ত্র কতক ধৌত—কতক বা নদীবক্ষে পুঁতিয়া ফেলিলাম।

সাময়িক উত্তেজনার প্রশমন হইবামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ, ভয়, লজ্জা ও পরিণাম আশঙ্কায় ঘেরিয়া ফেলিল। চক্ষুদ্বয় রক্তিম ও কি যেন একটা অবসন্ন ও মত্তভাব। দুই তিন দিবস দিনের বেলায় বাহির হইতে বা লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না। এইরূপ পাপ সঙ্কল্প ও কার্য্যে চির-অনভ্যস্ত—আমার অত্যন্ত অনুতাপ জাগিল। সম্মুখে লোক আসিলেই ভয় হইত, বুঝিবা জানিতে পারিয়াছে, তাই ধরিতে আসিতেছে; ক্রমে নিশ্চিন্ত হইলাম।

কোথা হইতে ধর্ম্মের ঢাক অলক্ষ্যে বাজিয়া উঠিল। বুঝিলাম এইবার বুঝি পরিত্রাণ নাই, পাপের সাজা হাতে হাতে ফলিবার উপক্রম। রাণীগঞ্জের পথে বিদেশাগত গো-শকট দেখিয়া একটা চোর আমাদের পাছু লইয়া বাটীর ভিতরে আসিয়া লুকাইয়াছিল। সে বেচারা চুরি করিবে কি, আমাদের বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে তিন লম্ফে একেবারে গ্রাম ছাড়া। কি জানি কি ভাবিয়া, সম্ভবতঃ পুরস্কারের লোভে থানায় গিয়া এই সুসম্বাদ প্রদান করে! দারোগাবাবু মামুলী প্রথায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মন্থর গতিতে—নবাবী চালে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। লাস বাহির হইল,—আট দশ খানা গ্রাম জুড়িয়া হুলস্থূল, সমালোচনা, মন্তব্য, হৈ চৈ পড়িয়া গেল। লোকে চকিতে ব্যাপারখানা আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইল। গ্রামের মধ্যে আমাদের পোড়াব মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল। তবে একটা নূতন কথা শুনা গেল যে, গ্রামের প্রায় সকল জ্ঞান বৃদ্ধই এইরূপ প্রণয়ের যে এইরূপ পরিণাম ঘটিবে তাহা নিশ্চিতরূপেই জানিয়া ও বুঝিয়াছিলেন। তবে প্রকাশ করিলে হঠাৎ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নাম জাহির হইবার আশঙ্কায় কেহই ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই। ভরসার মধ্যে আমাদের যথেষ্ট অর্থবল ও লোকবল ছিল; সুতরাং সকলকেই কদলী প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

প্রবল তদ্বিরের জোরে ললিত আসামী না হইয়া কেবল সাক্ষী শ্রেণীভুক্তা হইল; কিন্তু অন্য উপসর্গ আসিয়া আমাকেও অবশেষ জড়াইয়া ধরিল। নদীবক্ষে যে কাপড়গুলি পুঁতিয়াছিলাম, তাহারই একখানা কোনক্রমে ভাসিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পুলিশের হাতে গিয়া পৌঁছায়; তাহাবই রক্ত চিহ্ন ও ধোপার দাগে আমিও গ্রেপ্তার হইলাম। মোকদ্দমা দাঁড়াইল—ইচ্ছাকৃত নরহত্যা; আমি মূল আসামী এবং সেই চোর সহায়ক। বিপুল অর্থব্যয়ে ও তদ্বিরের জোরে দায়রার বিচারে প্রমাণাভাবে আমি খালাস পাইলাম; কিন্তু চোরটার দ্বীপান্তর হইল।

দীর্ঘ হাজত বাসের পর মুক্তি পাইয়া দুই চারি দিন মুখ দেখাইতে পারিলাম না। তখন সর্ব্বস্বান্ত; সুতরাং মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও চাটুকারের দল সরিয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট শুধু সমাজে লাঞ্ছনা ও অপমান। কিন্তু ললিতার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক লাগিল। অবসর ক্রমে দুই চারিটী নাগর জুটিয়াছে; তাহার মন হইতে আমার স্থান মুছিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ক্রোধ

অপমান ও ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। কি, - এড় বড় স্পর্দ্ধা! আমার কার্য্যের এই ব্যবহার—এইরূপ প্রতিদান? যার জন্য আমি নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইলাম, কারাযন্ত্রণা, লোকগঞ্জনা, সমাজে কলঙ্কভাগী ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম, তার কি না এই প্রতিফল? কথায় কথায় একদিন ললিতার সঙ্গে প্রবল কলহ ঘটিল। রাগের মুখে সেও আমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল;—বলিল আমিই ত' তাহার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছি! তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া কুলে কালি দিয়াছি, স্বামীর অপঘাত মৃত্যু ঘটাইয়া, অকালে বিধবা ও সমাজে কলঙ্কিনী করিয়াছি! আমার জন্যই ত' তাহার এই দুর্দ্দশা।

বিষম ক্রোধ ও প্রতিহিংসা চাপিল। রোষভরে ভাবিলাম,—"যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর!" আচ্ছা, ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কতদূরে দেখি। আমি সর্ব্বস্বান্ত ও চরম লাঞ্ছিত হইয়াছি; একটা খুন করিয়াছি, না হয় আর একটা খুন করিয়া ফাঁসি যাইব। এ অপমানের প্রতিশোধ লইবই—লইব!

কুলটা স্ত্রীলোক অসাধারণ বুদ্ধিমতী! আমার ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, গতিক ভাল নয়; সেইজন্য বোধ হয় সেও প্রস্তুত ও সতর্ক হইয়াছিল। একদিন এ বিষয়ের একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছি; এমন সময় হঠাৎ দুই তিন জন লোক নিমেষে আমার মুখ চোখ বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গেল। তারপর প্রহার—বিষম নির্দ্দয় প্রহার! একবার ভাবিলাম ঠিকই হইতেছে; যেমন কর্ম্ম—তেমনি ফল! আমারই পাপের সাজা হইতেছে! প্রহারের গুরুত্বে পড়িয়া গেলাম; যন্ত্রণা অসহ্য হইলে ইচ্ছা হইল তাহাদের পায়ে ধরিয়া বলি ক্ষমা কর, আর আমি দেশে থাকিব না বা তোমাদের সুখের পথে কণ্টক হইব না; কিন্তু মুখ বন্ধ মনের ভাষা মনেই রহিল। অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, তারপর কি ঘটিয়াছিল জানি না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন বর্দ্ধমানের হাঁসপাতালে। সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, শরীরের নানাস্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। পরম্পরায় শুনিলাম, নদীজলে আমাকে মৃতবৎ অবস্থায় দেখিয়া, কয়েকজন ইতর ব্যক্তি অনুকম্পা পরবশ হইয়া হাঁস পাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

চিকিৎসায় প্রাণ পাইলাম; কিন্তু মনে হইল যেন প্রাণ না পাইলেই ভাল ছিল। একেবারে সকল চিন্তার কারণ ও স্মৃতি হইতে মুক্তি পাইতাম। তখনও শরীর বিকলাঙ্গ—দেহের নানাস্থানে ব্যথা ও বক্রতা। কি করি, কোথায় যাই, আকুল দুর্ভাবনায় পড়িলাম! আর দেশে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। রোগ ভোগ এবং যন্ত্রণায় শরীর ও মন এত দুর্ব্বল যে, প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছাও জাগিল না। একবার ভাবিলাম আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু সম্ভবতঃ প্রাণের মায়ার জন্যই সে ইচ্ছা একবার জাগিয়া তখনই নিবিয়া গেল।

বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই আশ্রয় চাই, আহার্য্য চাই;—তাহাই বা কিরূপে

জুটে! দীঘির পাড়ে বসিয়া অনাহারে এক মনে সমস্ত দিন নানা প্রকার চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, দেশে যাইব না; গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সাধুসঙ্গে সাধন ভজন করিয়া ভিক্ষান্নে দিন যাপন করিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। সহজভাবে চলিবার শক্তি নাই, কোনরূপে বসিয়া বসিয়া—গড়াইয়া গড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। সে ভ্রমণ যে কি কষ্টকর, তাহা বলিতে পারি না! ভাবিলাম আর না,—এরূপ করিয়া অনাহারে চলিতে পারিব না। একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া গ্রামে চলিয়া যাই; কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে কাল্‌নাযাত্রী জনৈক ব্যবসায়ী দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার গরুর গাড়ীতে আশ্রয় প্রদান করিলে নিরাপদে কাল্‌নায় পৌঁছিলাম।

পাপের ভোগ ও যন্ত্রণা আরম্ভ হইল! অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশ ও অনাবৃত স্থানে জীবন-যাপনের জন্য, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, দেহের ব্যথা ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গীন বাতে পরিণত হইল, সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিল;—চলৎশক্তি বিহীন হইলাম। রুগ্ন দেখিয়া ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনা হইতে দূর করিয়া দিল পার্শ্বস্থ একটি ভগ্ন গৃহে আশ্রয় লইলাম। শরীরের দু'এক স্থানে কাটিয়া ক্ষত হইল, কিন্তু সে ক্ষত না সারিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পচিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে বুঝিলাম সাধারণ ক্ষত নহে ভীষণ কুষ্ঠব্যাধি।

যন্ত্রণা চরমে উঠিল, সে যন্ত্রণা অব্যক্ত; ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! কি ভীষণ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে দিনের পর দিন, রাত্রের পর রাত্রি কাটাইয়াছি, তাহা ভাবিতে গেলে এখনও হৃৎকম্প হয়। লোকে নিকটে আসিত না, দেখিবামাত্র দূরে সরিয়া যাইত। চলচ্ছক্তি বিহীন! প্রখর সূর্য্যতাপে অসহ্য কষ্ট হইলে, কোনরূপে এপাশ ওপাশ ফিরিতাম। বস্ত্রাভাবে শীতের কম্পনে যন্ত্রণা ভীষণতর হইত! কখনও কখনও আপনার মনে চীৎকার করিতাম,—কাঁদিতাম; কখনও বা লোক দেখিলে কাতর দৃষ্টিতে তারস্বরে তাহাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতাম। কেহ বা বিরক্ত হইয়া ঘৃণাভরে চলিয়া যাইত, কেহবা দু'একটা পয়সা, কখনও কিছু খাদ্যদ্রব্য বা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গঙ্গাজল দিয়া যাইত। কখনও কখনও লোকেরা বলাবলি করিত, এ বেটা নিশ্চয়ই মহাপাপী! নহিলে এত কষ্ট পাবে কেন? কখনও তাহাদের মন্তব্য শুনিতাম, কখনও বা শুনিতাম না।

অবস্থা-বিপাকে সেই স্থানেই মল মূত্র ত্যাগ করিতে হইত। ক্রমশঃ দুর্গন্ধে সে স্থান দিয়া লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিল; এমন কি আমার নিজেরই তিষ্ঠান অসম্ভব হইল! কিন্তু উপায় নাই, নিজের অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলকে ধিক্কার দিতাম! বুঝিতাম আমিই আমার এই দুরবস্থার কারণ। পাপের জন্য পাপীর যথোচিত সাজা হইতেছে, নাহলে জগৎ সংসার টিকিবে কেন? ভগবানের অ-পক্ষপাত বিচারে শ্রদ্ধান্বিত হইতাম; আবার কখনও ভগবানের উপর মহা ক্রোধ হইত, উদ্দেশে গালি পাড়িতাম। সত্য কি জগতে আমিই একা পাপী?—আমার ন্যায় কি আর পাপী নাই? তাই-বা কেন, আমার ন্যায়—আমাপেক্ষাও

মহা মহা পাপী সকল রহিয়াছে, কৈ তাহাদের বেলা ত' সাজার নামও দেখি না। চার্ব্বাকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, হাসিয়া-খেলিয়া, নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়াইতেছে! ক্রমে যথার্থই অসহ্য হইল! প্রার্থনা করিলাম, ভগবান্ মুক্তি দাও! হয় উপশম কর, না হয় শেষ করিয়া দাও! যদি সেই মুহূর্ত্তে বজ্র বা সর্পাঘাত হইত, তাহা হইলেও আনন্দিত হইতাম!

ইচ্ছা হইল গড়াইয়া গড়াইয়া কোনরূপে নদীতে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিই; কিন্তু প্রাণের মমতা—মহা মমতা! এত দুর্ব্বিপাকেও প্রাণের মমতা, কাল্পনিক আশা এবং আমার 'আমিত্ব' জনিত সুখ লোপ পায় নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আত্মীয়, স্বজন, নাম, যশ, সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্য-সম্পদ্ যাহা কিছুই চাহি না কেন, সবই আমার অন্তরস্থ 'আমিটীর' তৃপ্তির জন্য। আমার সেই প্রচ্ছন্ন 'আমি'টীকে যত চাই ও ভালবাসি, এত আর কাহাকেও নহে—কিছুর জন্যও নহে। বলা বাহুল্য ভবিষ্যতের জন্য মধ্যে মধ্যে ভিক্ষালব্ধ পয়সাগুলিও জমাইয়া রাখিতাম।

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যে কারণে মঙ্গলময়ের রাজ্যে এত ক্লেশ, দুঃখ ও যন্ত্রণার বিধান, তাহা আমার পক্ষে নিরর্থক হয় নাই। যন্ত্রণা আমারও পক্ষে বহু মঙ্গলপ্রদ হইয়াছিল। উদ্দেশে তাঁহার নাম লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া সময় কাটাইতাম। চক্ষুজলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার নাম ধরিয়া বারম্বার সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে প্রণিপাত করিতাম বা লুটাইয়া পড়িতাম। রোগে, শোকে, তাপে নর যখন ক্লিষ্ট, শীর্ণ, বিবর্ণ, হতাশ বা অসহায় হইয়া উঠে, সমস্ত পার্থিব অবলম্বন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া হৃদয়ে এক শুষ্ক শূন্যতা অনুভব হয়, তখন সেই অজ্ঞাত-কুলশীল, অজানা, অচেনা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাম গুণগানে বা তাঁহারই নামাশ্রয়রূপ অবলম্বনে শান্তি ও সন্তোষ পাইবার চেষ্টা করে। একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিকলচিত্ত বা বিকৃতমস্তিষ্ক না হইলে, কিছু না কিছু পাইয়াও থাকে এবং যত পায় ততই হৃদয়ের শূন্যতা; ভক্তিরসে ততই শুষ্কতা দূর হইতে থাকে। ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া করযোড়ে কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রে—অনেক সময়েই উদ্দেশে প্রার্থনা করিতাম,—"হে ভগবান্! মুক্তি দাও, শান্তি দাও, সান্ত্বনা দাও! যে কামজ তাড়নায়,—যে পাপ প্রবৃত্তির বশে,—যে মোহে অন্ধ হইয়া এই সকল দুষ্কার্য্য করিয়াছিলাম, শপথ করিতেছি আর কখন এরূপ করিব না! কখন না,—কখন না।

যদি কখন মুক্তি পাই,—সুস্থ হই ত' আর নয়! আর কখন পাপের ফাঁদে পা বাড়াইব না,—পিচ্ছিল পথে নামিব না। তোমার নাম করিয়া, তোমাকে অবলম্বন করিয়াই পবিত্রভাবে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিব। বারম্বার এইরূপ কায়-মনোবাক্যে শপথ করাতে, বুঝিলাম চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে; আর ভয় নাই। ভবিষ্যৎ প্রলোভন হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ্। আবার হতাশা জাগিত, আবার কাঁদিতাম,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

... UNIV. ... 1914 ... BUILLINGS.

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

'য় ভাগ। আষাঢ়, ১৩২১। ৩য় সংখ্যা।

মোক্ষ]

বিপ্রলব্ধা।

[গীত গোবিন্দ।]

১।— ক্ষণপর চেতন পাওল নাহ।
চমকিত নয়ানে সখী মুখ চাহ॥
লোচন ইঙ্গিতে মাধব সাথ।
কহতহি সজনী বাইক বাত॥

২।— "নিন্দই চন্দন ইন্দু-কিরণ অনুবিন্দই খেদ-অধীরা,
ভুজঙ্গ-আকর চন্দন-তরুচর বিথ জনু মলয়-সমীরা,—
বোধই সো তুঝ বিরহ বিকারে।
মদন-বিশিখ ডরি,' তুহার ধ্যান ধরি,' মাধব! প্রেম গভীরা,
নিমজই বসমন্বী প্রেম-পাথারে॥

৩।—"তুহার বাস-ভুমি তা'কর মরমে মদন বরখে শরজাল।
তুয়া দুঃখ শঙ্কয়ি' উর' পর থাপই জল-ভর কমল-মৃণাল॥

৪।—"অলপ বিলাসময় কুসুম-শয়ন তছু অব যনি স্মর সর-সজ্জা।
তুহার পরশ লাগি' বরত ধরল ধনী তঁহি পর বিগ'লত-লজ্জা॥

৫।—বদন-কমলে তছু লোচন লোতক গলত'হি অবিরল ধারে।
চাঁদকি অণু অণু ঝরত সুধা জনু বাহু'ক দশন-প্রহারে॥

৬।—"কুরঙ্গ-মদ রসে লিখতহি কামিনী তুয়া তনু মদন সমান।
দেওত কর'পর অভিনব চূত-শর, পদ-মূলে মকর-নিধান॥
৭।—"লুটয়ি চিত্র-পদ কহতহি প্রতিপদ :— 'হাম তুয়া চরণ-ভিখারী।
তুঁহু যব বিমুখসি, কাহে দহব নহি সুধানিধি শরীর হমারি॥
৮।—"জগতি দুলহ অতি মাধব মূরতি মনমে করত ধিয়ান।
খেণে খেণে রোঅই, প্রলপই, বিলপই"— ভুজঙ্গধর পরমাণ॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী॥

নাহ—নাথ ;
চাহ—চাহে,
কহতহি—কহিতে ;
রাইক—রাধার
বাত—বার্ত্তা ;
নিন্দই—নিন্দিছে,
অনুবিন্দই—ভৎর্সিতেছে
চন্দন-তরুচর—চন্দন তরুচারী
বিখ জনু—বিষবৎ ;
সমীরা—সমীরকে,
বোধই—বোধ করিতেছে,

সো—সেই (রাধা) ;
তুয়—তোমার ;
নিমজই—নির্ম্মাণিত হইতেছে
তাকর- তাহার ;
বরখে—বর্ষে ;
শঙ্কয়ি—শঙ্কা করিয়া ;
থাপই— স্থাপিতেছে,
জল-ভর—জলভরা ;
ইছু—তাহার,
অবযনি—এখন যেন,
শজ্জা—শয্যা ;

বরত—ব্রত ;
তঁহিপর—তাহাতে ;
জনু—যেন ;
চিত্র-পদ—চিত্রপাদ ;
লুটয়ি—লুটিয়া ;
প্রতিপদ—পদে পদে ;
বিমুখসি—বিমুখী হইলে,
দুলহ—দুর্লভ ;
রোঅই—কাঁদিছে.
পরমাণ—প্রমাণ।

মোক্ষ]

সাধনার পথে।

(পঞ্চমানুবৃত্তি)

আজ আমার নিজের কথা তোমাকে কিছু বলিতে চাই। অবশ্য আমার প্রকৃত 'আমি'র কথা বলিতেছি না ; উ—ব নামে পরিচিত ব্যক্তির ভিতর সেই 'আমি'র যেরূপ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহারই কথা বলিব। পরমাত্মা হইতে বিবিক্ত করিয়া, মর্ত্ত্যভাবে দেখিলে, সে তোমার ভক্তির অযোগ্য পাত্র, এবং তোমারই মত একজন দুর্ব্বল জীব মাত্র। ভাগবতেই ত' আছে—

যস্য সাক্ষাৎ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য কুঞ্জরশৌচবৎ॥ (ভাগবত ৭।১৫।২৬)

তোমাকে সে পুনঃপুনঃ তাহার ব্যক্তিগত ও মর্ত্ত্যভাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছে ; কারণ তাহা হইলে তুমি তাহার কতকগুলি দৌর্ব্বল্য অজ্ঞাতসারে নিজের হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া স্বকীয় বিকাশের পথে বাধা জন্মাইবে। সত্য বটে, সে তাহার সমজাতীয় জনসাধারণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুত-

পূর্ব্ব লোকসমূহ হইতে কিছু আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সে সব শুধু যাঁহারা তাহার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু এবং তাহার বর্ত্তমান জীবনের আকাঙ্ক্ষিত পরিসমাপ্তি, সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণের অপার করুণাবশতঃ। এই করুণা যে তাহার উপর বর্ষিত হইয়াছে, তাহার এইমাত্র কারণ যে তাহার হৃদয় প্রেম-প্রবণও কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগোন্মুখ। ইহাই তাহার তথা কথিত ধার্ম্মিকতা; এবং এতদতিরিক্ত সম্মান সে কাহারও নিকট প্রত্যাশা করে না। প্রত্যুত তাহার সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা হইলে তাহাতে ক্ষতি আছে। মনে রাখিও ভাই, আমি তোমার সহিত খেলা করিতেছি না, অথবা অন্তঃসারহীন বাঙ্মাত্রে পর্য্যবসিত বিনয়ধ্বজিতার ভাব হইতে বলিতেছি না; যাহা সরল সত্য কথা, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। তাহা হইলেই তুমি সুপথে চালিত হইবে ও কোন প্রকার আপৎসঙ্কুল ভ্রমে পতিত হইবে না।

***

ধ্যানের বস্তু একটীমাত্র থাকা বিধেয়। এতৎ সম্বন্ধে 'ল' যাহা বলিতেছে তাহা সত্য; কিন্তু তোমার পক্ষে ইহাতে বিশেষ কিছুই আসে যায় না। প্রয়োজন শুধু "ধারণার"—যাহা চিত্ত-বিক্ষেপের ঠিক বিপরীত ভাব—যাহাতে প্রত্যয়ের এক-তানতা আনে,—যাহাতে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ "সর্ব্ব"ভাব ত্যাগ করিয়া একত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়,—তাহারই। বস্তুর বহুত্ব (ধ্যেয়ের বহুত্ব) অবশ্যই ঐ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী; কিন্তু তুমি যে প্রণালী মতে চলিতেছ, তা'তে বাস্তবিক ধ্যেয়ের বহুত্ব নাই; একই বস্তুর ভাবময় বহু বিভাবমাত্র। তাহাতে সদৃশ-প্রবাহই জন্মায়।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে তুমি নিজের অবস্থা প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছ। ধ্রুব জানিও প্রকৃত ভক্তের জন্য যাহাই বিহিত হউক না কেন, তাহা তা'র মঙ্গলের জন্য; উহা তাহার স্বকীয় প্রকৃত উন্নতি সাধনেরই অবসর প্রদান করে। আমরা যে বস্তুতে ইষ্টেতরত্ব বা অমঙ্গল ভাব দেখি ও আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিবশে উহাদিগকে প্রতিবন্ধক ও অভিলষিতের বাধক বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের দৃষ্টির অল্পাবগাহিত্ব এবং বিশ্বাসহীনতা বা অশ্রদ্ধা হইতেই প্রসূত। কারণ যাহা কিছু আসে, সবই কি সেই সর্ব্বমঙ্গলালয়ের নিকট হইতে নহে? প্রত্যেক প্রত্যয়ের ভিতর দিয়া কি সেই "সমরস" তত্ত্বের অবভাস হয় না?

***

বৎস! আবেগের বশে বিমুগ্ধ ও বিচলিত হইও না এবং আমার বাক্যে যে অর্থ নাই তাহা আরোপিত করিও না। 'আমি কখনও আমাকে প্রত্যাখ্যান বা

পরিত্যাগ করিতে তোমাকে পরামর্শ দিই নাই। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাধনার পথে অকৃতজ্ঞতার অপেক্ষা মারাত্মক পাপ আর কিছুই নাই, এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যাহাতে অহঙ্কারের তামসিকতা ও পরার্থপরতার অভাব ও ভাবের অপ্রবাহ (Stagnation) অতি সূক্ষ্মরূপেও আনয়ন করে, এরূপ কোনও ভাবকে আমি কখনও অনুমোদন করিব না। কিন্তু পক্ষান্তরে তোমারও সত্যের দিকে নয়ন মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য নহে। শত হইলেও আমার ন্যায় একটী দুর্ব্বল জীব যে বহু বিক্ষেপ ও বহু আবর্ত্তের ভিতর দিয়া অতি কষ্টে উপনিষদোক্ত "উৎ" বা পরা ভাবের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করিতেছে এবং সে পথে যাইতে মুহুর্মুহুঃ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, (হোঁচট্ খাইতেছে) তাহার সহিত অন্ধের ন্যায় বিচার বিবেক বর্জ্জিত হইয়া সংশ্লিষ্ট হওয়া অনুচিত। সর্ব্বতোভাবে তাহার সত্য ও মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু দিবার আছে তাহা লইও; এবং তজ্জন্য তাহাকে ভালবাস ও তাহার উপর কৃতজ্ঞ হও। *কিন্তু তুমি যদি সর্ব্বতোভাবে তাহাতে আত্মসমর্পণ কর, তবে তাহার দোষরাশি* কিছু কিছু হয়ত তোমাতে সংক্রামিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা তোমার আত্মবিকাশের পথে বিলম্ব ও বাধা আনয়ন করিবে। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও অনুভূতি করিতে চেষ্টা করিও যে, যিনি তোমাকে এই 'আমির' পোষাক পরিয়া এত আকর্ষণ করেন, তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণই,—ক্ষণভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব নহে।

প্রাণাধিক! বিশিষ্টতার সহিত সংগ্রামে তুমি যে কতকটা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছ, তাহা আমরা দেখি না,—পরন্তু তুমি কীদৃশ অকৈতব ও আগ্রহান্বিত হইয়া উদ্যুক্ত হও এবং যুদ্ধকালে তোমাকে কি ভাবে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই আমরা দেখি। কারণ সাধন-সমর অনেকভাবে সংসাধিত হইতে পারে; যিনি 'নিমিত্ত মাত্র' রূপে দাসের ন্যায় যুদ্ধ করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। নিয়ম বা ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ন্যায় ও মঙ্গলময় শ্রীভগবানের বিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত ও তাহারই ব্যঞ্জক। অতএব যদি কেহ অকৃতকার্য্য হয় অথবা এতাবৎ অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত কোনও দোষ নিজের ভিতর খুজিয়া পায়, তাহাতে তাহার বিকলচিত্ত ও নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমাদের দোষগুলি যে কি, তাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে জানা শ্রেয়ঃ; কারণ দোষ মাত্রেই ভগবানের সর্ব্বাত্মক 'পর'ভাবের সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞানের ফল। উহা দেখাইয়া দেয় যে কেন আমরা সেই ভগবৎ সত্ত্বা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। শুধু ঐরূপেই উহাদিগকে আমরা অতিক্রম করিতে সক্ষম হই। এই জন্যই প্রবর্ত্ত-সাধক যদি বাস্তবিকই তীব্র সংবেগ যুক্ত হয়, তবে

তাহার জীবনে,—প্রথমেই জল স্থির হইলে কর্দ্দম যেরূপ পাত্রের নিম্নদেশে পড়িয়া গিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চৈতন্য-সলিলে তাহার অজ্ঞাতসারে যে সব ভেদবুদ্ধির কলুষ-কলঙ্ক বিমিশ্রিত থাকে, তাহা "থিতাইয়া পড়ে।" নিশ্চয় জানিও, যোগীর জীবনে বিভিন্ন কালে যাহা ঘটে, তাহা কখনও 'অন্বয়-মুখে' কখনও, 'ব্যতিরেক মুখে' তাহার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় অপমত্ত হইয়া বাহ্য অবস্থার মধ্যে একেরই ইঙ্গিত দেখিতে শিখিবে।

* * *

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে আমিও কি সেভাবে শিক্ষিত হইয়াছি। আমার মনে হয় আমি তোমায় বলিয়াছি যে, আমার বর্ত্তমান জন্মে সাধারণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াবহুল প্রণালীতে আমি প্রায় কোনও শিক্ষাই প্রাপ্ত হই নাই। আমার যাহা কিছু শিক্ষা, তাহা উচ্চতর ক্ষেত্রে মহত্তর বুদ্ধির সাহায্যে হইয়াছে। উহা হয় সুষুপ্তি নতুবা ধ্যানের সময়, অধিকাংশ তত্ত্বই চিত্রের দ্বারা ধী-ক্ষেত্রে প্রচোদিত হইয়াছে। আমি যাহা জানি, তাহা বাক্য দ্বারা অন্যে সংক্রামিত করিতে যে কষ্ট অনুভব করি, উহা তাহার একটী কারণ। আমি যতদূর জানি, প্রকৃত দীক্ষার পর লোকে ঐ প্রকার বুদ্ধিগত শিক্ষাই প্রাপ্ত হয়। যতদিন সে সময় না আসে, ততদিন অবশ্যই ধীরভাবে তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে। তখন সাধকের 'সর্ব্ব' মানবের নিঃস্বার্থ সেবা ও ইষ্টদেবে প্রাণের অকপট শ্রদ্ধা করিয়া কালের প্রতীক্ষা করা উচিত। ইহাই ত' বৈষ্ণব শাস্ত্রে 'জীবে দয়া' ও 'নামে রুচি' নামে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

* * *

তোমার যাহা কল্যাণকর, তাহা তুমি পাইতেছ; এবং তুমি যদি এই ভাবে অবিচলিত হইয়া থাকিতে পার, তবে আর যাহা পাইবার তাহাও পাইবে। বীজ-গণিতের মূল সূত্র গুলিতে যতক্ষণ সম্পূর্ণ অধিকার না জন্মিবে, তখন সমীকরণ-ধারা (Theory of Equations) লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? প্রগল্‌ভতা যেরূপ মন্দ, অযথা কৌতূহলও তাদৃশ; উহারা প্রবর্ত্তের অনধিকারিত্ব প্রমাণিত করে। কৌতূহলের আর একটু দোষ আছে, উহা নিত্য নূতন চায়; সুতরাং উহাতে সেই চির পুরাতন পুরুষের বুদ্ধি ফুটে না। স্থির ও অটলভাবে সেবা করিয়া যাও, তাহা হইলে সবই শ্রেয়োঽভিমুখী হইবে। সেবাতেই (দাস্যে) যেন তোমার আনন্দ হয়, অধিকারে (প্রভুত্বে) নহে; দানেই যেন তোমায় পরিতৃপ্তি হয়, গ্রহণে নহে। তাহা হইলেই তুমি এখন যাহা ধারণা

করিতে পার না, এমন অনেক জিনিস পাইবে। তুমি অবশ্যই জানিতে পারিয়াছ যে ব্যক্তিগত 'বিশিষ্ট' অধিকার ও উন্নতি সাধন অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে একটী কৈতবশূন্য সেবাভাবেই পরিতৃপ্ত; সাধক-মণ্ডলী সঙ্গত ও শিক্ষিত করিবার জন্যই আধুনিক তত্ত্ব-সভার ভিতরে Eastern School নামক সাধন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব যাহারা বিশিষ্ট 'আমির' জন্য লালায়িত, তাহাদিগকে আকৃষ্ট কারবার ইহাতে কিছুই নাই।

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, সাধনার পথ পুষ্প-সমাকীর্ণ ত' নহেই ; বরং যে যাত্রীর হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে নিজের অজ্ঞাতসারে স্বার্থসাধনের কোনও অস্ফুট প্রেরণা, কাম-সঙ্কল্পের বিন্দু-মাত্রও গুপ্তবাসনা বা কৈতব থাকে, যিনি প্রাণে প্রাণে 'আমি কিছুই নহি' এই অকিঞ্চন বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাকে বিপত্তি রাশিতে নিশ্চয়ই আকুল হইতে হইবে। অতএব Eastern School এর প্রত্যেক সাধকেরই স্বকীয় কামনা সমূহ অতি সূক্ষ্ম ও কঠোরভাবে পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত ; এবং তাহার অন্তরের নিভৃত স্থানে 'এষণা' সমূহের মধ্যে স্বার্থের কোনও অভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকিলে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে মার্জ্জিত করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় সংগ্রামে উদ্যুক্ত হইতে হইবে। কারণ সেই সাধন-সমরে তাহার জীবন ও ভেদভাবানুবিদ্ধ পরিচ্ছিন্ন সত্বার যাহা কিছু প্রেয়, তাহার সমস্তই আহুতি দিতে হইবে।

* * *

বর্ত্তমান সমস্যায় আমি এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, তুমি সানন্দ চিত্তে সম্পূর্ণভাবে কেবল কর্ত্তব্য করিয়া যাও ; তাহা হইলে অবশ্যই অনির্দ্দেশ্য ও অদ্ভুত-ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। অতএব উদ্বিগ্ন হইয়া নিজেকে যন্ত্রণা দিও না। প্রত্যহ প্রভাতে ধ্যানের পর যখন মন কতকটা শান্ত থাকিবে, তখন দেখিবে তোমার সে দিনের কি কর্ত্তব্য আছে ও তাহা কিরূপ করা আবশ্যক ; এবং তাহা সুসম্পন্ন করিবে। বাকী যাহা কিছু আছে, তাহা আপনা আপনি হইয়া যাইবে, ইহা শুনিতে অবশ্যই বড় আশ্চর্য্যজনক এবং অনেকটা 'উপকথার মত' বলিয়া বোধ হইতে পারে ; কিন্তু যাহারা সেই ভগবানের মহাবিধির কার্য্য প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে জীবনের অতি সামান্য ঘটনাগুলির ন্যায় ইহাতেও অবিশ্বাস্য বা অশ্রদ্ধেয় কিছুই নাই। Heaven helps those who help themselves "যে নিজে উদ্যুক্ত হয়, ভগবান তাহার সহায় হন" বা 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ'—এ বাক্যে যতটুকু অর্থের ধারণা হয়,

তদপেক্ষা ইহাতে অনেক গভীরতর নিগূঢ় অর্থ আছে ; এবং সর্ব্বলোকেই সর্ব্বদা উহা মূলতঃ এবং অক্ষরে অক্ষরে সর্ব্বাংশিক ভাবেও সত্য।

***

প্রিয় বৎস! মনে করিওনা যে আমি তোমাকে একক ও অসহায় অবস্থায় সংগ্রামের ভিতর ছাড়িয়া দিই, এবং তোমার আভ্যন্তরিক ক্লেশরাশির অংশ গ্রহণ করি না। আমারাও ভগবানের দাস ; এবং উপর হইতে অনুমতি পাইলেই আমি আসিয়া থাকি ও তোমার মঙ্গলের জন্য যাহা সর্ব্বোত্তম, তাহা অজ্ঞাতসারে সাধন করি। স্নেহবশে যদি নিম্ন প্রবৃত্তিকে অনুরঞ্জিত হইতে দিয়া আধ্যাত্মিক সাহায্য করিবার নিয়ম পালন না করি, তাহা হইলে আমার সার্ব্বভৌম বিধি লঙ্ঘন করা হইবে,—সেই পর ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাকে অতিক্রম করা হইবে ; এবং তাহার ফলে বর্ত্তমানে যতটুকু সাহায্য করিতে সমর্থ আছি, ততটা সাহায্য করিবার সামর্থ্যও অপহৃত হইবে। ভগবানের বিধির বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে *নিজেরই সামর্থ্যের হানি হয়।*

তোমার নিজের যন্ত্রণা যতই তীব্র হউক না কেন, তাহাতে যেন তোমার চতুঃপার্শ্বস্থ অসহায় জীব সমূহের কল্যাণের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তদভিমুখে তোমাকে দৃষ্টিহীন না করে। তাহাদের জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে, ঐ অন্ধ উন্মত্ত অহং-কেন্দ্রসমূহ এক প্রকার কিছুই জানেনা, এবং প্রত্যেক বাহ্য বাত্যাভিঘাতে ইতস্ততঃ ভ্রামিত হইয়া বেড়ায়।

তোমার চারিদিকে সেই মূঢ় অংশ (ব্যষ্টি) নিচয়ের যে কি বেদনা—কি যাতনা, সে বিষয়ে অবিরত ভাবিও। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তোমার নিজের যাতনা ও বেদনা তাহার তুলনায় কত লঘু হইয়া দাড়ায়। অপরের দুঃখে সমবেদনা সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি প্রসব করিয়া, স্বকীয় দুঃখ কষ্টের লাঘব সম্পাদন করে ; এবং বিশ্ব প্রেমে বিশিষ্ট 'আমির' ভার এতই কমাইয়া দেয় যে, ব্যক্তিগত ক্লেশ সহজেই সহনীয় ও অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাড়ায়। কর্ত্তব্য সম্পাদনে গীতার এই শ্লোকটী মনে রাখিও,—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাৎ বিদ্বান্ তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥

"আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ফলের আশায় যে প্রকার কর্ম্ম করে, জ্ঞানীগণ বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষার্থ বা লোক সকলকে এক করিবার বা লোকসংগ্রহের জন্য সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।" ঐ ভাবটি Light on

the Pathএ অতি অল্প কথায় বলা হইয়াছে যে, "অহংতত্ত্ব স্থাপনে প্রবৃত্ত (ambitious) যেরূপ আগ্রহের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন আসক্তি শূন্য হইয়া তাদৃশ ভাবে কর্ম্ম করিবে।" তোমার জীবনে এই ভাবটী কার্য্যে পরিণত বা উদাহৃত করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে আর সবই সুন্দর ভাবে চলিবে।

তোমায় যে কিরূপ পরীক্ষার ভিতর দিয়া চ'লিতে হইতেছে, কিরূপ শক্তি সমূহের সহিত তোমার দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছে এবং উহা যে তোমার ভিতর কিরূপ গুণ-রাশির বিকাশ করিবে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ? তুমি এগুলি বেশ ভাল রূপেই বুঝিয়াছ; এবং সময় সহকারে যখন তুমি বহুদর্শনে আরও অভিজ্ঞতা-লাভ করিবে, তখন এতৎ সম্বন্ধে আরও স্পষ্টতর ধারণা তোমার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে। তখন তোমার বুদ্ধি এতই নির্ম্মল হইবে, যে আমার শত বার লেখাতেও সেরূপ করিতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোক্ষ]

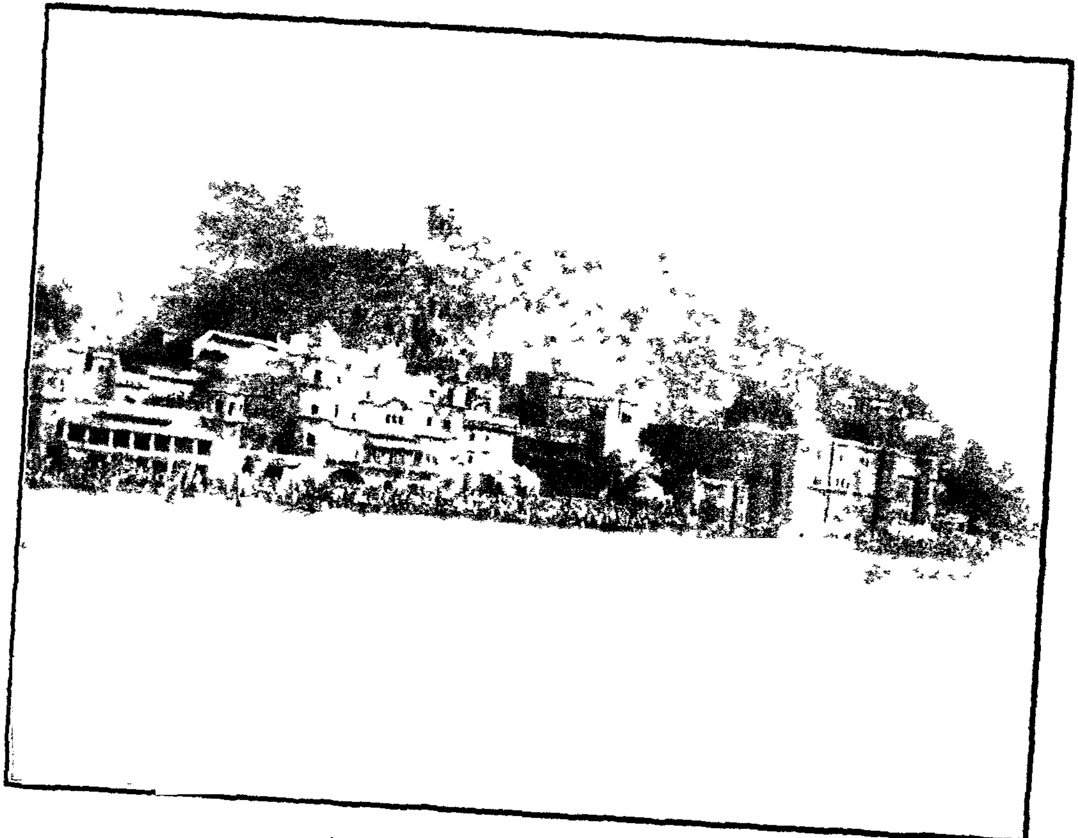
উদ্বোধন।

(১)

রাত্রি-রূপা জননীর অঞ্চল বাতাস।
জগতের মোহ-নিদ্রা করিছে বিনাশ॥
অদূর অরুণ আভা গগন-অঙ্গণে,
ঢালি ক্ষীণ হৈমপ্রভা, ঊষাদেবী সনে;
বাড়াতেছে জ্যোতির্ম্ময় কণক অঙ্গুলি,—
জাগাইতে ধরণীরে, দেখ আঁখি খুলি॥
হে ব্রাহ্মণ! জেগে উঠ নেত্র প্রসারিয়া।
দেখ চারিদিকে সর্ব্ব বিশ্ব উছলিয়া॥
সমাগত পূত ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সময়;
তন্দ্রামগ্ন থাকা এবে উচিত কি হয়?

(২)

ত্যজি নিদ্রালস্য, তমঃ ভোগ-শয্যা সঙ্গ;
ভূত-ভাবোদ্ভব-কর বিসর্গ-আসঙ্গ,—
মানস গঙ্গায় জলে করিয়া গাহন।
হৃদয়-মন্দিরে রচি অচল আসন॥



হরিদ্বার দৃশ্য · [illegible]

শূদ্রত্বের সেবাধর্ম্ম কুশগুচ্ছোপরি।
বৈশ্যত্ব অজিনখানি যতনে বিস্তারি॥
ক্ষত্রিয়ত্ব চেলাবাসে সকল আবরি।
অত্যুচ্চ, আধারে সর্ব্ব গর্ব্ব দৈন্য ছাড়ি॥'
জগৎ ব্রাহ্মণ গবি সবাকার হিতে।
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ পদে আত্মাহুতি দিতে॥
উচ্চারি সমস্ত বেদ-মন্ত্র সামগান।
জগতের আত্মাসূর্য্যে করি উপস্থান॥
ব্রহ্মণ্যের পূত বহ্নি করিয়া স্থাপন।
মহা বৈশ্বানর যজ্ঞ কর আরম্ভন॥
হে আর্য্য! তোমারে ছাড়া, ভূদেব ব্রাহ্মণ!
শুদ্ধ নাচিকেত বহ্নি কে করে চয়ন?
সে বহ্নি চয়ন বিনা বিশ্বে কেবা আর।
মৃত্যুপাশ ছিন্ন করি করিবে নিস্তার?
ভোগ-ভূমি ধরণীর হৃদয়-ভারতে।
হয়েছে তোমার দীক্ষা বিশ্ব-হিত ব্রতে॥
'সর্ব্ব' ভাব পরিত্যাগী দয়ালু ব্রাহ্মণ।
তুমি যে বিশ্বের মর্ম্ম, বিশ্বের জীবন!
(হ'য়ে) মোহ নিদ্রা অভিভূত আলস্য-মগন।
তোমার কি সাজে ভোগ-শয্যায় শয়ন?

(৩)

প্রীতির কুসুম-দামে সাজায়ে অঞ্জলি।
জাতবেদা সবিতার পদে দাও ঢালি॥
ব্যাহৃতির সনে মন্ত্রে প্রণব ঝঙ্কার,
বহির্ব্বিশ্বে সপ্ত স্তর করিয়া বিদার;
লোকাতীত নিরঞ্জন নিত্য-সত্যধামে,—
উঠুক, জাগিয়ে সবে প্রতি গ্রামে গ্রামে॥
ছিন্ন করি জগতের মোহের বন্ধন।
পুণ্য হ'ক সকলের নব জাগরণ॥

ধন্য হ'ক বিশ্ববাসী ব্রহ্মণ্যের ছায়ে।
আপন ক্ষুদ্রত্ব ঢালি মহত্বের পায়ে॥
উদ্ঘাটিয়া হিরণ্ময় পাত্র আবরণ।
দেখাও জগতে শুদ্ধ-সত্যের চরণ॥
অরুণ কিরণ-জালে বিশ্ববাসীগণ!
শাস্ত্র-পূত জ্ঞাননেত্র করি উন্মীলন;—
দেখুক আনন্দ-রসে হইয়া মগন,—
বাহিরে, ভিতরে, 'সর্ব্বে', এক নারায়ণ॥

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক-চৌধুরী।

মোক্ষ]

আত্ম তত্ত্ব।

(গত বৎসর চৈত্র সংখ্যার পর।)

হে শিষ্য! এইরূপে সূর্য্য ভগবানের নিকট সমস্ত বেদের যথার্থ অর্থ অবগত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে বিরক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে বিরক্ত হইতে দেখিয়া সূর্য্য ভগবান্ বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! বিদ্যা অধ্যয়নান্তর শিষ্য অবশ্য গুরু-দক্ষিণা দিবে, ইহাই শাস্ত্রের আজ্ঞা; সুতরাং তুমি আমাকে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা দাও। আমি তোমার নিকট এই প্রকার গুরু-দক্ষিণা চাহিতেছি, যে তুমি এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিও না। আমি তোমাকে যে বেদ-বিদ্যা দিয়াছি, সেই বেদবিদ্যার অধিকারী ব্রাহ্মণ-দিগকে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তুমি তাহা উপদেশ কর। আমার এই বিদ্যার এই প্রকারে সম্প্রদায় প্রবর্ত্ত করিয়া, পশ্চাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এই আমার আজ্ঞা। তুমি অঙ্গীকার কর; ইহাই আমার গুরু-দক্ষিণা। হে যাজ্ঞবল্ক্য! সেই চারি বেদে উপনিষদ্ ভাগ রূপ যে ব্রহ্মবিদ্যা আমি তোমাকে উপদেশ দিয়াছি, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তুমি সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্বে অথবা পরে বিষয়-বাসনা-রহিত অধিকারী পুরুষকেই উপদেশ করিবে।"

হে শিষ্য, যখন সূর্য্য ভগবান্ এইরূপ আজ্ঞা করিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সূর্য্য ভগবানের আজ্ঞা স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

কবতঃ ভূমি-লোকে প্রতিগমন করিলেন। মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া মুনি আপনার যজ্ঞবল্ক্য নামক পিতার নিকট গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জনক রাজার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া দুইটী বিবাহ করিলেন। তন্মধ্যে একটী কাত্যায়ন নামক ঋষির কন্যা 'কাত্যায়নী', আব দ্বিতীয়া মিত্রয়ু নামক ঋষির কন্যা মৈত্রেয়ী'। এইরূপে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া যাজ্ঞবাল্ক্য মুনি পূর্ব্বে যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিয়া ঋষি-ঋণ পবিশোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমে দেবঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। তথায় বহু দক্ষিণা-সাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেব-ঋণ এবং নিজের সমান গুণবান এবং শ্রদ্ধাবান্ পুত্র-কন্যা উৎপন্ন কবিয়া পিতৃঋণ নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। হে শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বিরক্ত স্নুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যদিও ঋণ-প্রাপ্তি সম্ভব নহে; তথাপি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সম্বন্ধ এবং গৃহস্থাশ্রমের সম্বন্ধ বশতঃ ঋণ প্রাপ্তি সম্ভব। শ্রুতি যথা,—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋণৈর্ঋণবান জায়তে" অর্থাৎ উপনয়ন, সংস্কার যুক্ত ব্রাহ্মণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ এই তিন ঋণ-যুক্ত হইয়া থাকেন।

হে ভগবন্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রম এই দুই আশ্রমই এই অধিকারী পুরুষকে যদি তিন ঋণ প্রাপ্ত কবায়, তবে এই অধিকারী পুরুষ সেই দুই আশ্রমকে কি নিমিত্ত গ্রহণ করেন?

হে শিষ্য, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রম এই দুই আশ্রম গ্রহণ বিনা প্রথমে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নহে। কাবণ স্মৃতিতে কথিত আছে, "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ ক্ষণমেকমপি দ্বিজঃ"। দ্বিজ কোন আশ্রম বিনা ক্ষণমাত্রও থাকবে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি চাবি আশ্রমের মধ্যে কোন এক আশ্রম গ্রহণ করিয়াই লোকে অবস্থিতি করিবে। আর শাস্ত্রে ত' বানপস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবাব সময়ের নিয়ম কথিত হইয়াছে। স্নুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থ এই দুই আশ্রম গ্রহণ বিনা প্রথমেই বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ সম্ভব নহে। এক্ষণে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবার সময় নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে। মনু স্মৃতি আদি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যে গৃহস্থাশ্রমী পুরুষ যে সময়ে আপনার শরীরে চর্ম্মের শিথিলতা দেখিবে, যখন আপনার কেশ শুক্লবর্ণ এবং নিজ পৌত্রমুখ দেখিবে, সেই সময়ে সেই গৃহস্থ পুরুষ পূর্ব্ব গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে বাসরূপ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবে। স্নুতরাং

ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ না করিয়া, এই অধিকারী পুরুষ যদি বাল্য এবং যৌবনাবস্থায় বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বানপ্রস্থ আশ্রমের সময় নির্দ্দেশকারী শাস্ত্রের বিরোধ হইবে। আর যদি এই অধিকারী পুরুষ বানপ্রস্থ আশ্রমের কাল পর্য্যন্ত কোন আশ্রম করিয়া থাকেন ত' "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ ক্ষণমেকমপিদ্বিজঃ" এই বচনের বিরোধ উপস্থিত হইবে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য এবং গৃহস্থাশ্রমের প্রথমেই বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ শ্রুতি-স্মৃতিরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। হে শিষ্য! তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, শ্রুতি যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম বিনা সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান করিয়াছেন ;—যথা, "যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ"; সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর বানপ্রস্থাশ্রমের কোনও বিধান কথন করেন নাই।

হে ভগবন্, এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, তারপর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, আপনি যে এই প্রকার নিয়ম কহিলেন, তাহা সম্ভব নহে; কারণ "ব্রহ্মচর্য্য পরিচয়েদাশরীর বিমোক্ষণাৎ।" অর্থাৎ স্থূল শরীরের নাশ পর্য্যন্ত এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিবেন। বশিষ্ঠ ভগবানের বচন হইতেই এই নিয়মের বিরোধ আসিতেছে। হে শিষ্য! মরণ পর্য্যন্ত এই অধিকারী পুরুষ এক আশ্রম সেবন করিবে; বশিষ্ঠ ভগবানের বচনের এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে; সেই বচন পূর্ব্বোক্ত ক্রমের নিবারণ করিতেছে না; তদ্বিপরীতে উক্ত ক্রমকে সেই বচন দৃঢ় করিতেছে। হে শিষ্য! বশিষ্ঠ ভগবানের বচনের এই অভিপ্রায় যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রমে যদি এই অধিকারী পুরুষের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে, তাহা হইলে এই অধিকারী পুরুষ সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প না করিয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই আশ্রমেই অবস্থিতি করিবে। এই প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া যে পুরুষ এক আশ্রমেই অবস্থিতি করিবে, সেই পুরুষ উত্তরোত্তর আশ্রম গ্রহণ না করিলেও পাপরূপ দোষ প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং এই ক্রম সিদ্ধ হইতেছে যে, এই অধিকারী পুরুষ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিবে, তারপর গৃহস্থাশ্রম, পরে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবে। এই প্রকার ক্রমই অনেক শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; যথা,—"ব্রহ্মচর্য্যাৎ গৃহী ভবেৎ, গৃহাৎ বনী ভবেৎ।" দক্ষ প্রজাপতির স্মৃতি শ্লোক "ত্রয়ানামনুলোম্যং স্যাৎ, প্রতিলোম্যং ন বিদ্যতে, প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ।" অর্থাৎ প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, তদনন্তর গৃহস্থাশ্রম, পরে বানপ্রস্থ আশ্রম, এই

প্রকারের নাম অনুলোম। আর প্রথম গৃহস্থাশ্রম, তদনন্তর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অথবা প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, তদনন্তর বানপ্রস্থ, তদনন্তর গৃহস্থাশ্রম, এই প্রকার বিপরীত ক্রমের নাম প্রতিলোম। তন্মধ্যে যে অধিকারী পুরুষ অনুলোম অনুসারে ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রম গ্রহণ করিবে, সেই পুরুষের মহান্ পুণ্যলাভ হইবে ; আর যে পুরুষ প্রতিলোম অনুসারে সেই তিন আশ্রম গ্রহণ করিবে, সেই পুরুষের মহান্ পাপ ঘটিবে। সুতরাং অনুলোম অনুসারে এই অধিকারী পুরুষের সেই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত।

আপনি যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রম বিষয়ের ক্রম বলিলেন, সেইরূপ চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম বিষয়ের ক্রম বিবৃত করুন। হে শিষ্য, শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রম বিষয়ের যে প্রকার ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন, সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে সেই প্রকারের কোন ক্রম বর্ণনা করেন নাই ; সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ সম্বন্ধে কোন ক্রম নাই। কিন্তু যে সময়ে যে অধিকারী পুরুষের তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে সেই অধিকারী পুরুষ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। শ্রুতি যথা,—"যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ" যদি চেতরেথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।" অর্থাৎ এই অধিকারী পুরুষের যে দিন তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই দিন সেই অধিকারী পুরুষ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। সেখানে পূর্ব্ব পুণ্য কর্ম্ম বশে যদি কখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। আর গৃহস্থাশ্রমে তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি হয়ত' এই অধিকারী পুরুষ গৃহস্থাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। যদি কখনও বানপ্রস্থাশ্রমে তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। স্মৃতি প্রমাণ যথা,—"যদেব চাস্য বৈরাগ্য জায়তে সর্ব্ব বস্তু। তদেব সংন্যসেদ্বিদ্বান্ অন্যথা পতিতো ভবেৎ।" অর্থাৎ যে সময়ে সর্ব্ব পদার্থে তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে সেই সময়েই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে কোনও ক্রম নাই, পরন্তু সেই বৈরাগ্য বিনা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হইবে। হে শিষ্য, অনেক শ্রুতি স্মৃতিতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার জন্য এই প্রকার তীব্র বৈরাগ্যকে মুখ্য কারণ বলা হইয়াছে।

হে ভগবন্, শ্রুতি স্মৃতি যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন, সেইরূপ কোন কোন শ্রুতি ও স্মৃতি সন্ন্যাসাশ্রমেরও ক্রম কথন করিয়াছেন। যথা —"ব্রহ্মচর্য্যাৎ গৃহী ভবেৎ, গৃহাৎ বনী ভবেৎ, বনাৎ প্রব্রজেৎ।"

এই শ্রুতিতে বানপ্রস্থ আশ্রমের পরই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। স্মৃতি শ্লোক যথা,—"ঋণত্রয়মপাকৃত্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেৎ গৃহাৎ" অর্থাৎ ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ, প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া অহং অভিমান রহিত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য এই তিন বর্ণ সন্ন্যাসাশ্রমই গ্রহণ করিবে। স্মৃতিতেও তিন ঋণ নিবৃত্তির পর সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসের অক্রম বোধনকারী শ্রুতি-স্মৃতি এবং ক্রম বোধনকারী শ্রুতিস্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে। হে শিষ্য, বিষয়ভোগ হইতে যে ব্যক্তির তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি না হইয়াছে, কিন্তু মন্দ বৈরাগ্য হইয়াছে, সেই মন্দ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রতি শ্রুতি স্মৃতিতে বানপ্রস্থাশ্রমের পর চতুর্থ অবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান কথিত হইয়াছে। আর যে ব্যক্তির তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি হইয়াছে, সেই তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রতি, শ্রুতিতে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের পর সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী পুরুষের ভেদ হওয়াতে শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ নাই। কিম্বা "ন্যাসো হি ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে সন্ন্যাসাশ্রমকেই ব্রহ্মরূপ বলা হইয়াছে। "তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরং" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পূর্ব্ব উত্তর-ভাগ রহিত বলা হইয়াছে। সুতরাং যেরূপ ব্রহ্মবিষয়ে পূর্ব্ব উত্তর ভাব নাই, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সন্ন্যাস বিষয়েও পূর্ব্ব উত্তর ভাব সম্ভব নহে।

হে ভগবন্, যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম, সেইরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের পর কোনও আশ্রম আছে বা নাই? হে শিষ্য। যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম সেইরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের পর অন্য কোনও আশ্রম নাই। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি সর্ব্ব আশ্রমের এই সন্ন্যাসাশ্রমই অবধি রূপ। এই বার্ত্তা শারীরক ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে "তদ্ভূতস্য তু ন তদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ" এই চল্লিশ সূত্রে শ্রীব্যাস ভগবান এবং সেই সূত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীভাষ্যকার বিস্তারিতরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। সেই সূত্রের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, সন্ন্যাস আশ্রমের পর কোন আশ্রম গ্রহণ করিবার অর্থ প্রকাশকারী কোন শ্রুতি বা স্মৃতি নাই, এবং শিষ্ট পুরুষের এরূপ আচারও দেখা যায় না; এই কারণে যে পুরুষ চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার শরীর নাশ পর্য্যন্ত সেই চতুর্থ আশ্রম হইতে উপর আরোহণ করিবার কিছু নাই। হে শিষ্য, চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমের পর অন্য কোন আশ্রম গ্রহণ হইতে পারে না; এই বার্ত্তা যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্র

প্রসিদ্ধ, সেইরূপ দ্বিজ কোন না কোন আশ্রম বিনা থাকিবে না এই বার্ত্তাও শ্রুতি স্মৃতি আদি সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। তদ্বিষয়ে দক্ষ প্রজাপতির স্মৃতি শ্লোক যথা,—"অনাশ্রমী নৈব তিষ্ঠেদব্দমেকমপি দ্বিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রাচশ্চিত্তীয়তে হি সঃ" অর্থাৎ ইহলোকে দ্বিজ আশ্রম বিনা এক বৎসর পর্য্যন্তও থাকিবে না; কোন এক আশ্রম অঙ্গীকার করিয়াই বাস করিবে। আর যে দ্বিজ একবর্ষ পর্য্যন্ত কোন আশ্রম বিনা থাকে, সেই দ্বিজকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তাৎপর্য্য এই, যে পর্য্যন্ত সেই দ্বিজের স্ত্রী জীবিত থাকে, সেই পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রম কহা যায়। আর স্ত্রীর মৃত্যুর পর সেই গৃহস্থাশ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। সুতরাং এই দ্বিজ স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যে কোন না কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন অথবা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। পরন্তু কোন আশ্রম গ্রহণ বিনা অনাশ্রমী হইয়া দ্বিজ কদাচিৎ থাকিবেন না। এক্ষণে সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে ঋষিঋণ নিবৃত্তি করিয়া এবং গৃহস্থাশ্রমে দেব ও পিতৃঋণ নিবৃত্তি করিয়া এই অধিকারী পুরুষ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবেন; বানপ্রস্থাশ্রমে এই অধিকারী পুরুষ তিন ঋণ রহিত হইবেন। যেরূপ ব্রহ্মচারী দেবতা ও পিতৃঋণ রহিত হন, গৃহস্থাশ্রমী ঋষিঋণ রহিত হন এবং বানপ্রস্থাশ্রমী ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ এই তিন ঋণ রহিত হন, সেইরূপ এই চতুর্থ আশ্রমধারী সন্ন্যাসী লৌকিক, বৈদিক প্রভৃতি সর্ব্বঋণ রহিত হন।

হে শিষ্য! এই প্রকার শাস্ত্র ব্যবস্থা পরিজ্ঞাত সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি অন্তরে সর্ব্ব ঋণ মুক্ত হইলেও গৃহস্থাশ্রমের সম্বন্ধ বশতঃ ঋণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গৃহস্থাশ্রম অঙ্গীকার করিয়া দেবতা ও পিতৃদেবদিগের প্রসন্নতার নিমিত্ত বিচারপূর্ব্বক গো, সুবর্ণ ও অন্নাদি দান করিতে লাগিলেন; সেই বিচার তুমি শ্রবণ কর "আমি যাজ্ঞবল্ক্য মুনি, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বেদাধ্যয়ন করিয়া যে প্রকার ঋষিঋণ পরিশোধ করিয়াছি, সেই প্রকার দেব-ঋণ এবং পিতৃঋণ প্রদান করিয়া পশ্চাৎ আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব। যদি কখনও ঋষিঋণের ন্যায় দেবঋণ ও পিতৃঋণ না দিই, তবে ঋষি দেবতা এবং পিতৃ দেবতা এই তিনের বিষম অচলরূপ পংক্তি ভেদ হইবে। সুতরাং ঋষিঋণের ন্যায় দেবতা ও পিতৃঋণ আমি উত্তম রূপে পরিশোধ করিব। এইরূপে তিন ঋণের নিবৃত্তি করিয়া আমি যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব, তখন আমার গুরু সূর্য্য ভগবান্ আমার প্রতি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই আজ্ঞা প্রতিপালন

আমার দ্বারা উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবে। সূর্য্য ভগবানের বচন সত্য করিবার জন্য আমি স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তিকারী যে যজ্ঞাদি রূপ প্রবৃত্তি মার্গ এবং মোক্ষ প্রাপ্তিকারী যে আত্মজ্ঞানরূপ নিবৃত্ত মার্গ এই উভয় মার্গ প্রতিপালন করিব।" হে শিষ্য! এই প্রকার বিচার করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের প্রসন্নতার জন্য নানা প্রকার দান করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির গৃহস্থাশ্রম সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে। হে শিষ্য! দিবারাত্র সর্ব্ব জীবের উপকারী যাজ্ঞবল্ক্য মুনির গৃহস্থাশ্রম দেখিয়া সর্ব্বলোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল। তথায় কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী উভয় ভার্য্যা এবং আজ্ঞাকারী পুত্রগণের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যজ্ঞ ও হোমাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে পালন করিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিন বেদ পাঠ করিয়া ঋষিগণকে পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রাদি উৎপন্ন ও পিণ্ডদানাদি করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি স্বর্গবাসী পিতৃলোককে পালন করিতে লাগিলেন। রাত্রিযাপন করিবার স্থান এবং নানা প্রকার অন্ন, বস্ত্র, সুবর্ণাদি ধন ও অনেক প্রকার পদার্থ দান করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি দরিদ্র মনুষ্যকে পালন করিতে লাগিলেন। তৃণাদি দিয়া গো অশ্বাদি পশু পালন করিতে লাগিলেন। রন্ধন ও ভোজন পাত্রে পরিশিষ্ট অন্ন এবং বলিদানাদি দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য মুনি শ্বান্ কীটাদি জন্তু পালন করিতে লাগিলেন, এবং যেরূপ ইহলোকে কোন ধনী লোকের গৃহে দুন্দুভি শব্দ দ্বারা অন্নার্থী জীবকে ডাকা যায়, সেইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গৃহে বেদবাণীরূপ ধেনুর স্বাহা বষট্ স্বধা হন্ত এই চারি স্তনরূপ শব্দ দ্বারা দেবতাদির আবাহন করিতে লাগিলেন। তথায় স্বাহা বষট্ এই দুই শব্দ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের আর স্বধা শব্দ দ্বারা পিতৃলোকের এবং হর্ষ প্রকাশকারী যে হন্ত পদ তাহা দ্বারা অন্নার্থী মনুষ্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে শিষ্য! যাজ্ঞবল্ক্য মুনি এই প্রকার অদ্ভুত গৃহস্থাশ্রম করিতে লাগিলেন। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির কাত্যায়নী স্ত্রীর বিষয় নিরূপণ করা যাইতেছে। কাত্যায়নী গৃহকার্য্যে অত্যন্ত কুশল ছিলেন। তিনি আপনার গৃহের যে ভিত্তি, ভূমি এবং দ্বার এবং যজ্ঞশালার যে ভূমি, সমস্ত স্থানগুলি প্রতিদিন মার্জ্জনা করিয়া শুদ্ধ এবং চূর্ণাদি শুক্ল মৃত্তিকা দ্বারা দুগ্ধের ন্যায় শুক্ল করিতেন। অন্ন পাক করিবার পাত্র এবং জলের ঘটি ও কমণ্ডলু এবং তাহা ঢাকিবার পাত্রটীকে ভস্মাদি দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিতেন। এবং কাত্যায়নী রৌদ্রে এবং অগ্নিতে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য,

চোষ্য, এই চারি প্রকার অন্ন পাক করিতেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নানাদি নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনার পতিকে পূজা করিতেন। পতির মাতা পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভগ্নী ইত্যাদি সমস্ত পরিবারবর্গকে কাত্যায়নী যথাযোগ্য পূজা করিতেন। এই প্রকার গৃহকার্য্যে অত্যন্ত কুশল কাত্যায়নীর সমান পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোকই হ'ন নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না এবং বর্ত্তমানেও কেহ নাই।

এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির দ্বিতীয় স্ত্রী মৈত্রেয়ীর বৃত্তান্ত নিরূপণ করা যাইতেছে। মৈত্রেয়ী সংসার সম্বন্ধীয় জন্ম-মরণাদি দুঃখ দেখিয়া উন্মত্ত পুরুষের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গাভী যেরূপ বৎসের মৃত্যুতে সর্ব্বদা শোকাতুরা থাকে, মৈত্রেয়ী সেইরূপ সর্ব্বদা শোকাতুরা থাকিতেন। এক্ষণে সেই বিচার নিরূপণ করা যাইতেছে। "আমি কে? দেহাদি-সংঘাত-রূপ 'আমি' অথবা দেহাদি সংঘাত হইতে 'আমি' ভিন্ন? দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন হইলেও 'আমি' জড় অথবা চৈতন্যরূপ? এই মনুষ্য লোকে 'আমি' কি প্রয়োজনে আসিয়াছি? এই শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে 'আমি' কোথায় ছিলাম? এখনই বা 'আমি' কোথায় আছি এবং মৃত্যুর পরই বা কোথায় যাইব? এই আমার পতির স্বরূপ কি? আমার পুত্র কন্যারই বা স্বরূপ কি? এই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ স্থূল শরীর, ইহারই নাম পতি পুত্রাদি, অথবা এই শরীর হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুর নাম পতি পুত্রাদি? সেই ভিন্ন বস্তু জড় অথবা চেতন? আর প্রতিদিন যে আমার দুঃখ হইতেছে, সেই দুঃখেরই বা স্বরূপ কি? বিষয় সম্বন্ধ হইতে আমাদের যে সুখ হয়, সেই সুখের স্বরূপ কি? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি যে রূপাদি বিষয় দর্শন করিতেছি, সেই ইন্দ্রিয়েরই বা স্বরূপ কি? যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীব আমি দর্শন করিতেছি, সেই জীবেরই বা স্বরূপ কি?" হে শিবা! মৈত্রেয়ী আপনার মনে সদা সর্ব্বদা এই প্রকার বিচার করিয়া শোকাতুরা হইতে লাগিলেন। মৈত্রেয়ীর চিত্তের সর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিলেও যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আপনার গৃহস্থাশ্রম সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বে মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন নাই; গৃহকার্য্যেই প্রবৃত্ত রাখিয়াছিলেন।

এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির বৃত্তান্ত নিরূপণ করা যাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গৃহস্থাশ্রমে বহুকাল থাকিয়া এক সময়ে একান্ত প্রদেশে বসিয়া এই প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন, "ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ইহলোকে সর্ব্ব দেহধারী জীবের অত্যন্ত প্রিয় যে প্রাণধারণ, সেই প্রাণধারণই পরম দুঃখরূপ। কারণ

এই জীব শরীররূপ বন্ধন গৃহ যে গ্রহণ করে, তাহা ত' প্রাণধারণ জন্যই গ্রহণ করে। এই শরীর কিরূপ? ত্বক্, রুধির, মাংস, মজ্জা, মেদ, অস্থি, বীর্য্য এই সপ্ত ধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ; এবং বাত, পিত্ত, কফ এই তিন দোষ বিশিষ্ট ও পুঁয, বিষ্ঠা, মূত্র ইত্যাদি মল দ্বারা পূর্ণ। এই কারণেই এই শরীর অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট এবং নানা প্রকার ভয়প্রদ। পুনঃ এই শরীর কিরূপ? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখযুক্ত। তন্মধ্যে শিররোগ, অতিসার, প্লীহা, গণ্ডমালা ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধি হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ, এবং কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ, মোহাদি রূপ আধি হইতে উৎপন্ন যে সকল দুঃখ, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। আর সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, শত্রু ইত্যাদি ভূতজন্য যে নানা প্রকার দুঃখ সেই দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ; শীত, আতপ, বর্ষা, অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যাদি দেবতা দ্বারা উৎপন্ন যে নানা প্রকার দুঃখ, সেই দুঃখের নাম অধিদৈবিক দুঃখ। পুনঃ এই শরীর কিরূপ? বাল্য, যৌবন বৃদ্ধ এই তিন অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ, আসক্তি ইত্যাদি বিকার দ্বারা নানা প্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে। এই শরীরে প্রাণের প্রবেশ এবং এই শরীর হইতে প্রাণের নির্গমন, এই দুই স্মরণ করিয়া যে ভয় উৎপন্ন হয়, সেই ভয় সকল অবস্থায় আমাদের ন্যায় জীবের দুঃখ উৎপাদন করে। সেই ভয়-জন্য দুঃখ হইতে অধিক দুঃখ মাতার গর্ভে বা মরণ কালেও হয় না। এই যে নানা প্রকার দুঃখ জীব ইহলোকে এবং পরলোকে প্রাপ্ত হয়, তাহা কেবল শরীরের সম্বন্ধ বশতঃই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরের সম্বন্ধ বিনা এই জীবের কখনও দুঃখ হইতে পারে না; সুতরাং এই শরীরের সম্বন্ধই সব দুঃখের কারণ। নির্জ্জন প্রদেশে যে জীবন্মুক্ত বিদ্বান পুরুষ বাস করেন, তাঁহার যখন এই শরীর দুঃখ উৎপাদন করে, তখন সংসারাসক্ত জীবের এই শরীর দুঃখ উৎপান করিবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? আপনার এক শরীরে যে অহং অভিমানরূপ সঙ্গ, সেই সঙ্গই যখন জীবকে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করে, তখন এই শরীর সম্বন্ধীয় যে স্ত্রী পুত্রাদি কুটুম্ব, পরিবার, তাহাদের প্রতিও অহং অভিমান রূপ সঙ্গ যে এই জীবকে অনেক দুঃখ প্রদান করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র, (কাশীধাম।)

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা দেখিয়াছি যে, ভাগবতের একমাত্র উদ্দেশ্য, গতি ও লক্ষ্য সর্ব্বাত্মক ভগবান্। ভাগবৎ অন্য শাস্ত্রের ন্যায় সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক তত্ত্বাদি নির্ণয়ের জন্য রচিত নহে। ভাগবৎ এখনও ধর্ম্মের কথা কহিবে সত্য বটে, কারণ তাহা না বলিলে শুধু নিষ্কল ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিলে সাংসারিক জীবের কোন উপকার সাধিত হইবে না; তবে 'ধর্ম্ম' অর্থের কেবল বৈজ্ঞানিক ভাবে সিদ্ধ 'অবয়বী ভাব' (Organising life) নহে। উহা বাহ্য জীবগণকে সংহত করিবার পর-পুরুষাভিমুখী ধর্ম্ম; সেইজন্য জলদ্‌গম্ভীর স্বরে সংসার-তপ্ত জীবের হৃদয়ে ঘোষিত হইল,—"সবৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুকী অপ্রতিহতা যয়াত্মা সংপ্রসীদতি।" ভাঃ—১-২-৬॥

সেই ত' পুরুষের ধর্ম্ম—সেই ত' পুরুষের 'পর' (Transcendent) ধর্ম্ম, যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মায়, এবং যদ্দ্বারা আত্মার সম্প্রসাদ সিদ্ধ হয়। অতএব বুঝা গেল যে, যতক্ষণ পুরুষবুদ্ধি বা ব্যক্ত বৃত্তিনিচয় ঘন ও পূর্ণ 'অহং'জ্ঞানে পরিসমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এই ভাগবৎ ধর্ম্মে প্রকৃত কার্য্য হইবে না। সেইজন্য মহাপ্রভুও প্রকৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য কত উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহাদের চিত্তে এখনও বাহ্য বস্তুর অভিমুখী প্রকৃতির খেলা আছে,—যাঁহারা বৃত্তি, ভাব, প্রভৃতিকে বাহ্য, বস্তু ব্যক্তি প্রভৃতিতে 'নঙ্গর' করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহারা বস্তু হইতে সুখ, দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান উদ্ভূত হয় বলিয়া মনে করেন,—যাঁহাদের ভিতর জগতের অতীত ও অতিগ স্থির-সত্ত্বার আভাস পান নাই, তাঁহারা এই ভক্তিযোগের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। এই পরম পুরুষাভিমুখী স্বাভাবিক চিত্তের গতিকেই 'পরাভক্তি' বলে। এই ভক্তি ক্রিয়াবহুল সাধনামূলক অহঙ্কার প্রণোদিত কর্ম্ম নহে। যেমন আমরা যাহাই করি না কেন, আমাদের চিত্তবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত ভাবে সেই 'আমি' জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয় ও তাহাতেই স্থির হইয়া যায়; সেইরূপ যখন চিত্তের গতি 'আমি'-রূপ জীবভাবে সিদ্ধ হইয়া, তাহা হইতে 'বস্তু' প্রভৃতির অতিগ বুদ্ধি লাভ করিয়া ভগবানেই পরিসমাপ্ত হয়, তখনই এই 'পরাভক্তি'র স্রোত বহিতে থাকে। দেবহূতিকে উপদেশ কালে ভগবান এই তত্ত্বই বলিয়াছেন,—

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ॥ ভাঃ—৩-২৯-১১
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যহ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥" ভাঃ—৩-২৯-১২

গঙ্গার যেরূপ সাগরাভিমুখী একটা স্বতঃ প্রবৃত্তি আছে, সেইরূপ জীব 'পুরুষ'ভাবে সিদ্ধ হইলে, 'সর্ব্ব" পুরুষ ভাবের আধার পুরুষোত্তমের প্রতি স্বাভাবিক গতি জন্মায়। ঐ গতি অবিচ্ছিন্ন, উহাতে কোন প্রয়াস বা অহঙ্কারের কর্তৃত্ব নাই; সেইজন্য উহা ভগবানের গুণ শ্রবণ মাত্রেই আপনা আপনি প্রধাবিত হয়। উহা সর্ব্বভূত-গুহাশয় বা সর্ব্বাত্মক শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত। কাজে কাজেই যাঁহারা বিভিন্নভাবে, সর্ব্বাত্মক ভাব হইতে পৃথক করিয়া বিশিষ্ট মূর্ত্তি প্রভৃতিতে ভগবানের অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা সর্ব্ব জীবে ভগবানের প্রকাশ দেখিতে সক্ষম নহে বলিয়া অন্য দেহে ভগবানকে দ্বেষ করেন, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তিগণ এই স্রোতের কথা জানেন না ও তাহাতে কথন শান্তি প্রাপ্ত হন না।

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি।" ভাঃ—৩।২৯।২৩।

'অধোক্ষজ' শব্দে শাস্ত্র কি নিগূঢ় ভাবরাশি রাখিয়া গিয়াছেন!! আমাদের দেহে যোগশাস্ত্রোক্ত যে সকল পদ্ম বা চক্র আছে, তাহাদের মধ্যে হৃদয়স্থ পদ্মটী কামনার বশে নিম্নাভিমুখী হইয়া থাকে। যিনি সেই নিম্নাভিমুখী বৃত্তি সমন্বিত—সেই কামনার ক্ষেত্রে হৃদয়-পদ্মে প্রকাশিত হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন, তাঁহাকে অধোক্ষজ বলে। আমাদের চিত্তের গতি স্বাভাবিক ভাবে কেবল 'দ্রব্য' 'ক্রিয়া' প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু ভোগের জন্য। কিন্তু এই ভোগাভিমুখিনী যমের সহোদরা যমুনা নাম্নী যে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহার ভিতরেও প্রকাশিত হইয়া জীবকে তুলিয়া লহেন, সেইজন্য করুণাময়কে অধোক্ষজ নামে অভিহিত করা হয়। এই গেল প্রাকৃতিক ভাবে তাঁহার নির্দ্দেশ। ভাই, পরাগতি বুঝিতে না পার ক্ষতি নাই, Sensation বা ভোগস্পৃহায় মত্ত হইয়া থাক, তাহাতে দুঃখ নাই। ঐ ভোগের মধ্যেই দেখ, "ভোক্তারম্ যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরং" রহিয়াছেন,—ঐ দেখ ভোগের মধ্যে কি এক 'ঘন আনন্দ' বুদ্ধিতে এত চাঞ্চল্য—এত মানসিক কল্পনা—এত ইন্দ্রিয়গণের ছুটাছুটী পরিসমাপ্ত হইয়া—স্থির হইয়া ডুবিয়া যায়। ভোজনে ব্যগ্রতা ও বিভিন্ন রসাদি গ্রহণ, ঐ দেখ কি এক অভিনব পরিতৃপ্তিতে শান্ত হইয়া গেল। প্রেমের পাত্রকে কামনার বশে

পাইবার জন্য যে কত ছুটাছুটী করিয়াছিলে, কত আশা-নিরাশা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি নানারূপে তরঙ্গায়িত কাম-সমুদ্রে উঠিতে ও পড়িতেছিলে ; কিন্তু যেমন সেই প্রিয়বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলে, ঐ দেখ কোথা হইতে তোমার মনুষ্য বুদ্ধির মধ্য দিয়া সেই আলিঙ্গনে ইন্দ্রিয়গণ আপনাপনি স্তিমিত হইয়া গেল,—মন মুগ্ধ হইয়া তাহার খেলা বন্ধ করিল,—বুদ্ধি সুষুপ্তভাবে মিশাইয়া গেল ঐ দেখ অধোক্ষজের বিকাশ। তারপর বুঝিতে পারিবে যে, 'অক্ষজ' বা ইন্দ্রিয় ও মন জন্য জ্ঞানগুলি সদাই তাহার 'অধে' বা নিম্নদেশে পড়িয়া থাকে। "অধঃ + অক্ষজম্ + ইন্দ্রিয়জম + জ্ঞানম্ — যস্মাৎ" (শ্রীধর)। ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানগুলি যাঁহাতে গিয়া আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়া অশেষে মিশিয়া যায়, সেই আনন্দময়কেই অধোক্ষজ বলে। প্রথম অর্থে তাহার "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসম্" আকর্ষণ ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় অর্থে তাঁহার "সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্" স্বরূপ তত্ত্বের আভাষ দেয়।

এই ভক্তি যে পরাগতি, এবং এই স্রোত হৃদয়ে জাগিলে 'পুরুষ' বা 'আমি' জ্ঞানটী অতিগ হইয়া শ্রীভগবানে মিশিয়া যায় ; তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাগবত নারদেব আত্মকাহিনীরূপে বলিলেন,—

'তস্মিংস্তদালব্ধরুচের্মহামতে প্রিয়শ্রবস্য স্খলিতা মতির্মম।

যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে।" ভাঃ—১।৫।২৭

"যয়া মত্যা পরে প্রপঞ্চাতীতে ব্রহ্মরূপে ময়ি সদসৎ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ এতচ্ছরীরং স্বমায়য়া স্বাবিদ্যয়া কল্পিতং ন তু বস্তুতোঽস্তীতি তৎক্ষণমেব পশ্যে পশ্যামি।" শ্রীধর॥ "সেই অপ্রতিহত মতি উৎপন্ন হইবার পর তৎসাহায্যে 'আমি' পর প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মরূপে 'আমাকে' চিনিতে পারিলাম ; এবং আমার শরীরাদিও যে আমাতেই আমার মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়া আছে, ইহাও বুঝিলাম।"

ইহা হইতে 'পরাভক্তি'রূপ অনির্ব্বচনীয়া মতির ফলগুলি বুঝা গেল। প্রথমতঃ—ঐ মতি পরাভিসারিণী বা পরম পুরুষে আপনাপনি অভিসার করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ—উহা "আত্মনি আত্মনম্" বা আমাদের আত্মা বা 'পুরুষ' জ্ঞানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি উহার কাছে আসিতে পারে না। তৃতীয়তঃ উহা—

"ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়ামতির্মধুপতেঽসকৃৎ।

রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥" ভাঃ—১।৮।৪২।

"গঙ্গা যেরূপ কত শত প্রতিবন্ধক উৎক্রমণ করিয়া, নিজের প্রবাহকে সাগরেই

পরিসমাপ্ত করে, তদ্রূপ আমার মতি অনন্তবিষয়া হইয়া তোমাতেই অবিচ্ছিন্ন গতি উদ্বাহন করুক।" অর্থাৎ এই মতি উৎপন্ন হইলে বস্তু, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতি বুদ্ধি সকল আর আমাদের চিত্ত-স্রোতের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সেই রসে এই বিশিষ্ট বুদ্ধিগুলি ডুবিয়া যায়, ও তাহাতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা ও একতানতা উৎপন্ন হয়; এবং তদ্দ্বারা ভগবানের প্রতি রতি 'উৎ' বা পরাভিমুখী হইয়া যায়। আমাদের 'আমি' জ্ঞান বা 'আমিটী' তাহার আধারভূত পরম 'আমিকে' পাইয়া, আর ছোট 'আমি' স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় না; প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মাতেই মিশিয়া যায়। এ ভক্তি 'প্রত্যৈকতানতা'রূপ ধ্যানের পরিসমাপ্তি ও স্বাভাবিক গতি মাত্র। অভিসন্ধিশূন্য, ভোগাদি বুদ্ধির অতীত, এই স্রোত হৃদয়ে জাগ্রত হইলে ও সর্ব্বাত্মক বা বাসুদেব রূপ ভগবানের দিকে প্রধাবিত হইলে, আপনাপনি পরা-বৈরাগ্য ও অহৈতুকী স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়।

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ ভাঃ — ১।২।৭

এ বৈরাগ্য ফলের বৈরাগ্য নয়, ইহা কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা- ত্যাগ নহে। ইহা পাতঞ্জলোক্ত গুণ-বিতৃষ্ণারূপ পরা' বৈরাগ্য। এ অহৈতুক জ্ঞান "শুষ্ক তর্কাদির অগোচর ঔপনিষদিক জ্ঞান। "শুষ্ক তর্কাদ্যগোচরম্ উপনিষদমিত্যর্থ"। শ্রীধর॥ আর এ ভগবান বিশিষ্ট মানসিক তনু দ্বারা আবিষ্কৃত হইলেও বিশিষ্ট ব্যক্তি নহেন, তিনি সব গুহাশয়, সর্ব্বভূতে অধিশয় এবং সর্ব্বাত্মক শ্রীবাসুদেব মূর্ত্তিতে বিশিষ্ট ভিন্ন ভাব দর্শন করিলে এ তত্ত্ব ফুটিবে না— এ আকর্ষণ জাগিবে না।

ইহাই 'পুরুষের' পরম ধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্ম—যে সকল অবয়বী ভাবের সিদ্ধি উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও, সেই পরম আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে জীবের রতি উৎপন্ন না করে,—যে ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াও আমরা ভগবানকে দেখিতে না যাইয়া, 'আমি জ্ঞানী', 'আমি ভক্ত', 'আমি সাধক' প্রভৃতি জ্ঞানে আমাদের ছোট 'আমি'টীকেই দেখিয়া ফেলি, যাহার ফলে একত্ব বুদ্ধির আভাস পাইয়াও সাধকেরা আপনাপন 'দল' 'মত' প্রভৃতির স্থাপনা করিতে যায়; সে ধর্ম্ম—সে অনুষ্ঠান কেবল শ্রম বা খাটাখাটুনী মাত্র।

"ধর্ম্ম স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্। ভাঃ—১-২ ৮॥

এই আপবর্গ ধর্ম্মের ফল কখনও বিশিষ্ট অর্থ হইতে পারে না। ইহার উদ্দেশ্য, গতি প্রয়োজন ও বস্তু, শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য অর্থে পর্য্যবসিত হইতে পারে না;

কাজেই আর দ্বিতীয় 'অর্থ'ও থাকে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, ধর্ম্মের ফল অর্থ ও তাহার ফল কাম; তাহার ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি। কিন্তু একের প্রতি অব্যভিচারিণী অদ্বিতীয়া মতি কখনও বাহ্য বস্তু প্রসব করিতে পারে না। আর সেই পরম অবয়বীরূপ ধর্ম্মে,—এক অন্ত বা পরিসমাপ্ত রূপ পদার্থকে পাইয়া বা পাইতে গেলে, কাম আর বাহ্য বস্তু লাভে প্রবৃত্ত হয় না।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।

নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ। ভাঃ—১।২।৯

তবে কামের আবশ্যকতা কি? কামের আকর্ষণ কেন জীবের হৃদয়ে সতত খেলিতে থাকে? যে কামের মূর্ত্তি এবং বিশিষ্ট ভাব ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সকল তত্ত্বগুলিকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা কি কেবল সাধকের যুদ্ধ করিবার উপযোগী বস্তুরূপে সৃজিত? সাধক কি কামের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক পেশী (Muscles) গুলিকে পুষ্ট করিবে? না কামের অন্য কোন ভাষা আছে? যতক্ষণ জীব, 'জীব'ভাবে থাকে, যতক্ষণ জীব When waxing stronger thy soul glides from her safe retreat and seeing her image in space and says 'This is I' প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দর্শনে 'অহম্ ইদমেব ইত্যভিমানেন' (শ্রীধর) 'আমি এই' এইরূপ ভাবে আপনাকে ভেদ-বিশিষ্টতার বশে দেখিতে চায়, ততক্ষণই সেই পরম পুরুষের প্রেমই জীবের নিকট কাম বা বাহ্য ভাবে স্বীয় সুখ স্বরূপের অনুসন্ধান-শক্তিরূপে খেলিতে থাকে। জীবের 'আমি' সেই পরমাত্মা সমুদ্রে তরঙ্গরূপে উৎপন্ন হইয়া, কেন বিশেষের দিকে কামবশে প্রধাবিত হয় বলিতে পার? উহা কি কেবল অবিদ্যারই খেলা? না অবিদ্যার ভিতর কিছু বিদ্যা ভাবের ব্যঞ্জনা আছে? একখণ্ড প্রস্তরকে আকাশের দিকে ছুড়িয়া দাও, সে যে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে তাহার কারণ কি তাহার ক্ষুদ্র শক্তির আকর্ষণ, না পৃথিবীর প্রেমময় অভেদ টান? পৃথিবী যেমন তাহার অংশভূত বস্তু নিচয়কে বাহিরে রাখিয়া স্থির থাকিতে পারে না, ক্রমশঃই বক্ষের দিকে টানে,—সেইরূপ জীবের জীবন স্বরূপ শ্রীভগবান, তাহাকে বাহিরে 'জীব'রূপে বিশিষ্ট ভাবে বিসৃজন করিয়া কি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন? তাঁহার প্রেমময় স্বরূপানুভূতিই ত' জীব হৃদয়ে কামরূপে খেলিয়া অংশভূত জীবকে তাঁহারই বাহ্যভাব জগদ্বস্তুর প্রতি আকর্ষিত করিতেছে। ঐ আকর্ষণের বশে আমরা বস্তু গুলিকে হৃদয়ে তুলিয়া লইলে, কি এক আনন্দের উৎস বহিয়া যায়; ও

এক ক্ষণের জন্যও আমাদের জৈবিক 'আত্ম-পর বুদ্ধি' সেই আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া যায়।

সেই আনন্দ সংপ্লবে আর 'উভয়' ভাব থাকে না। "আনন্দ সংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে।" (ভাঃ—১-১-১৮)। সেই জন্যই প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীবকে পুনরায় স্ববক্ষে ধারণ করিবার জন্য ভগবানের—সেই পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের,—প্রেমময় হস্ত-প্রসারণই ত' 'ক্লীং' বা কামবীজ। সুতরাং কামের ফল আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি কামরূপে নহে; যতক্ষণ জীব, জীবরূপে থাকে, ততক্ষণই ভগবান কামরূপে খেলেন। "কামস্যনেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা"। কামই জীবের মূল মন্ত্র ও একমাত্র প্রেরণাশক্তি। উহা বাশিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া, 'সর্ব্ব'ভাবের ভিতর দিয়া, শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত হয়। এই পরিসমাপ্তিই তত্ত্বজ্ঞান,—সেই তত্ত্ব, যাহা অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপ ও যাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হইতেছে। যদি তিনি অনন্ত বস্তুরূপে 'আমিটীকে' আকর্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে বস্তু, জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি থাকিত না। এই সকল শাস্ত্র সেই আকর্ষণ-তত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ভাব স্ফুরণের জন্য রহিয়াছে। তিনি 'সর্ব্ব'তে আছেন বলিয়াই জীব সর্ব্বাত্মক জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আপাততঃ 'অহং' ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলিকে যখন আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি, তখনই ত' ছিন্ন 'আমি' ও ছিন্ন বস্তুর অতিগ কি এক সৎ চিৎ ও আনন্দ-ঘন 'আমির' আভাস পাওয়া যায়; এবং তদ্দূর আমরা সেই আকর্ষণের মধ্যে আত্মভাব দেখিতে পাই; অনন্ত সুখ দুঃখ, 'আমির' ভিতর ডুবিয়া যায়। ফলে কি এক মহান্ 'আমিটী' রহিয়া যায়। 'সর্ব্ব'কে আমিতে' শেষ করিয়া দেওয়ার নামই সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা। অতএব বুঝা গেল ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চারি ভাবেই শ্রীভগবান আপনার স্বরূপের ব্যঞ্জনা করিতেছেন ও সেই মহাভাবময় শ্রীভগবানই ভাগবতের বেদ্য ও গতি। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

মোক্ষ]

উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ভূমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবান সনৎকুমার নারদ মুনির চিত্তে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য নামাদি উপাসনার ফলও সেই সেই স্থানে করিয়াছিলেন। তদনন্তর নারদ সনৎ কুমারকে পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্ এই কামনা রূপ আশা হইতে

কোন্‌টি অধিক ? এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সনৎকুমার বলিলেন,—"হে নারদ ! এই সর্ব্ব জীব আত্মারূপে যে প্রাণকে নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রাণ এই আশা অপেক্ষা অধিক। হে নারদ, রথচক্রের যেরূপ অরা আছে, সেই অরা যেমন চক্রের নাভির আশ্রিত ; সেইরূপ সমস্ত বিশ্ব এই প্রাণের আশ্রিত। এই প্রাণই সর্ব্ব কারক রূপ। যত দেহধারী জীব আছে, সেই সমস্ত জীবই প্রাণরূপ। ইহলোকে সেই প্রাণ হইতে ভিন্ন কিছুই নাই।" হে শিষ্য, যখন সনৎকুমার নারদকে এই প্রকার প্রাণের অধিকতা কথন করিলেন, তখন নারদ মুনি প্রাণের পর তত্ত্ব কি জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া পুনঃ প্রশ্ন হইতে উপরত হইলেন। অনন্তর নারদ মুনিকে তূষ্ণী হইতে দেখিয়া ভগবান সনৎকুমার কৃপা পরবশ নিজেই প্রাণের পর তত্ত্বের উপদেশ করিতে লাগিলেন,—"হে নারদ! দু'টী বস্তু এই পিণ্ডে উপলব্ধ হইতেছে ; এক আত্মা এই পিণ্ডের পদাগ্র হইতে পিণ্ডে প্রবেশ করিয়া থাকে, আর এক আত্মা এই পিণ্ডের কেশ বিন্যাসের সীমা বিদারণ করিয়া প্রবেশ করে। তাহার মধ্যে চক্ষু শ্রোত্রাদি অনেক ভেদ বিভিন্ন এক জাতীয় করণ যদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়, সে আত্মা নহে। আর দ্বিতীয় যে একমাত্র উপলব্ধি করে সে বহু নহে,—এক ; সেই আত্মা হইতে পারে। সুতরাং পুরুষের সকল প্রকার উপলব্ধি করিবার একমাত্র করণ—এই মন, সকল করণের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। কৌষিতকী উপনিষদে এবং বাজসনেয়কে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে "প্রজ্ঞা দ্বারা চক্ষুতে সমারূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন কর," সুতরাং অন্তঃকরণই সমস্ত উপলব্ধির কারণ। প্রাণ আবার তদাত্মক ; যে প্রজ্ঞা সেই প্রাণ, যে প্রাণ সেই প্রজ্ঞা ; ব্রাহ্মণ ভাগে এইরূপই দেখা যায়। প্রাণ-সংবাদাদিতেও করণ সমুদায়ই প্রাণ। কৌষিতকী উপনিষদে প্রাণে প্রজ্ঞাদি সর্ব্বকরণের লয় সপ্রমাণিত হইতেছে : অতএব যিনি পদদ্বয় অবলম্বন করিয়া এই পিণ্ডে প্রবেশ করেন তিনিও ব্রহ্ম ; তবে উপলব্ধার উপলব্ধির করণ বলিয়া তিনি গুণভূতও অপ্রধান, সুতরাং তিনি আত্মা হইতে পারেন না।

এখন দুটী আত্মার মধ্যে একটী অনাত্মা হইয়া গেল ; আর একটী যিনি সীমাভেদ করিয়া প্রবেশ করেন, তিনিই সকলের উপাস্য। হে নারদ, পূর্ব্বোক্ত অনাত্ম প্রাণের জ্ঞান হইতে অতিবাদীপণা হইবে, ইহা তুমি নিশ্চয় করিও না। কারণ যদি সেই প্রাণের অধিক কোন বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে সেই প্রাণের জ্ঞান হইতেই অতিবাদীপণা সিদ্ধ হইত। পরন্তু

সেই প্রাণ হইতে সত্য বস্তু অধিক। সেই প্রাণের জ্ঞান হইতে অতিবাদীপনা হইবে না। কিন্তু যে পুরুষ নিরন্তর সেই সত্য বস্তুকেই কথন করে, সেই পুরুষকে তুমি মুখ্য অতিবাদী বলিয়া জানিও। হে শিষ্য, সত্য বস্তুর কথনকারী পুরুষই মুখ্য অতিবাদী। সনৎকুমারের এই প্রকার বচনের তাৎপর্য্য এই যে পরব্রহ্ম এই জগতের কারণ রূপে কথিত হইয়াছে, এবং যে পরব্রহ্ম সুখ রূপে এবং যে পরব্রহ্ম নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিশ্বরূপে কথিত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মই এই সত্য শব্দের অর্থ। ভগবান সনৎকুমার নারদকে পুনঃ এই প্রকার বচন কহিতে লাগিলেন যে, এই প্রাণের পরে যে সত্য বস্তু আছে, সেই সমস্ত সত্য বস্তুই তোমার জানিবার যোগ্য। সেই সত্য বস্তুর বিচার বিনা তুমি আপনাকে কৃতকৃত্য জানিয়া স্থির হইতে পারনা। নারদ বলিলেন, হে ভগবন আমি সেই সত্য বস্তুকে জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই সত্য বস্তুর উপদেশ করুন। হে শিষ্য। ভগবান সনৎকুমার নারদ মুনিকে যেরূপ সত্য বস্তুর কথন করেন, সেইরূপ বিজ্ঞান মনন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কৃতি, সুখ এই ছয় পদার্থের প্রশ্ন উৎপন্নকারী বচন কহিয়াছিলেন। সেই বচন শ্রবণ করিয়া নারদ সনৎকুমারকে ছয়বার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এখানে আনন্দ স্বরূপ সত্য বস্তু ত' উপেয় আর অন্য বিজ্ঞানাদি ষট্ পদার্থ সেই উপায় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্তির সাধন রূপ, সুতরাং পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। হে নারদ, যে পুরুষ সেই সত্যরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানেন, সেই পুরুষই সত্য বস্তুর স্পষ্টরূপে কথন করিতে সমর্থ। সেই সত্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানহীন পুরুষ কথন করিতে সমর্থ নহেন। অতএব এই জানা যাইতেছে যে, সেই সত্য বস্তুর কথন বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমানরূপ 'বিজ্ঞানই' তাহার কারণ। নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা সেই সত্য বস্তুর চিন্তন রূপ যে মনন, সেই মনন দ্বারা যখন সেই সত্য বস্তু বা প্রমেয়ের অসম্ভাবনা নিবৃত্তি হয় তখনই সেই সত্য বস্তুর বিজ্ঞান হইয়া থাকে। মনন বিনা সেই সত্য বস্তুর বিজ্ঞান হয় না, সুতরাং জানা যাইতেছে যে, সেই 'মননই' বিজ্ঞানের কারণ। হে নারদ, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে বিশ্বাস রূপ যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই এই মনন করিতে প্রবৃত্ত হন। শ্রদ্ধারহিত ও নাস্তিক পুরুষ এই মননে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব এই জানা যাইতেছে যে সেই 'শ্রদ্ধাই' মননের কারণ। এই বেদান্তশাস্ত্র জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অথবা ভেদ কথন করে, এই প্রকার প্রমাণগত অসম্ভাবনা নিবৃত্তিকারিণী যে যুক্তি এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে সমগ্র বেদান্তের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করাইতে সমর্থ

যে সমস্ত যুক্তি, সেই যুক্তি চিন্তনের নাম নিষ্ঠা। এরূপ নিষ্ঠাবান্ পুরুষই শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হন। নিষ্ঠা রহিত পুরুষের শ্রদ্ধা হইবেনা। সুতরাং জানা যাইতেছে 'নিষ্ঠাই' শ্রদ্ধার কারণ। যজ্ঞাদি যে বহিরঙ্গ সাধন এবং শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন, এই দুই প্রকার সাধনের যে অনুষ্ঠান, তাহার নাম কৃতি। যে পুরুষ এই প্রকার কৃতি-যুক্ত, সেই পুরুষই অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া নিষ্ঠাবান্ হইয়া থাকেন। কৃতি বিনা নিষ্ঠা হইবে না। অতএব এই জানা যাইতেছে যে, 'কৃতিই' নিষ্ঠার কারণ। ইহলোকে যে পুরুষ সুখরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, সেই পুরুষই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন করেন। সুখের ইচ্ছা বিনা কোন০ পুরুষ সেই সমস্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইবে না। যদ্যপি দুঃখের অভাবকে ইচ্ছা করিয়াও লোকের সেই সমস্ত সাধনে আবেগ হয়, তথাপি সেই দুঃখাভাব স্বতঃ পুরুষার্থরূপ নহে। কিন্তু সেই দুঃখাভাব সুখের অভিব্যক্তির সাধনরূপ হওয়াতে জীবের ইচ্ছার বিষয় হয়। তাহাতে এই জানা যাইতেছে যে 'সুখ' কৃতির কারণ।

হে শিষ্য, সনৎকুমারের এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া, সাংসারিক সুখে বিরক্ত নারদ মুনি সেই সাংসারিক সুখকে দুঃখ গণনা করিয়া মুখ্য সুখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! 'আমার মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে', যে পুরুষের চিত্তে এই প্রকার বাসনা আছে, সেই পুরুষ সেই সুখের বস্তুস্বরূপ অবশ্য জানিবার যোগ্য হ'ন। যে সুখের জ্ঞান হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, সেই সুখ এই সংসারে প্রসিদ্ধ নাই; কারণ এই সংসারে বিষয় হইতে জীব যে সুখ প্রাপ্ত হয়, সেই সুখ সুখ রূপ নহে, তাহা দুঃখ-রূপই হয়। কারণ ইহলোকে যে বস্তুর যে স্বভাব, সেই বস্তুর সেই স্বভাব কখনও অন্যথা হইবে না। যেরূপ অগ্নির উষ্ণ স্বভাব কোন কালেও অন্যথা হইবে না, সেইরূপ এই বিষয় জন্য সুখও যদি সুখ-রূপ হইবে, তাহা হইলে এই সুখ কোন কালেও দুঃখ রূপ হওয়া উচিত নয়; কিন্তু এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়-জন্য সুখ প্রাপ্তিকালে জীবকে দুঃখই প্রদান করে, এবং বিয়োগ কালেও জীবের অসীম দুঃখ হইয়া থাকে। এই প্রকার আদি অন্তে দুঃখ-দায়ক বিষয়-সুখ মধ্যকালে জীবের কি প্রকারে সুখদায়ক হইবে? কিন্তু আদি অন্তের ন্যায় মধ্যকালেও সেই বিষয়-জন্য সুখ দুঃখ-রূপই হয়। হে ভগবন্, এই দুঃখ-রূপ বিষয় সুখে যে জীবের সুখ রূপতা প্রতীত হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানের বশে হইয়া থাকে। শস্ত্র প্রহার যদিও দুঃখ-রূপ, তথাপি পরিপক্ক ব্রণে সেই শস্ত্র প্রহার সুখ-রূপই প্রতীত

হইয়া থাকে। সুতরাং হে ভগবন্, যাহাতে বাস্তবিক সুখ আছে, তাহা আমাকে বলুন।" ভগবান সনৎকুমার নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—"হে নারদ, দেশ, কাল, বস্তু, পরিচ্ছেদ রহিত যে ব্যাপক বস্তু, সেই বস্তুকেই বিদ্বান পুরুষ সুখরূপে কথন করিয়াছেন। সেই 'সর্ব্ব' পরিচ্ছেদ রহিত হওয়াতে যে বস্তুকে ভগবতী শ্রুতি "ভূমা" এই শব্দে কথন করিয়াছেন, সেই ভূমাকেই তুমি সুখরূপ বলিয়া জান। সেই 'ভূমা' ভিন্ন সর্ব্ব পদার্থই দুঃখরূপ হয়। শ্রুতি যথা,—"যদ্বৈ ভূমাতৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" হে নারদ, যদি তোমার সেই বস্তুর সুখের স্বরূপ নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি সেই 'ভূমা' পদার্থ জানিতে ইচ্ছা কর। অনন্তর নারদ মুনি সনৎকুমারকে সেই 'ভূমা' পদার্থ বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

সনৎকুমার বলিলেন—হে নারদ, যে তত্ত্ব বিষয়স্থিত হইয়া এই বিদ্বান্ পুরুষ 'আপনা হইতে ভিন্ন রূপে' কোনও পদার্থকে নেত্রেন্দ্রিয় দ্বারা দেখেন না, শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করেন না মন দ্বারা জানেন না সেই তত্ত্বই 'ভূমা' শব্দের অর্থ এবং 'সুখ' শব্দের অর্থ। যে পদার্থ বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে এই পুরুষ আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থকে নেত্রেন্দ্রিয় দ্বারা দেখেন এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করেন ও মন দ্বারা জানেন, সেই পদার্থ অল্প এবং দুঃখ রূপ। সেইজন্য শ্রুতি বলিলেন,—"দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" সুতরাং সেই 'ভূমা' অমৃত রূপ এবং সর্ব্ব বিকার রহিত। সেই সমস্ত অল্প পদার্থ মর্ত্ত্যলোক এবং সর্ব্ব বিকারবান্। হে নারদ, এই সুখরূপ আত্মাকে যখন অধিকারী পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে জানিতে পারেন তখন তিনি মুখ্য অতিবাদী হ'ন। সেই 'ভূমা' হইতে ভিন্ন প্রাণাদির জ্ঞান হইতে এই পুরুষ মুখ্য অতিবাদী হইতে পারে না। সুতরাং মুখ্য অতিবাদীপণা প্রাপ্তির জন্য এই অধিকারী পুরুষ সেই সুখরূপ ভূমাকে অবশ্য জানিবেন। হে শিষ্য। যখন ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে এই প্রকার ভূমার উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন নারদ ভাবিলেন, ভগবান্ যে আমাকে সুখরূপ ভূমার উপদেশ দিলেন, সেই ভূমার কোন আধার আছে অথবা সেই ভূমা নিরাধার। যদি সেই ভূমা কোন আধারে আনা যায়, তাহা হইলে তাহা ঘটাদি পদার্থের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন হইবে। আর সেই ভূমাকে যদি নিরাধারে আনা যায়, তবে সেই নিরাধার 'ভূমা' আমার বুদ্ধিতে কিরূপে আরূঢ় হইবে? এই প্রকার চিন্তা করিয়া নারদ সনৎকুমারকে প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবন্, সেই সুখরূপ 'ভূমা' কোন আধারে স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন, সেই আধার

আমাকে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন হে নারদ, তুমি যে সেই ভূমার আধার জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা ব্যবহারোপযোগী অথবা বাস্তবিক আধার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ? তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নকে যদি তুমি অঙ্গীকার কর, তবে মায়া আদি এই সর্ব্ব প্রপঞ্চ সেই ভূমার বিভূতি। সেই বিভূতি রূপ মহিমাতেই 'ভূমা' স্থির হ'ন। ইহা দেবীসুক্তে শেষ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য তাহার ভাষ্যে কহিয়াছেন, "এতদুপলক্ষিতাৎ সর্ব্বস্মাৎ বিকারজাতাৎ পরস্তাৎ বর্ত্তমানা অসঙ্গোদাসীন কুটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য রূপাহং মহিম্না বেতাবতী সম্বভুব।" সুতরাং সেই বিভূতি রূপ মহিমাই সেই ভূমার আধার।

হে ভগবন্, ইহলোকে সেই বিভূতি রূপ মহিমার এবং সেই বিশিষ্টের পরস্পর ভেদই লক্ষিত হয়; এবং সেই 'ভূমা' ঘটাদির ন্যায় বস্তু পরিচ্ছেদ সম্পন্ন হইবে; সুতরাং অনিত্য। হে নারদ, যেরূপ ইহলোকে দেবদত্ত নামক পুরুষের গো, অশ্ব, হস্তি, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা, ক্ষেত্র, গৃহ ইত্যাদি যে বিভূতি আছে, সেই বিভূতি রূপ মহিমা যেরূপ সেই দেবদত্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন হইয়া প্রতীত হয়; আর সেই দেবদত্ত নামক পুরুষের সেই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি আশ্রিত হইয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ এখানে সেই মায়া সহিত প্রপঞ্চ রূপ মহিমা সেই সুখরূপ ভূমা হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু সেই মহিমা সেই 'ভূমা' হইতে অভিন্ন। সুতরাং সেই 'ভূমা' বিষয়ে ভেদরূপ বস্তু পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে না। হে ভগবন্, যদি কদাচিৎ সেই মহিমা 'ভূমা' হইতে অভিন্ন হয়, তবে সেই মহিমার ও ভূমার আধার ও আধেয় ভাব থাকিবে না। কারণ ইহলোকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থেরই আধার ও আধেয় ভাব হয়। হে নারদ, যেরূপ 'স্বয়ং দাসস্তপস্বিনঃ'' অর্থাৎ তপস্বী পুরুষ নিজেই নিজের দাস। এস্থলে একই তপস্বী বিষয়ে স্বামী ও দাস ভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সুখরূপ ভূমার সর্ব্ব পরিচ্ছেদ রহিত যে আপনার স্বরূপ, সেই আপনার স্বরূপই সেই ভূমার মহিমা। সেই স্বরূপ ভূত মহিমাতে সেই 'ভূমা' ব্যবহার দৃষ্টি অনুসারে স্থিত হ'ন। পরন্তু সেই ভূমার বাস্তবিক কোন আধার আছে; এই দ্বিতীয় পক্ষ যদি তুমি অঙ্গীকার কর, তাহা সম্ভব নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত মহিমার স্বরূপ (স্বরূপ ভূত মহিমা) হইতে ভিন্ন পদার্থ বিষয়ে তো সেই 'ভূমা' কখনই থাকিতে পারে না। স্বরূপ ভূত মহিমাতে যদি এই ভূমার স্থিতি কথন করা যায়, তাহাও ব্যবস্থার দৃষ্টি লইয়া বলিতে হইবে। সেই ব্যবহার দৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে, সেই 'ভূমা' আধার রহিত নিরাধার বলিয়া কথিত হইবে। এক্ষণে সেই নিরাধার ভূমা কি প্রকারে বুদ্ধিতে আরূঢ় হইবে, তাহা নারদের

শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য প্রথমে সেই ভূমাকে তৎপদার্থরূপে বর্ণিত হইবে। হে নারদ, সেই তৎপদার্থরূপ ভূমাই দশ দিকে এবং তিন কালে স্থিত হন। আর যেরূপ নির্ম্মল আকাশে 'গন্ধর্ব্ব নগর' কল্পিত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব ভেদ রহিত এই 'ভূমা' বিষয়ে দেশ, কাল, দিক, আদি সর্ব্ব স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ কল্পিত (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র (কাশীধাম)।

মোক্ষ]

প্রণব-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা গতবারে সামান্য ভাবে প্রণবের 'ধনু'রূপ ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি যে, যখন জীব সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা-ভাবে সমস্ত জগদ্বস্তুকে বুঝিতে চায়, তখন 'সর্ব্ব' বস্তুই সার্ব্বজনীন জ্ঞানের ভিতর দিয়া 'সর্ব্বাত্মতা' ভাবে পরমাত্মা বা শ্রীভগবানকেই লক্ষিত করিতে পারে। 'সার্ব্বজনীনতা' ও 'সর্ব্বাত্মতার' প্রভেদটী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সার্ব্বজনীন জ্ঞান অনেক প্রকারে জগতে বিকীর্ণ হইতেছে। এখন আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই 'বস্তু' ও শক্তির প্রকাশ গুলিকে বিশেষ ভাবে দেখিয়া ক্ষান্ত হয়েন না, পরন্তু তাঁহারা ঐ সকল ব্যাপারের মূলে যে একটী সার্ব্বজনীন নিয়ম আছে, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পান। কিন্তু আমাদের জ্ঞান যে সর্ব্বাত্মতা ভাবে উপনীত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক বিষয়ে আমরা সার্ব্বজনীন নিয়ম বা বিধি সকল দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ঐ বিধি বা নিয়ম যে 'আত্ম' ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহা প্রায়ই মানব বুঝিতে পারে না। আপাততঃ ভাবান্তর বলিয়া মনে হইলেও আমরা বর্ত্তমানে দুই একটী উদাহরণ দ্বারা সার্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বাত্মতার প্রভেদ বুঝিতে চেষ্টা করিব; তাহা হইলে বোধ হয় প্রণবের 'পরাগতিরূপ ভাব' হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

প্রথম উদাহরণটী আমরা প্রেততত্ত্ব হইতে লইব। স্থূলদেহ নাশের পর মানব বাস্তবিক মরিয়া যায় না, এবং মৃত্যুর পরও তাহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম-তর ক্রমাভিব্যক্তি হইতে থাকে; ইহা লইয়াই 'প্রেততত্ত্ব'। পাশ্চাত্য জগতে, এমন কি আমাদের দেশেও এমন দিন আসিয়াছিল, যে অনেকে জীবের এই গতি সম্বন্ধে সন্দিহান হ'ন। এক্ষণে মানবের মৃত্যুর স্বরূপ ও মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম

ও সূক্ষ্মতর ভাবে অবস্থিতি, এবং তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পরিজ্ঞাত হইলে, সেই 'সার্ব্বজনীন' জ্ঞানের ফলে আমাদের স্থূল জীবন একটু আশাপ্রদ হইতে পারে বটে। 'প্রেত' বিজ্ঞানের ফলে আমরা অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে পারি সত্য, কিন্তু ঐ জ্ঞানের সহিত শ্রীভগবানের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। উহাতে শ্রীভগবানের স্থানও নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই জীবের এই সূক্ষ্মগতি সম্পন্ন হয়, ভগবান থাকুন বা না থাকুন তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। ভগবদ্ভক্তির সাহায্যে হয়ত এই বিজ্ঞান সহজে লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানকে না মানিলেও যে তাহা হয় না, একথা বলা যায় না। 'প্রেততত্ত্ব'-বাদীরা প্রায়ই সূক্ষ্ম ভাবে স্থিত 'আমি'র সূক্ষ্মগতি দেখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। ইহা 'সার্ব্বজনীন' জ্ঞানের স্তর, এবং এই ভাবেই আজকাল অনেকে ধর্ম্মালোচনা করেন।

আর্য্যশাস্ত্রের গতি অন্য প্রকার। আর্য্যশাস্ত্র হয়ত দেহীর অবিনশ্বরত্ব প্রভৃতির উপদেশ দেন কিন্তু ঐরূপ সূক্ষ্ম ও সার্ব্বজনীন তত্ত্বের উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি কেবল জীবকে ভেদ ভাব আশ্বাস দিবার জন্য নহে। "দেহীনস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ——" একথা যখন গীতা উপদেশ দেন তখন হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এতদ্দ্বারা পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্বের সমর্থনই করা হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে "ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি" শব্দে শ্রীভগবান এই 'সার্ব্বজনীন' জ্ঞানের ভিতর দিয়া বুদ্ধির 'একাধিকরণে অবস্থান' খেলার ভাষা শিক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহার মতে 'জীব মৃত্যুর পরও পুনরায় জন্মায়, এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, যখন মৃত্যু কিছুই নহে, তখন ইচ্ছামত ভেদবুদ্ধির সাহায্যে অহঙ্কারের বশে হাসিয়া খেলিয়া লও জীবকে একটা মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বাহ্য ও স্থূল ভাবে অবস্থিত জীবন ব্যাপারটী যে সূক্ষ্মতর জীবভাবেরই বিকাশ ও ঐ জীবভাবে স্থূল মানবের সমস্ত কর্ম্ম ইচ্ছা প্রযত্ন সকল নিঃশেষে মিশিয়া যায়, এই চঞ্চল জীবন ব্যাপারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, স্থূলাতীত, বৃত্তির অতিগ, অচল প্রতিষ্ঠ তত্ত্বের আভাষ দিলেন, তিনি ত' দেহাত্মবুদ্ধির স্থাপনা করিলেন না। প্রেততত্ত্ববাদ্ রামের মতে 'আমি রাম' মৃত্যুর পরপারেও রাম' থাকিব, এই বুদ্ধি আছে। তাহার আমি সূক্ষ্ম লোকে যাইতেছে সত্য বটে, কিন্তু উহা ক্ষণিক 'আমি রাম' এই বুদ্ধির সাহায্যে। 'আমি রাম' এই জ্ঞানটীও যে থাকিবেনা, এবং তৎপরিবর্ত্তে যে এক মহত্তর, অনন্ত 'রাম' 'শ্যাম' আদি ব্যক্ত ভাবের সমন্বয়কারী

'আমিটী' থাকিবে, ইহা মনে করিতে গেলে রাম শিহরিয়া উঠে। সেইজন্য আমাদের দেশেও অনেক প্রেত-তত্ত্ববিদেরা মৃত্যুর পর 'রাম' থাকিবে, এইটুকু স্বীকার করেন; কিন্তু পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে ভয় পান। "তথা দেহান্তর প্রাপ্তি" এই শব্দে ভগবান বুঝাইয়া দিলেন যে 'রাম' 'শ্যাম' প্রভৃতি ব্যক্ত জীবগুলি প্রকৃত 'আমি' নহে; উহা 'আমির' এক জীবনের প্রকাশ। শুধু তাহাই নহে, 'সর্ব্ব'দেহে, 'সর্ব্ব'জীবেই যে ভগবানই একমাত্র 'আমি', ইহাই দেখাইবার জন্য শাস্ত্র জন্মান্তরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিত জীবের অবতারণা করিলেন। যেমন 'কলেজ ষ্ট্রীট' এই নাম লেখা কাষ্ঠফলক খানি, কাষ্ঠফলকত্ব দেখাইবার জন্য নহে; কিন্তু তাহা হইতে অতিগ মহত্তর ও কাষ্ঠফলকের অনেক উর্দ্ধে স্থিত রাস্তাটীকে দেখাইবার জন্যই আছে,—তদ্রূপ গীতার শ্লোকে 'রাম' 'শ্যাম' প্রভৃতি ব্যক্ত ভাবগুলিকে দেখায় না। তদতীত জীব এবং পরে শ্রীভগবানকে দেখাইবার জন্যই ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রেত-তত্ত্ববিৎ, 'রাম'রূপ বিশিষ্ট ভাবটীকে সংরক্ষণের জন্য, প্রেততত্ত্ব লইয়া আছেন; সেইজন্য রাম-ভাবে প্রেতের আত্মীয় বন্ধু রামের ক্ষুদ্র মনের গতি ও এমন কি তাহার পোযাক পরিচ্ছদও কল্পিত করিয়া দেখেন। তিনি সূক্ষ্ম লোকগুলিকেও স্থূলের ভাবে রঞ্জিত করিয়া বুঝেন। স্থূল ভাবটী যে সত্য, এইটী তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস; সেইজন্য প্রেতলোকে বিবাহ ও সন্তানাদি উৎপত্তি পর্য্যন্তও দেখিতে ছাড়েন না। প্রেত তত্ত্ববিদের ভাষা সার্ব্বজনীন ভাবে থাকিলেও, ঐ সার্ব্বজনীন জ্ঞানটী অনিত্য দেহাত্মজ্ঞান ও স্থূল বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রের গতি অন্যরূপ, শাস্ত্র স্থূলের ভাষায় 'আত্মা' বা 'ভগবানের' ব্যঞ্জনা করেন না; ভগবানের ভাষায় স্থূলকে দেখিতে শিখায়; কারণ উহা সর্ব্বাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত। তালগাছ হইতে একটী তাল পড়িল; যিনি এই পতন ব্যাপারটীতে তালরূপ বিশিষ্ট ভাবের প্রতিপত্তি দেখেন, তাঁহার স্থূলাতীত ও সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তিরূপ মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের জ্ঞান হইবে না। কিন্তু যিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি শুধু 'তাল' কেন, সমগ্র জগদ্‌বস্তুর ভিতর দিয়া জগদ্রূপ আধারের দিকে যে নিত্য আকর্ষণ শক্তি রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, গ্রহ নক্ষত্র ক্ষেত্রেও সেই শক্তির খেলা দেখিতে পান; পরে আত্মাই যে আধার, ইহা বুঝিতে পারিয়া 'সর্ব্ব' জগদ্‌বস্তুর আত্মাভিমুখিনী প্রবৃত্তির ইঙ্গিত— সামান্য 'তাল পড়া' ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারেন। সার্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বাত্মতার ইহাই প্রভেদ।

প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, 'সর্ব্ব' 'আত্মা'ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে,'সর্ব্বের' ভিতর দিয়া একটী বিশেষ অদ্বিতীয় সত্ত্বা বা শক্তির বোধ না ফুটিলে, সার্ব্বজনীনতাও সিদ্ধ হয় না। আজ একটী 'তাল' পড়িতে দেখিয়া, কাল যে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সকলই পড়িতে পারে, এ বোধ উৎপন্ন হইতে গেলে, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বিশিষ্ট নামরূপের অতীত সত্ত্বা বা শক্তির উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক। এইরূপ ব্যক্তের অতীত একত্বের উপলব্ধি না হইলে, আমরা ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট ঘটনাগুলিকে সমানাধিকরণে আনিয়া 'নিয়ম' প্রভৃতির পরিজ্ঞান করিতে পারিতাম না। এই সর্ব্বাত্মতা বুদ্ধির বিকাশ হয় না বলিয়া, আমরা সংসারে এত ভুগিয়াও কাম, লোভ প্রভৃতির সার্ব্বজনীন নিয়মগুলি বুঝিতে পারি না। এক জন কামের শক্তির মধ্যে পড়িয়া কিরূপে সেই আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও আমরা কামের খেলা বা গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না ; এবং সেইজন্য নিজে এত দেখিয়াও সেই গর্ত্তে নিপতিত হই। শুধু তাহাই নহে, এক জন্মে অবৈধ প্রেমে পতিত হইয়া যে দুঃখ, মনকষ্ট ও মোহরূপ ফল অর্জ্জন করি, তাহা যে বিশিষ্ট ভেদ ভাবে অবস্থিত 'আমিটীর' আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ তৃষ্ণার ফল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, অন্য জন্মে পুনরায় সেই প্রকার মোহে পতিত হই। বালক যেরূপ ভূমে পতিত হইলে, সেই ব্যাপারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির খেলা বুঝিতে না পারিয়া, পতন ব্যাপারটীতে 'পৃথিবীর দ্বেষভাব' আরোপ করিয়া পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া তৃপ্ত হয়, আমরাও জীবনের সুখ দুঃখ ব্যাপারে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতির কর্ত্তব্য আরোপ করিয়া আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মগুলির কথা ভুলিয়া যাই। আমার দুঃখের যে আমিই কারণ,—আমার মোহ, ভেদবুদ্ধি ও তৃষ্ণাই যে আমার দুঃখের একমাত্র হেতু, তাহা না বুঝিয়া 'রাম' 'শ্যাম' প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া মনে করি।

'সকল' নিয়ম, সকল ভাব ও কর্ম্ম যে আত্মগত, ইহা বুঝিতে না পারায় 'সার্ব্বজনীন' নিয়মেরও পরিজ্ঞান হয় না। 'সর্ব্ব' ব্যাপারের মধ্যে "আত্মা" বা "আমির" খেলা দেখাই সর্ব্বাত্মতার চিহ্ন। আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে কর এমন একটী মানব আছে যে, 'আমিকে' দেখিতে পায় না ; যাহার 'অহম্‌প্রত্যয়-গম্য' দেহাদির অতীত পদার্থের বোধ নাই ; কিন্তু মন বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তিগুলি আছে ও এমন কি সার্ব্বজনীন বুদ্ধিও আছে। সে অসুস্থ হইয়া পড়িল, আপনি তাহার সেবা করিলেন। আপনার সেবাদি কার্য্য হইতে তাহার কি জ্ঞান লাভ হইল, একবার ভাবিয়া

দেখুন। আপনি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন, তাহার শারীরিক যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হইল। সে ভাবিল মানব শরীরের এইরূপ স্বভাব বা প্রকৃতি, যে উহা আপনা আপনি কাতর ব্যক্তির গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়। সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল, আপনি আহার্য্য আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন ; সে ভাবিল, মানবের হস্ত বা অবয়বের এমন একটী স্বাভাবিক গুণ আছে, যদ্দ্বারা ক্ষুধার্ত্তের মুখে আপনা আপনি অন্ন উত্থিত হয়। তাহার নিয়মের পরিজ্ঞান হইল বটে, কিন্তু সেই সার্ব্বজনীন নিয়মের মধ্যে যে আত্মার ভাব আছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। আমাদেরও অবস্থা বড় বেশী বিভিন্ন নহে। আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কতকগুলি খাইয়া ফেলিলাম, ভাল পরিপাক হইল না, এই ব্যাপারে কি আমরা আত্মার বৈশ্বানর-অগ্নি-রূপে ভুক্ত অন্নের পরিপাক শক্তি দেখিতে পাইলাম ? আমরা দেখিলাম ঐ বস্তুটী বড় খারাপ বা খাওয়া উচিত নয় ; অথবা দেখিলাম আমার পরিপাক শক্তিটী আর তেমন প্রখর নহে। মোটামুটী নিয়মের পরিজ্ঞান হইল বটে, কিন্তু আত্মাকে ত' দেখিতে পাইলাম না। একবারও ভাবিলাম না যে জঠরাগ্নির খেলার মধ্য দিয়া সেই পূর্ণস্বরূপ শ্রীভগবানই খেলিতেছেন ; বুঝিলাম না যে কি আশ্চর্য্য কৌশলে সেই জড়-শক্তি সমন্বিত স্থূল অন্ন পরিপাক হইয়া, আমার 'আমি' রূপ চৈতন্যের অভিব্যক্তির উপযুক্ত হইয়া গেল ও কিরূপে সেই অনাত্ম অন্ন হইতে আমার 'আমি' ভাবটী সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। একবার সংশয়ও উদয় হইল না যে, স্থূল অন্নে কোন অপরিজ্ঞাত উপায়ে যদি 'আমির' ভাব নিহিত না থাকিত, তবে তদ্দ্বারা আমার বিশিষ্ট 'আমির' প্রতিষ্ঠা হইত না। একবার ভাবিলাম না যে পরিপাক শক্তিটির কি মহিমা ও উহা কত বড় ও কিরূপ চৈতন্যঘন। বিভিন্ন মানব এই অন্ন পরিগ্রহণ করিলেও তাহারা ত' ইচ্ছা করিয়া ও বুদ্ধি পূর্ব্বক ভুক্তান্ন হইতে আপন আপন উপযোগী 'আমি' ভাব সংগ্রহ করে না। অথচ কে সে, চৈতন্যময় প্রেমময়, শক্তিরূপে অবস্থিত আছেন, যিনি—কি আশ্চর্য্য বিবেক ও বুদ্ধির সাহায্যে একই জাতীয় ভুক্তান্ন হইতে কি কৌশলে বিভিন্ন জীবের উপযোগী 'আমি' ভাব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরিপুষ্টি সাধনা করিতেছেন। তাহা বুঝিলে কি অখাদ্য গ্রহণ, ও ক্ষুদ্র অহংকারে ব্যবস্থিত হইয়া আহার ও আহার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলি লঙ্ঘন করিতে চাহিতাম।

এইরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, চক্ষু, কর্ণ, মন প্রভৃতির বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাদের 'সার্ব্বজনীন' বিষয়গুলি বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞানে

চিদানন্দ-ঘন আত্মা বা ভগবানের খেলা দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া, জ্ঞানটী 'সার্ব্বজনীন' হইলেও সর্ব্বাত্মক নহে। হিন্দু শাস্ত্রের মহিমা এই যে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বগুলি এমন করিয়া বর্ণিত হয় যে, তদ্দ্বারা 'পুরুষ' বা আত্মবুদ্ধি জাগিয়া উঠে। এমন কি সাংখ্যের প্রকৃতিও এই 'সর্ব্বাত্মতা' ভাবে ক্রিয়াশীল। উহাতে সার্ব্বজনীন নিয়ম বা তত্ত্ব সকল আছে বটে, কিন্তু উহার গতি শুধু সার্ব্বজনীনতার জন্য নহে। উহা 'পুরুষ' বুদ্ধি ও পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য খেলিতেছে। সার্ব্বজনীন ভাব হইতে 'তুরীয় বা 'পুরুষ' বুদ্ধি উৎপন্ন করে বলিয়া, প্রণব-তত্ত্বটীতে আচার্য্য এক পরাগতি বা 'অ'-'উ'-'ম' প্রভৃতি তিনটী মাত্রা ও পদের অতিগ পদার্থের উপপত্তি দেখিবার জন্য বলিলেন, ছিন্ন 'অ'-'উ'-'ম' বুঝিলে প্রণব জ্ঞান হয় না। প্রিয়জনের হস্ত পদাদির সাহায্যে ক্রিয়াগুলি যেমন তাহার ভিতরের প্রেমের অভিব্যক্তি মাত্র এবং অনন্ত ভাবে প্রকাশিত হইলেও তদ্দ্বারা আমরা প্রিয়জনেরই সত্ত্বা ও তাহার প্রেমই বুঝিতে পারি, ——— প্রিয়জনের যে কোন অঙ্গ স্পর্শ—যে কোন বাক্য প্রয়োগ, যে কোন মনোভিলাষ হউক না কেন, তাহার মান ও গতি যেরূপ প্রিয়জনের জন্য ও তাহার স্বরূপ অভিব্যক্তির নিমিত্ত বলিয়া বুঝিয়া লই, সেইরূপ পত্নীর পতি-প্রেমে, পিতামাতার বাৎসল্যে, অপত্যের প্রতি অপত্যস্নেহে, এই সকল ব্যাপারেই উপনিষদ আমাদিগকে সেই পরম প্রিয়তম, চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবানের এক ও অদ্বিতীয় ব্যঞ্জনা দেখিতে উপদেশ দেন। ইহা যে তত্ত্ব ও পরাগতি ইঙ্গিত করে, তাহা বুঝাইবার জন্য বলা হইল যে "অ"টী অবিচ্ছিন্ন ভাবে "উ"এতে মিশিয়া, পরে সবটী "ম"রূপ ভাবে অন্তর্মুখী হইয়া ব্যক্ত শব্দের বা প্রকাশের অতীত তুরীয়' অর্দ্ধ মাত্রায় মিশিয়া যাইতেছে। এই শাশ্বত ও নিত্য প্রবৃত্তিই ত' প্রণবের গতি। তাই আচার্য্য বলিলেন,—"ত্রয়ানাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবিলাপনেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতে করণসাধনঃ পাদশব্দঃ; তুরীয়স্য তু পদ্যতে ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদ শব্দঃ।" বিশ্বাদি তিনটী সর্ব্বাত্মক ভাব যে মহাগতিতে পড়িয়া এক একটী করিয়া লীন হইয়া সেই 'তুরীয়' ও নিষ্কল, 'সর্ব্বের' অতিগ ভাবের ব্যঞ্জনা করে, তাহাই 'প্রণব-ধনুর' আশ্চর্য্য শক্তি।"

আচার্য্যের উক্তিতে দুইটী স্তর নির্দ্দেশিত হইল; প্রথমটী 'করণ'-সাধন, দ্বিতীয়টী 'কর্ম্ম'-সাধন। এই দুইটী আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু দুইটীর মধ্যেই যে এক তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে আলোচনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেই পরম তত্ত্বটীকে ভগবৎ-নিষ্ঠা ভগবৎ-বুদ্ধি বা পরাভিসারিণী

প্রবৃত্তি বলে। যতক্ষণ আমাদের চিত্ত বিশিষ্ট 'আমি' ও বিশিষ্ট বস্তু ভাবে সন্তুষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ আমরা 'অ'-'উ'-'ম' জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি,—অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, এই তিনের বিকাশগুলিকে কথনই এক করিতে পারিব না। যাহা দ্বারা এই একীকরণ ভাবটী সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত বুদ্ধি। যে স্ত্রীলোক স্বামীর ভিতরে কি এক 'পরম বিশেষ' ভাবের ছায়া দেখিতে পাইয়াছে ও যাহার প্রাণও সেই বিশেষ অথচ 'পর' ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, সে বিভিন্নভাবে নামরূপে অবস্থিত—পরিধেয়, বস্ত্র, পাদুকা, প্রভৃতি সামান্য বস্তুগুলি হইতেও এক স্বামী ভাবের পরিপুষ্টি,—ঐ সকল ভাবে স্বামীরূপে এক অধিকরণে পরিসমাপ্তি দেখিতে পায়। কিন্তু যতদিন সে বুদ্ধি হৃদয়ে না জাগে, ততদিন কষ্ট কল্পনা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলিকে এক করিতে পারা যায় না। সাবিত্রী দেবী মৃত্যু, যম, প্রভৃতি বিভিন্ন বাহ্য ভাবগুলিকে স্বামীরূপে মিশাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, যমও তাঁহার নিকট পরাভূত। যাঁহার এই প্রকার বুদ্ধি এখনও জন্মে নাই, তিনি যেন প্রণব 'উৎ চারণে' চেষ্টা না করেন। তিনি মাত্রাগুলিকে বিভিন্ন দেখিয়া মৃত্যু হইতে মৃত্যুই প্রাপ্ত হন।

"তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমতাঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ॥"

অর্থাৎ 'অ'কার 'উ'কার, 'ম'কার এই তিন মাত্রা গুলিকে পৃথক ভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার করিলে, তদ্দ্বারা বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুর প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। 'সমম অঞ্চতি ইতি সম্যক্'—সম বা ঘন একরস ভাবে প্রয়োগকে সম্যক্ প্রয়োগ বলে। এইরূপ সম্যক্ ভাবে প্রয়োগ করিলে, বাহ্য, অভ্যন্তর ও মধ্যম বা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি স্থান, ও তাহার আশ্রয়রূপ 'পুরুষ'ভাবে, যোগ-ক্রিয়ার সাহায্যে, একই পুরুষের জন্য ব্যবহার করিলে, সেই তিনটী মাত্রা অন্যোন্যসক্ত বা পরস্পর সংযুক্ত ও ঘন হইয়া যায় এবং অনবিপ্রযুক্ত হয়। 'বিপ্রযুক্ত' শব্দে এক একটী বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন ভাবের প্রয়োগ বলে। জাগ্রত অবস্থার 'আমি' জ্ঞানকে সার করিয়া বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে, জাগ্রত ভাব বিশিষ্টরূপে সিদ্ধ হয়; কিন্তু তাহাতে সমরূপী ভাবটী আসিতে পারে না। কিন্তু যিনি সেই 'পর' ও 'পরম বিশেষ' ভগবানরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণবের গতিটী আরব্ধ করেন, তিনি এক কালেই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনটী ছিন্ন বিশেষভাবের মধ্য দিয়া সম অথচ পুরুষোত্তম পুরুষের ভাবে উপস্থাপিত হইয়া জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী ভাব অতিমক্র করেন। এইরূপ যোগী আর

কখনও কম্পিত হন না। যেমন একই স্বামী জ্ঞানে হস্ত পদাদি বিভিন্ন অঙ্গ, সুখ, দুঃখাদি বিভিন্ন ভোগ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা, ঘন হইয়া একরূপে মিশিয়া যায়, সেইরূপ যিনি আপনার চৈতন্যের খেলার ভিতর সেই পর (Transcendent) ব্যক্ত বিশিষ্ট খেলার অতীত অথচ সম ও একরূপ, অথচ 'পুরুষ' ভাবে অবস্থিত শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য মাত্রাগুলিকে প্রয়োগ করেন, তিনিই সেই 'পর' পুরুষকে পাইবার ইচ্ছা বা একমাত্র প্রযত্নে অনন্ত নামরূপাত্মক ভাবগুলিকে ঘন করিয়া মিশাইয়া দিয়া, ভিতরে ও বাহিরে সেই এককে দেখিতে পাইয়া তৃপ্ত হয়েন। সেইজন্য প্রণব 'ধনুতে' 'আত্মা' বা 'আমিকে' শররূপে বসাইয়া, সেই এক পরম পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে, একই প্রযত্নে ছিন্ন 'সর্ব্ব' 'বহু'জ্ঞান সর্ব্বাত্মিকা 'বিদ্যা'ভাবে "আমিতে" মিশিয়া গিয়া পরে, "আমিটী" পরম লক্ষ্যে উপনীত হয়।

গত বৎসর আমরা এই 'একই প্রযত্নে' বহুগুলি মিশাইবার কথা বুঝিবার জন্য পরম করুণাময় ঋষিগণের রচিত পুরাণশাস্ত্র হইতে অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ ও ত্রিপুর-নাশ নামক দুইটী দৃষ্টান্ত লইয়াছিলাম। এখানে সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলে বোধ হয় উপকারই সাধিত হইবে।

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ আখ্যায়িকায় কি আশ্চর্য্য কৌশলে শাস্ত্র আত্মাকে শর করিয়া প্রণব ধনু হইতে ভগবানরূপ এক লক্ষ্যের দিকে প্রয়োগের রহস্যটী কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত করিলেন!! পুর-দাহন ব্যাপারে কিরূপে ভগবানকে লক্ষ্য না করিলে একই প্রযত্নে, নাম রূপাত্মক বিশ্বের প্রবিলাপন সাধিত করিতে পারা যায় না, তাহাই বিশিষ্ট রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আগামীবারে এই কথাগুলি পুনরায় বুঝিবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

কাম]

মিশামিশি।

হাসিয়া হাসিয়া চলেছে ওই যে তটিনী কাহার তরে ?
সে কি জানে কোন্ দেশে কোন্ টানে বাঁধে সে জীবন ভ'রে ?
চঞ্চল অই অঞ্চল নাচি মৃদুল মধুর বায় ;
কাঁপায়ে প্রকৃতি আকৃতি মধুর কোথায় চলিয়া যায়।
মৃদু ফুলদল বহি' পরিমল মধুর মোহন ছাঁদে,
কাহার কীর্ত্তি বিথারে নিয়ত অলস-আবেশ ফাঁদে ?

নীল অম্বর সম্বরি আধ, আধেক খুলিয়া শোভা,
কা'র হৃদিতলে দিতে উপহার অমল-হৃদয়-লোভা ?
নামিয়া, ভাসিয়া, লুকায়ে র'য়েছে অনন্ত সাগর তলে ;
ওই যে উজল জ্যোতিটী জিনিয়া জোনাকি জাগিয়া জ্বলে।
চাঁদিমার চির নব সভাসদে কেন সে প্রকাশে নভ',
মধুর আঁখিরে নাচিয়া আবেগ জড়িত কি গান নব ?
তুলে অনন্ত নীলিম প্রান্ত কাঁপায়ে মধুর তানে,
জাগায়ে জগতে কি নব তিয়াসা কি জানি কাহার পানে ?
আবেশ উৎসাহ 'সরবস'সাধা কাহার অপার ভিতে,
আপনা হারায়,—জান কি মানব ! জাগে কি সে ভাব চিতে ?
ভক্তির ধারা বহিয়া বহিয়া কাহার কোমল পায়,
শীতল বলিয়া আপনা ভুলিয়া শরণ মাগিতে চায় ?—
তোমাতে আমাতে মিলিবার তরে আভানে অবশ করি';
জাবে জীব মিলে অনন্ত নিখিলে অপরূপ রূপ ধরি।
নবীন নবীনে নব আঁখি কোণে কি মধু চাহনি খেলে,
আশায় অশ্রু মিলায় প্রকৃতি, পুরুষ নিরখে হেলে।
খ'ণে খ'ণে সিত সুষমা পাবন সরল শিশুর হাসি,
জননীর প্রাণে স্বর্গের বাণী আনিয়া, বেদনারাশি।
মুছায় মরতে,—পরতে পরতে হৃদয়ের শত আশা.
ভয়ে হয় সারা, সুখ দুঃখে হারা, ভাবের রহে না ভাষা।
অতীত অনন্তে, বিশ্ব অতীতে খেলিছে যে দিশিদিশি।
তাদেরো কি সেই অনুরাগ ভরা গূঢ়মত মিশামিশি ?

শ্রীশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ (ভট্টাচার্য্য)

কাম]

সহজ-যোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সম্পাদক মহাশয়,

আমরা গত বৎসর এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। যদি বলেন ফলাকাঙ্ক্ষা কেন ? সেটা কেবল আপনাদের কাগজের দায়ে। গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টি করিতে:না

পারিলে, কাগজ চলিবে না ও আমার হস্ত-কণ্ডুয়নের ক্ষেত্রটীও অপসৃত হইবে। তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। 'সহজ-যোগ' নাম-করণটী বড় সুবিধা জনক বলিয়া মনে হয় না। অনেকে মনে করিয়াছেন, যোগ-তত্ত্বগুলি এমন 'জল করিয়া' বুঝাইতে হইবে যে, আহারাদির পর আলবোলা সুন্দরীর অধর চুম্বনে, পান চিবাইতে চিবাইতে, অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায়, কোমল প্রকৃতির করস্পর্শে পরিতৃপ্ত-অঙ্গে, যদি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তা'র মর্ম্ম বুঝা না যায়, তবে আর সহজ-যোগ কোথায়? আরও কেহ ভাবেন যে, অপরাহ্নে আফিসের ফির্ত্তি বেলায়, রেল গাড়ীতে যাইবার সময়, দশ মিনিটেই প্রবন্ধটী পড়িয়া লইব, অমনি তত্ত্বগুলি হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যোগকে এত 'মোলায়েম' করিয়া আঁটীশূণ্য সন্দেশের ন্যায় (কলিকাতার সন্দেশে অনেক সময় বীজভাব বর্ত্তমান থাকে) পাঠককে গলাধঃকরণ করাইতে আমার ক্ষমতা নাই। আপনারা কেহ যদি আমাকে ইঙ্গিতে সে বিষয় বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে হয়ত' চেষ্টা করিতে পারি।

'সহজ-যোগ' শব্দ ব্যবহার করিবার প্রধান কারণ এই যে, গভীর রাত্রে সুষুপ্তির মধ্যে সহসা উচ্চারিত "বলহরি হরিবোল" শব্দের ন্যায় হিন্দু জাতির মহা-সুষুপ্তি সময়ে, অনেকে 'যোগ' শব্দটীকে 'বাঘ' করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যোগ শব্দে অনেকটা ব্রহ্মচর্য্য, কতকগুলি ভীষন মুদ্রা পোয়াটাক্ প্রাণায়াম, সেরখানেক্ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে মনের সঙ্গে কুস্তি, আর বাকীটা—সেইটাই বেশী,—গেরুয়া কাপড়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অন্ততঃ একটি রুদ্রাক্ষের মালা,—আর পাঠক মহাশয়ের চির-পরিচিত রবী বাবুর ভাষায় "কি জানি কিসের মত কোন্খানে চলে গেছে, কাহার প্রাণের কথা আধ প্রাণে বলে গেছে" গোচের "তোমরা এর তত্ত্ব বুঝিবে না" এই সুরে সম্মিত বাক্য-প্রয়োগ। গাঁজার কলকের আর পসার নাই; কারণ লোকে এখন আব্কারীর সমর্থনা বড় একটা 'প্রকাশ্য' ভাবে করিতে চাহে না।

আমরা সেরূপ ভাবে সহজ-যোগ—'চাঁচাছোলা' সরল-যোগ শিখিতে পারি নাই। আমরা 'সহজ' অর্থে চিত্তের স্বাভাবিক ভাব বুঝি। ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিলেন,—"যোগঃ সমাধিঃ স চ সার্ব্বভৌম চিত্তস্য ধর্ম্মঃ" (১।১) অর্থাৎ যোগ সমাধি ও উহা সকল ভূমিগত চিত্তের ধর্ম্ম। কাজেই দায়ে পড়িয়া 'চিত্ত' শব্দটি বুঝিতে হইতেছে। চিত্ত শব্দে আমরা চৈতন্যের মৌলিক ধর্ম্ম গ্রহণশীলতা বা প্রকাশশীলতা বুঝি, ইংরাজীতে ইহাকে—Receptivity or irrititabity of

conciousness বলে। আমাদের চৈতন্য ভিতর দিকেই হউক আর বাহির দিকেই, কিছু না কিছু প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। আর একটি কথা 'চিত্ত সর্ব্বার্থ'। চিত্ত সর্ব্ব' ভিন্ন ছিন্ন ও বিশিষ্ট লইয়া থাকিতে পারে না। "দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরোক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্।" (পা ৪।২৩)

আমাদের চৈতন্যের গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার খেলা, হয় অন্তর্মুখী হইয়া 'আমি' এই বোধগম্য পদার্থের দিকে যাইতে থাকে, নয় ত' বাহিরে আসিয়া সর্ব্বভাবে বস্তু, শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি প্রকাশ করে। এই বাহিরের প্রকাশটীকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলতারূপে অভিহিত করা হয়। 'প্রকাশ' প্রবৃত্তিকে 'প্রখ্যা' বা প্রকৃষ্ট খ্যাতি বা বিশেষ জ্ঞান বলে; যেমন আম্র দেখিয়া আমটি যে একটি 'টি" একটি বিশেষ বস্তু, এই বুদ্ধি বুঝায়। যাই একটি ভাব প্রকাশিত হয়, অমনি পাছে অন্যান্য বিশেষ ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে বিশেষের সংরক্ষণের জন্য তাহার সহিত অন্য 'সর্ব্ব' বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে; তৎপরে অন্য সর্ব্ব' বস্তুর সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া, বিশেষ ভাবটিকে স্থির করিয়া 'নঙ্গর করিয়া' রাখিতে একটী গতি প্রকাশিত হয়। সম্মোহন বিদ্যার ক্ষেত্রের একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা এই তিনটী গতি বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে করুন রামকে সম্মোহিত করিয়া বলা হইল 'তুমি স্ত্রীলোক'। রাম ত' সম্মোহিত; তাহার ভিতর তখন আর নানা ভাবে চিত্তবৃত্তির খেলা শান্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি সকলে প্রসুপ্ত; মন স্থির, 'আমি' ভাবটী মাত্র অস্পষ্ট ভাবে জাগিয়া আছে; এক কথায় তাহার চৈতন্য তখন 'আমি'তে উপরক্ত। 'আমি'টী যে কে বা কি, তাহা সে জানিতে পারে না। এই শান্ত নিস্তব্ধ-প্রায় চৈতন্য ক্ষেত্রে যাই 'স্ত্রী-বুদ্ধি' বা জ্ঞানটী প্রয়োগ করা হইল, অমনি রামের স্থির 'আমিটী' সেই ভাবে আপনাকে দেখিয়া ফেলিল। স্থির 'আমিতে' কি এক 'বিশেষ আমির' প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। কারণ 'আমি' বাস্তবিকই পরম বিশেষ পদার্থ;—উহার শেষ নাই। উহাকে কোন ছোটভাবে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না বলিয়াই, উহা বিগত-শেষ বা বিশেষ। সেইজন্য পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে স্ত্রীলোক এই সামান্য জ্ঞানটী লইয়া, 'আমিটী' তৃপ্ত হইতে পারিল না। পূর্ব্বে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট সংস্কার ছিল, তাহা জাগিয়া উঠিল; এবং তাহার বশে রাম আপনাকে বিশিষ্ট স্ত্রীলোক বা 'প্রভাবতী' নামে অবধারিত করিল। কিন্তু 'প্রভাবতী' এই বিশেষ নামটী গ্রহণ করিয়াই, তাহার চিত্ত ক্ষান্ত হইল না; কারণ তাহা হইলে

প্রকাশিত সর্ব্ব ভাবটী থাকে না। তাই সে 'প্রভাবতী' ভাবটীকে পিতা, মাতা, জাতি, আয়ু প্রভৃতি অনন্ত ভাবে বিন্যস্ত করিয়া দেখিতে চলিল। সামান্য স্ত্রীলোক ভাব হইতে 'প্রভাবতী' রূপ বিশিষ্ট খ্যাতি Idea উপলব্ধি চিত্তের প্রকাশাত্মক সত্ত্ব-গুণের কার্য্য।

বিশেষ প্রকাশ থাকিতে গেলে, তাহার নির্দ্দেশ চাই। যেমন ঘরের ভিতর একটী দ্রব্য পড়িয়া আছে, তাহা দেখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরটী, তাহার দেওয়াল ও সেই ঘরস্থিত অন্যান্য বস্তু ও সেই বস্তু সকলের সহিত পদার্থটীর নৈকট্য প্রভৃতি সম্বন্ধ নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিতে পারি না। বৃত্তের (circumference) সহিত প্রযুক্ত করিয়া দেখিবার শক্তির নাম প্র-বৃত্তি। কোন বস্তুর 'গুণ' বা 'স্বভাব' বলিতে গেলে অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কিত করিয়া সেই সম্পূর্ণ রাশি (relation) গুলির সমষ্টি করিয়া বুঝি ; যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, আলোক দান করিবার শক্তি, উষ্ণতাশক্তি, রং প্রভৃতি বাদ দিলে প্রাকৃতিক ভাষায় অগ্নির অগ্নিত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না ; তাহা বলিয়া অগ্নির অগ্নিত্ববাচক বিশেষ ভাব বা 'প্রখ্যা' নাই একথা বলা যায় না। শিশু অগ্নির দাহিকা প্রভৃতি ভাব হয়ত বুঝিতে পারে না ; কিন্তু অগ্নিটী যে একটী বিশিষ্ট বস্তু, এ জ্ঞান না থাকিলে সে কেন আগুন ধরিতে যাইবে? তাহার কোন এক প্রকার 'প্রখ্যা' আছে। হয়ত সে খ্যাতিটী অধিকাংশই ভ্রমাত্মক ; কিন্তু ঐ খ্যাতিটীকে স্থির করিয়া বুঝিতে গেলে কেন্দ্রের চারিদিকে বৃত্তের ন্যায়, অন্যান্য সকল বস্তুর সহিত সম্পর্কিত করিয়া না দেখিলে চলে না ; এই গতিটির নাম রজঃ গুণ। তারপর যখন অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কগুলি স্থির করা হইল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্ক রাশিকে এক করিয়া, তাহার মধ্যে প্রখ্যাটীকে বসাইয়া 'প্রখ্যা' বা স্থিতি-শীলতা সিদ্ধ করা হইল। সেইজন্য রামে 'তুমি স্ত্রীলোক' এই সামান্য বোধটী প্রয়োগ করিবার পর রামের 'আমি' সামান্য স্ত্রী বোধে তৃপ্ত না হইয়া তাহার সংস্কারের সাহায্যে আপনাকে প্রভাবতী-রূপ প্রখ্যা দ্বারা বিশেষিত করিয়া দেখিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলে আপনারই ভিতর হইতে প্রভাবতীর পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, বয়স ইত্যাদি সম্পর্ক-জ্ঞান সকলের সাহায্যে 'প্রভাবতী' রূপ প্রখ্যায় বিশেষ ক্ষেত্র বা বৃত্তভাবে উদ্ভাসিত করিল। তারপর তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সন্তানকে স্তন্য দান প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্ত ক্রিয়ার সাহায্যে 'প্রভাবতী' জ্ঞানটিকে স্থির করিবার চেষ্টা করিল। এই তিনটী গতিকে গুণ বলে।

'গুণ' শব্দে অনেকে একটা পদার্থ বুঝেন ; কেহ বা অহংজ্ঞানকে বদ্ধ করিবার

জড় রজ্জুর ন্যায় ভাবেন। কিন্তু চৈতন্য বিজ্ঞান বা যোগ-দর্শনে গুণ গুলিকে শীলতা বা প্রবণতা (tendency) বলিয়া বর্ণিত করা হয়। উহা বস্তুও নহে শক্তিও নহে। চৈতন্যের সর্ব্বাভিমুখী যে স্রোত আছে, উহা সেই স্রোতের বিভিন্ন ভাব মাত্র। মনে একটী ভাব প্রস্ফুরিত হইলে যে প্রবণতার প্রভাবে বিশিষ্ট বস্তু ভাব বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপে পরিণত হয়, যৎ সাহায্যে আমরা ক্রিয়া গুলির সহিত পুটিত করিয়া বস্তুর সত্তা স্থাপিত করি, তাহা তমোগুণ বা স্থিতিশীলতা। অধুনিক শাস্ত্র ব্যাখ্যয়িতৃগণের সে বিষয়ে যে কি পরিমাণে অধিকার জন্মিয়াছে, এই সকল সূক্ষ্ম ভাবের ব্যাখ্যানেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অনুষ্ঠান-বিবহিত ব্যক্তিগণ কেবল কথার শ্রাদ্ধ করিয়া বাক্য-বিন্যাস কৌশলে স্ব স্ব অনুভূতির অভাবটিকে আচ্ছাদিত করিতে চাহেন। আবার ইংরাজি শিক্ষিতগণ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অস্পষ্টালোকে হিন্দুদর্শনের তথ্য-গুলিকে কিম্ভূত কিমাকার দেখিয়া, কিম্ভূত-কিমাকার রূপেই তাহার স্থাপনা করিতে প্রয়াস করেন। তমোগুণে কেহবা আবরক ভাব, কেহবা জড় বস্তু সকল দেখিয়া থাকেন। সাংখ্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এই জাতির পণ্ডিত-গণ বিস্মৃত হয়েন যে, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষের সহিত সম্পর্ক-শূন্য পদার্থ নহে। পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষ কর্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিনি উপনীয়মানান্ সর্ব্ব ভাবানুপপন্নাননুপশ্যন্নদর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে।" অর্থাৎ কর্ত্তার স্বরূপ তিন গুণ, ও অকর্ত্তা পুরুষ যিনি চতুর্থ বা পরাভাবে অবস্থিত আছেন, সেই পুরুষ তুল্যাতুল্য (তুল্য+অতুল্য) জাতীয়। পুরুষ গুণ সকলের ক্রিয়ার সাক্ষী বা দ্রষ্টা, এবং তাহাতে সর্ব্বভাব সকল বা সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতি যেন মিশিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে, পুরুষের বুঝি সর্ব্ব-ভাবের অতীত, গুণত্রয়ের অতিগ ভাব নাই। অতএব বুঝা গেল যে গুণত্রয় ও পুরুষ উভয়ের ভিতর একটা সম-জাতীয়তা আছে; আবার আর এক ভাবে দেখিতে গেলে, পুরুষ গুণত্রয়ের অতিগ। আর এক কথা সর্ব্ববুদ্ধি না আসিলে, পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, প্রকৃতি যে পুরুষ হইতে একান্ত বিজাতীয় পদার্থ, তাহা বলা সাংখ্যেরও উদ্দেশ্য নহে। এই দুইটী ভাব একটু ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

'সর্ব্ব'-গ্রহণশীলতা প্রকৃতির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের ভিতর দিয়া অন্বেষণ করিলে আমরা দুই একটী বিস্ময়কর তথ্যে উপনীত হইতে পারিব। বাহ্য জগতের

অনন্ততা প্রত্যক্ষ্যগম্য। কিন্তু দেহ বা অবয়ব নির্ম্মাণ করিতে গেলে, সেই অনন্ত ভাবের অনুগুলিকে এমন করিয়া বিন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় যে, অনুগুলি অনন্ত ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাহাদিগের অভ্যন্তরে এক আশ্চর্য্য একাভিমুখী গতি থাকা চাই। চক্ষের অনু রূপ-ভাবে দেখে; কর্ণের অনু শব্দ-ভাবে শুনে; এইরূপে শরীর মধ্যস্থ অনন্ত অনুগুলি স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যতক্ষণ তাহাদের বাহিরের সহিত সম্পর্ক বা তদভিমুখী প্রবণতা থাকে, ততক্ষণ তাহারা আপন আপন পার্থক্যতা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারে। তাহারা যে শুধু স্থূল-ভাবে স্বজাতীয় ভাব সকল গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে পারে, এমত নহে; কর্ণের অনুগুলি যে কেবল স্থূল শব্দই শুনিতে পারে ইহা বলা যায় না। শব্দ তত্ত্বের সূক্ষ্ম ভাব সকলও তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে। এই প্রকাশের নাম (clairaudience) দূর-শ্রবণ। মনকে স্থির করিয়া ১০০মাইল দূরস্থ বন্ধুর বাক্য শ্রবণের জন্য কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রয়োগ কর, প্রথমে দেখিবে যে আপনা আপনি তোমার জীবনে শ্রুত স্থূল শব্দগুলি চিত্তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এমন কি তুমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তোমার জননী কি বলিয়াছিলেন, সেই শব্দটী পর্য্যন্ত পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে। যাঁহারা শব্দ-তত্ত্বের সাহায্যে জপাদি করেন, তাঁহারা জানেন যে প্রথমে মনস্থির করিবার পর কাণের কাছে যেন একটা হাট বসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই কোলাহলটীর নিবৃত্তি হওয়া চাই। তা'র পর শ্রবণেন্দ্রিয়কে যেভাবে প্রয়োগ করিবে, সেই ভাবের শব্দ ও ভাষা তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। সুতরাং বুঝা গেল যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র ও শক্তি 'সর্ব্ব' শব্দ গ্রহণের জন্য; কিন্তু ঐ গ্রহণ বা সর্ব্বাত্মিকা ভাব প্রকাশের শক্তি বাহিরের খেলায় তৃপ্ত না হইয়া অন্তর্ম্মুখী হইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক অনুর এই সর্ব্বাত্মিকা ভাবরাশি প্রাণশক্তি দ্বারা এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যে, সেই খেলার ফলে রাম সর্ব্বদাই 'আমি রাম' এই বোধে স্থির থাকিতে পারে। এইরূপে বিভিন্ন অসংখ্য অনুগুলি এক মহান্ শক্তির সাহায্যে আপন আপন স্বভাব ও ক্রিয়া ত্যাগ না করিয়া, এক মহান্ 'আমির' স্রোতে,—এক মহত্তর 'আমির' দিকে ছুটিতেছে। এই দেখ শরীর-তত্ত্বে প্রকৃতির পুরুষাভিমুখী খেলা। এই পুরুষাভিমুখী খেলার কতকগুলি স্তর আছে। বাহ্য প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গত প্রকৃতিতে মিশিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রিয় প্রকৃতির অনন্তত্ব প্রিয় ও সুখভাবমূলক কামে পরিসমাপ্ত হইতেছে। রূপ হিসাবে অগ্নিরও সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য আমাদের অবয়বী ভাবের বিরোধী; উহাতে 'আমির' সুখময় ভাব নষ্ট হয়। সেইজন্য জাতিগত কাম বা

instinct বশে পশু ও মানব অগ্নির রূপে আকৃষ্ট হইলেও, অগ্নির সমীপবর্ত্তী হইলে আপনা আপনি পিছাইয়া যায়। ঐ দেখ কাম ইন্দ্রিয়ের বিষয় গুলিকে কিরূপে আর একটু ঘন করিয়া, আর একটু অন্তমু'খী করিয়া পুরুষের দিকে লইয়া যাইতেছে। এই কাম শক্তিকেই ডারউইন্ জাতিগত-ভাব-সংরক্ষিণী (preservation of species) শক্তিনামে বিজ্ঞানের পোষাকে সজ্জিত করিয়াছেন। তিক্ত রস প্রিয় নহে, ইহা কামের ভাষা। কিন্তু শরীরে জ্বরাদি জন্মিলে তিক্ত রস ভালও লাগে—উপকারও হয়। মিষ্ট রস প্রিয় ও তিক্তের বিরোধী; কিন্তু কথনও কথনও মিষ্টরসে অজীর্ণতা আনয়ন করে। কামই যদি মানবের শেষ ভাষা হইত তাহা হইলে মানব তিক্ত বর্জ্জন করতঃ কেবল মিষ্ট রসাস্বাদনেই তৎপর হইত; যেমন অনেকে জ্ঞানের নামেই চমকিত হন্। মন বলিল যে তিক্ত রসটী জ্বর প্রভৃতি বিকারের সহিত মিলাইয়া উহার ব্যাধি নাশক বিশেষ ভাবটী দেখ ও জ্বরাধিকারে উহা প্রয়োগ করিও। মন তিক্তকে পরিত্যাগ করিল না; অন্য বস্তুর সহিত সঙ্কলিত করিয়া উহার উপকারিতা বুঝিতে পারিল। সুতরাং মনের সাহায্যে বাসনার প্রিয় ও অপ্রিয় এই উভয় ভাবের অনন্ত প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়া, সুক্ষ্মভাবে আর একটু পুরুষের অভিমুখী হইল। মনের অনন্ত বৃত্তি আছে। যে ধন উপার্জ্জনে বুদ্ধি স্থির করিয়াছে, সে সেই অনন্ত বৃত্তিগুলির মধ্যে যেগুলি তাহার উপকারী সেইগুলি বাছিয়া লইল। এইরূপে আমরা স্ব স্ব বুদ্ধির উপযোগী মনের অনন্ত বৃত্তিরাশিকে সুক্ষ্মভাবে পুরুষের অভিমুখী করিতেছি। তারপর বুদ্ধির একতানতা বা একাভিমুখী প্রবণতাটী একটী বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে মিশিয়া যাইতেছে; ইহাই অহঙ্কার। শুদ্ধ 'অহং'এর গতি লক্ষিত করে বলিয়াই, বুদ্ধির একাভিমুখী গতিটী যে কেবল একের জন্য নহে, সে 'একটী অহং-জাতীয়; এবং রাম 'আমি', 'শ্যাম আমি' প্রভৃতি অনেক রকমের বিশিষ্ট 'আমি' ভাব ফুটাইয়া অবশেষে 'আমিটী' যে এক, অথচ রাম, শ্যাম ভাবের অতীত, ইহাই দেখাইবার জন্য অহঙ্কার-তত্ত্ব। বালক রাঙ্গা বহি পাইয়া মনে করে এইটিই বুঝি একমাত্র বহি, আমরাও তদ্রূপ বিশিষ্ট 'আমিকে' দেখিয়া মনে করি 'আমিটী' রাম ভিন্ন কেহই নহে। তারপর বালক যেমন লেখা পড়া শিখিতে শিখিতে নানা প্রকারের নানা জাতীয় ও নানা ভাষায় লিখিত বহি সকল দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারে যে,'বহি' শব্দটী ব্যক্ত-নির্ব্বিশেষে একটি সূক্ষ্মতর জাতিরূপ পদার্থ; আমরাও তদ্রূপ জন্ম জন্মান্তরে বিভিন্ন 'আমির' খেলা করিয়া অবশেষে বুঝিতে পারি যে, বিশিষ্ট 'আমি' জ্ঞানটী

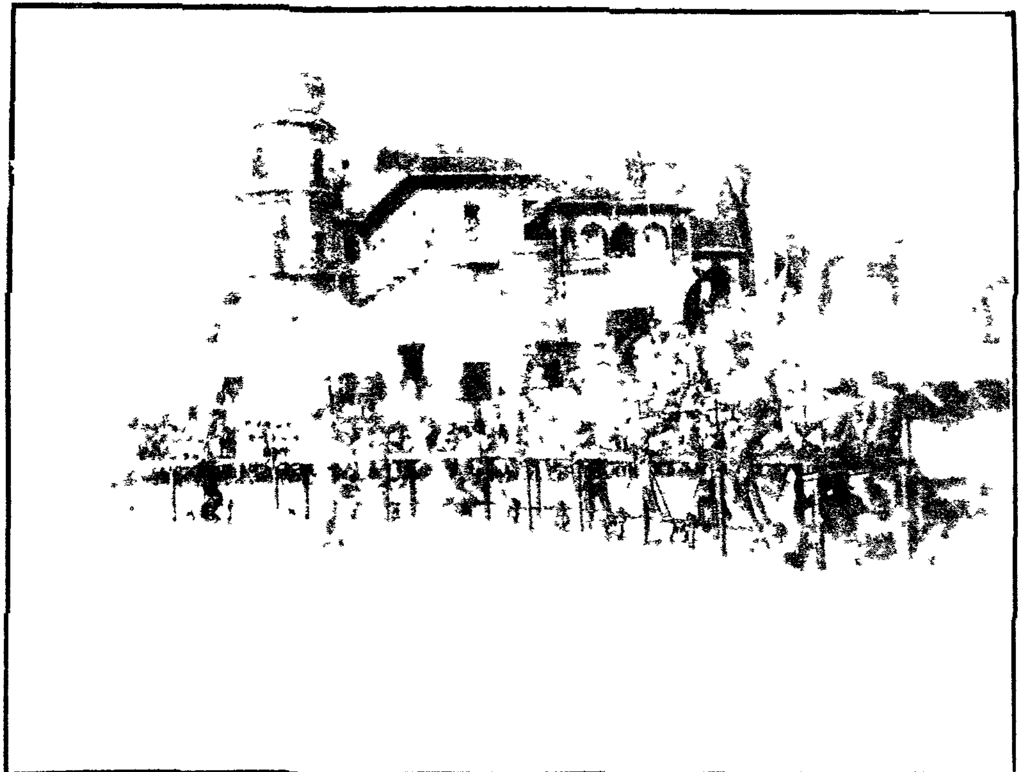
(Individuality) প্রকৃত 'আমির' ব্যক্ত ক্ষেত্রের প্রকাশের জন্য হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় একটা যন্ত্র মাত্র। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া Light on the Path নামক গ্রন্থ বলেন :—grasping his individuality firmly realises it to be but an instrument for grave experiment and experience which he has with pain created for his own use and through which he proposes to reach the life beyond individuality. আজ কাল এই কথাটী একটু বিশেষ ভাবে বুঝা আবশ্যক। কলির প্রতাপে ভক্তগণ ভেদভাবের অহং লইয়া ব্যস্ত; সে কালের 'গোবিন্দ অধিকারীর' যাত্রায় অধিকারী মহাশয় যেমন গুম্ফ-শ্মশ্রু বিভূষিত বদনে, দোদুল্যমান-কোঁচা পরিহিত বসনে বৃন্দা সাজিয়া —"রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং গচ্ছাম মথুরায় এ" বলেন তদ্রূপ ষোল আনার উপর আঠার আনা, ভেদজ্ঞান রাখিয়াই ভক্তগণ ভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় যোগদান করিতে বড়ই ব্যস্ত। অধিকারী মহাশয়ের প্রাণ ও ভাব ছিল, কাজেই লোকে তাঁহার বহিরাকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিত না; অথচ বৃন্দাবন চন্দ্রের মধুর লীলারসে নিমজ্জিত হইত। কিন্তু আধুনিক ভক্তগণের ভাবও নাই, রসও নাই; তাঁহারা ভগবানকে ভোগ করিবার জন্যই ব্যস্ত। অপর দিকে নবীন জ্ঞানীগণ 'অহং' শব্দে 'অহঙ্কার' বুঝিয়া 'সোহং' শব্দে বিশিষ্ট অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। যাহা হউক তত্ত্বগুলির সুক্ষ্ম ও সুক্ষ্মতর পরিণতি যে সেই এক 'অহং'এর জন্য; এ বিষয়ে ভুক্ত অন্নের পরিপাক ও পরিণতির দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিলে, কথাটা একটু বিশদ্‌ভাবে বোধগম্য হইতে পারে। ভুক্ত অন্ন প্রথমে স্থূল ভাবে পরিপাক হইয়া রসরূপে শরীরে থাকে। অন্নের যে অংশটুকু পরিপাক করা যাইল না, উহাই মল মূত্ররূপে নিঃসৃত হইয়া যায়। জ্ঞানের পরিণতিও ঐরূপ। স্থূলভাবে জ্ঞান হইতে রস বা কামনাতত্ত্ব জাগিয়া উঠে; এবং যতটুকু রসরূপে পরিণত না হইল, তাহাই বাহ্য জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তারপর স্থূলান্ন হইতে উদ্ভূত রস পরিপাক হইয়া মাংসরূপে স্থির ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানক্ষেত্রেও বাসনার অপরিণত অংশগুলি অহং জ্ঞানের আকার হইয়া রহিয়া যায়। রস সুক্ষ্মভাবে অস্থি ভাবে উঠিয়া যায়। এই অস্থিটীই আমাদের জ্ঞান ক্ষেত্রের প্রাকৃত রাম, শ্যাম আদি বোধ। তারপর মজ্জা (nervous matter) বা মনস্তত্ত্ব, পরে মেদ বা সর্ব্বভাবে অবস্থিত বুদ্ধিতত্ত্ব, সর্ব্বশেষে বীর্য্য বা 'অহং'এর আত্ম প্রকাশের শক্তি। অন্ন ক্রমে এই কয় প্রকারের পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

এইবার একটী দুরূহ তত্ত্বের অবতারণা করিব। সত্য বটে, সাধারণ জীবে

রস, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ, বীর্য্য,—বা আধ্যাত্মিকভাবে দেখিতে গেলে কাম, মন, বিশিষ্ট জীবভাব, বিশুদ্ধ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার তত্ত্বের ক্রম পরিণতি ও অভিব্যক্তি হইতে থাকে ; কিন্তু ঐ পরিণতি ত' স্পর্দ্ধার কথা নহে। ঐ পরিণতি আমাদের ভিতর আত্মা বা ভগবৎ ভাবের অভাবেরই সূচনা করে। যে যোগী আপনার স্থূল দেহ-ভাব সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে—শ্রীভগবানের বৈশ্বানর মূর্ত্তিতে মিলিত করিতে পারিয়াছেন, যে কি স্থূল কি আধ্যাত্মিক ভাবে 'ন পচন্তে আত্মকারণাৎ" শুধু বিশিষ্ট 'আমির' জন্য অন্ন পাক করেন না, যিনি এই প্রকার পরিপাক ব্যাপারে দেখিতে পান যে ভগবানেরই অহং, বৈশ্বানর রূপে প্রাণীগণের দেহে অবস্থিত থাকিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ স্থূল বা ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ রূপ আধ্যাত্মিক যজ্ঞফল "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বর"রূপে আপনি আহার করিতেছেন, তাঁহাকে আর ঐরূপ পরিণতির ভিতর দিয়া যাইতে হয় না। ঐ পরিণতিগুলিই ক্রমমুক্তির সোপান। সেইজন্য স্বেদ, মূত্র, মলাদি বিসর্গের স্বল্পতা ও শরীরের লঘুতা প্রভৃতি যোগীর যোগসাধনের প্রথম ফল বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি 'সর্ব্ব' ভাবটীকে আমরা সম্পূর্ণ হজম বা আত্মসাৎ করিতে পারি, যদি শরীর হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সকল ভাবেই পূর্ণ ভগবানকে দেখিতে পাই এবং ভগবৎ তত্ত্ব ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের উপলব্ধি না হয়,——যদি আমরা ছিন্ন তত্ত্বগুলিকে সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যারূপিনী মহামায়ার সাহায্যে বিদ্যাভাবে পরিণত করিতে পারি, এবং সর্ব্বাত্মিকা দেবী যে কেবল ভগবানের ব্যঞ্জনার জন্য খেলেন ইহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে চিত্তের সর্ব্বার্থতা ধর্ম্ম, সর্ব্ব ব্যাপারেই সেই পরমার্থ ভগবানে নিঃশেষে পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আর অপরিপাক বা অজীর্ণের চিহ্ন স্বরূপ জগদ্ভাব প্রসব করিবে না। যতক্ষণ আমরা পূর্ব্বের সংস্কারজাত 'আমি'টীকে লইয়া থাকি, ততক্ষণই কর্ম্ম। আমার 'রাম' ভাবটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার রাশির ফল মাত্র। গত জন্মে যাহা করিয়াছিলাম, সে সকল কার্য্য 'আমির' বাহিরে বীজরূপে বপন করিয়াছিলাম, সেই প্রকৃত 'আমি' হইতে বিশ্লিষ্ট, মল মূত্রাদির ন্যায় বাহিরে পরিত্যক্ত,— সুতরাং মৃত ভাবগুলি অবলম্বন করিয়া 'আমি রাম' বলিতেছি। আমি 'রাম' এই ভাব পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; উহা অতীতের কথা, স্বপনের কথা। উহা প্রকৃত 'আমির' পরিত্যক্ত খোলস মাত্র। অথচ সেই ভাবটীকে লইয়াই ইহ জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্মের নিরূপণ করি। এই জন্যই বুঝি ভগবান বলিলেন,—"ভূত ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সজ্ঞিত"

যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা ভূত বা মৃত, যাহা প্রেতভাবে অবস্থিত, যাহা স্বভাবগত, যাহা আমাদের প্রকৃত 'আমি" বুঝিয়া সুঝিয়া তাহার 'আমি' নহে জানিয়া প্রকৃতি বা স্বভাবকে দান করিয়াছে, অপ্রাকৃত মদনমোহনের অংশভূত সেই 'আমির' চিদ্বিবিলাসকেই ত' কর্ম্ম বলে। উহা আমাদের মৃত 'আমির' ভাষা লইয়া খেলে। অমৃতত্বের খনি যে 'আমি' আছে তাহার ভাষা নহে। সে যে সদা স্থির, সর্ব্বভাবে সমরূপে স্বপ্রকাশ; এ যে সদাই চঞ্চল, সদাই বাহ্যবিলাসের মধ্যে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় বিপরীত দিকে আপনাকে সিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিতেছে। সে বলে 'অস্তি' আর এ সে অস্তির স্থির ভাষাটি ভুলিয়া গিয়া দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বটি সেই স' এর চিদ্বিলাস যোগ বিয়োগ করিয়া, বাহ্যগুলিকে জোর পূর্ব্বক একত্রিত করিয়া অপেক্ষাকৃত পরিণামী স্থৈর্য্য ভাবের সিদ্ধ করিয়াই পরিতৃপ্ত। সে বলে 'ভাতি' ও সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্ব-বস্তু প্রকাশ করিয়াও নিত্যই স্বপ্রকাশিত হইতেছেন; আর এ ব্যাচারা "দুই আর দুয়ে চার" বলিয়া "সংকল্পাত্মক মন প্রভৃতির তথ্য অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বভূত চিদ্ঘন কালশশীর পরিমান করিতে যাইতেছে। সেই পর পুরুষে আর 'সর্ব্ব' নাই, কারণ তাহা চিদানন্দময়ী পরা প্রকৃতি যে সর্ব্বনাশী। সে যে সর্ব্বের খেলা সহ্য করিতে পারে না, ও জ্ঞান ও আনন্দরূপে 'সর্ব্ব'কে ঘন করিয়া ভগবানেই মিশাইয়া দিতেছে। সর্ব্বার্থতার মধ্যে তাঁহাকেই অর্থ করিয়া সেই সর্ব্বনাশী 'সদ'ভাবগুলি ভস্ম করতঃ শিবসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের বিভূতি করিয়া দিতেছেন। পাঠক দগ্ধ বস্ত্র কি কখনও দর্শন করিয়াছেন! যতক্ষণ হস্ত স্পর্শ না করিবেন, ততক্ষণ উহা অটুট বলিয়াই মনে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকের একখানি পৃষ্ঠাতে অগ্নি সংযোগ করুন, উহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ হইয়া গেলেও, পূর্ব্বের লেখা বা সঙ্কেতগুলি ঠিক পাঠ করা যায় ও এমন কি পৃষ্ঠাটি স্বরূপ ভাবে আছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে; কিন্তু স্পর্শ করিলেই দেখিবেন যে উহা ভস্ম মাত্র। যাহা বিশেষ ছিল, তাহা নিঃশেষে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ সেই সর্ব্বনাশী যখন তোমার হৃদয়ে ক্রীড়া করিবেন, তখন এই স্বতঃসিদ্ধ-প্রায় জীব ও জগতের নাম রূপের খেলারাশি একেবারে ভস্ম হইয়া যাইবে। তখন দেখিবে যে চিহ্নরূপে উহার অস্তিত্ব থাকিলেও, সে অস্তিত্ব বিভূতিরূপে শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্দ্ধক মাত্র। উহা বাস্তবিক নাই ও ছিল না। উহার ভূতভাব বিগত হইয়া এখন উহা বিভূতি রূপে আছে। যেমন যাই আপনি calculus নামক অঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইলেন, অমনি সেই জাতীয় অঙ্কের যে শত শত বিশিষ্ট উদাহরণগুলি

ইতিপূর্ব্বে কত কষ্টে কষিয়াছিলেন, সেই বিশিষ্ট উদাহরণগুলি নাম ও রূপ ত্যাগ করতঃ অঙ্ক কষিবার অবিশেষ জ্ঞান বা শক্তিরূপে আপনাতেই মিশিয়া গেল। তখন জগত হইতে সমস্ত অঙ্কশাস্ত্র অপসারিত হইলেও ক্ষতি নাই; কারণ সেই 'সর্ব্ব' বা 'বহু'রূপে অখিলভাবে বিতন্বত ছিন্ন বিশেষগুলি,—জ্ঞানরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া 'আমি'তে ঘন হইয়া আছে। ঐ জ্ঞান কি তখন আপনার ভিতর সর্ব্বদা, সকল বিষয়ে 'গজ্ গজ্' করিতে থাকে? না; উহা কি মহান্ শক্তির বশে আমিতে 'অনু'রূপে 'সঙ্কিত' হইয়া গিয়াছে? আবশ্যক না হইলে, কেহ যদি তোমার 'আমির' ভিতর 'বোমা' মারে, তাহা হইলেও প্রকাশ পাইবে না। এইরূপ কতশত ব্রহ্মা সেই ভগবানের 'আমির' ভিতর নিঃশেষে মিশিয়া আছে; তাঁহার 'অনুসন্ধান'-স্বরূপা চৈতন্যময়ী মহামায়া সেই 'সকলকে ঘন করিয়া তাঁহাতেই ডুবাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যেমন তোমার আবশ্যক হইলে তখনই সেই অনুসন্ধান-স্বরূপা দেবী তোমার ভিতর হইতে সেই ইঙ্গিতমাত্র রূপে অবস্থিত calculus জ্ঞান আবার প্রকট করিয়া, পুনরায় কোটী কোটী উদাহরণের ভিতর দিয়া সেই জ্ঞান প্রকট করিয়া দেন,—তদ্রূপ ভগবান যখন আপনার স্বরূপ চিদানন্দ ঘন সত্ত্বা বিশেষরূপে জানিতে চাহিবেন, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বীয় পদাঙ্গুলি লেহনের ন্যায় আপনার মাধুর্য্য আস্বাদনে আপন শক্তি দ্বারা সৃজিত বাহ্য ভাবে ভোগ করিতে চাহিবেন, অমনি চিদানন্দময়ী তদীয় অনুসন্ধানরূপ শক্তির সাহায্যে সেই এক-রস প্রলয় কালস্থিত, জ্ঞানার্ণবের মধ্যে 'দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরে' সেই পৃথিবীর ভস্মীভূত ইঙ্গিত মহাবারাহীরূপিণী রূপে আবার সেই দগ্ধবস্ত্রাবভাসং জগতের প্রতিষ্ঠা করিবেন। মহামায়ার এই খেলাকেই শাস্ত্রে 'কলা'রূপে ইঙ্গিত করা হয়। যে বাহ্য মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রে চন্দ্ররূপে নির্ণীত হয়, সেই মনস্তত্ত্ব কলারূপে দেবাদিদেবের শ্রীঅঙ্গে বাহ্য প্রকটরূপিণী শক্তিমাত্র ও জ্ঞান মাত্রারূপে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যোগ অর্থে মোটা কথায় পরিপাক শক্তিই বুঝায়। উহাতে সর্ব্বাত্মিকা—সর্ব্বার্থসাধিকে—মহামায়া 'সর্ব্ব' লইয়া খেলা করিলেও সেই ভগবানরূপ পরমার্থ-সাধন-তত্ত্বই বুঝায়। সুতরাং এই যোগে শ্রীভগবানই আদি, অন্ত ও মধ্য, সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যময়ীই ইহার শক্তি,—নিষ্কল ব্রহ্মই দেবতা বা স্বপ্রকাশ তত্ত্ব,—সর্ব্বভূত-হৃদয় শুকাদি প্রমুখ ইহার ঋষি,—"বাসুদেব সর্ব্বমিতি" এই মহাভাবই ইহার কীলক,—'সর্ব্বধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইহাই মন্ত্র; 'সর্ব্ব'তে যাহার



[illegible] (১ [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেন।

আর অভিসন্ধি নাই, যিনি শ্রীরাধার ন্যায় "রূপ্যতে ইতি রূপম" বা সদা স্বপ্রকাশ সাগরোপম শ্রীভগবানের রূপসাগরে নির্ব্বিশেষে ডুবে যাওয়াই যাহার একমাত্র ইচ্ছা, এমন জীবই ইহার ক্ষেত্র বা আসন-তত্ত্ব। প্রাণের সমস্ত গতিকে 'যৎকরোসি যদশ্নাসি, মন্ত্রে শ্রীভগবানে মিশাইয়া দেওয়াই ইহার প্রাণায়াম। ইহাই 'সহজ যোগ'; কারণ ইহা জীবভাবের উৎপত্তির মূলেও বর্ত্তমান (সহ-জ)। ইহা সহ-জাত বলিয়াই সুমুখ ও 'সহ-জ'। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

কাম.]

অতৃপ্ত তৃষা।

তব বিরহ দহনে দহিছে হৃদয়,
রাখ সখা পদে রাখ হে!
ওই শান্তি মধুর করুণা-বরষা,
বরিষ এ মোর হৃদয়ে ॥
ওগো! ও বরষা বিনা এ বহ্নি যে সখা,
চাহেনা বারেক নিবিতে।
দাও হে, দাও হে, প্রাণ! পরাণে—
করুণা-আলোক ভাতিতে!'
সংসার-পবন লহরে যে সখা,
পাবক দ্বিগুণ জ্বলিছে।
শত বৃশ্চিক দংশনে যে গো—
চরম যাতনা দিতেছে ॥
সখা! তোমারই ভরসা করিহে,
ওই পদতল ছায়ে রাখিও।
ওগো! তোমার বীণা-ঝঙ্কারে যেন;
প্রেম-নীরে হৃদি নাচে গো!!
তব করুণা-বারিধে অমল বিম্ব,—
ঝলমল সদা করিছে।
ওই যে রাজীব চরণ-কমলে,—
শত শশধর ভাতিছে ॥
ওগো, যত ধাই সখা! তব চরণ তরে,
তব পদরেণু মাথে ধরিতে।
তব ও করুণা-নীর মরীচিকা প্রায়,
খেলে খেলা মোর হৃদি সাথে ॥
ওগো, শতেক যতন করিল এ প্রাণ,
ও নীরে স্নান করিতে,
শেষে—অনুসারি সখা! কিন্তু এ তনু,
নারিল পরশ করিতে ॥
এস প্রাণ সখা—এস হৃদয়েশ!
হৃদি-দ্বার খুলে রেখেছি।
বারেক দাওহে ও চরণ সখা;
শূন্য হৃদয় ক'রেছি ॥
ওগো! তোমার তরে লালায়িত মন,
হু হু রবে সদা জ্বলিছে।
হৃদে নাহি প্রাণ, করেছে প্রয়াণ;
তব পদ অন্বেষণে গিয়েছে ॥

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র।

হরিদ্বার।

(গত বৎসর ফাল্গুন সংখ্যার পর।)

পঞ্চতীর্থ।

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত মায়াপুরীতে বহু তীর্থ। পুরাণে এমন অনেক তীর্থের কথা আছে, যাহা কাল প্রভাবে লুপ্ত। বহু তীর্থ বর্ত্তমান থাকিলেও যাত্রীগণ তাহা দর্শনের সুযোগ পান না এবং পাণ্ডাগণও সকল তীর্থের অবস্থান (position) অবগত নহেন। মায়াপুরী কেন, অনেক তীর্থেরই এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। শাস্ত্রোল্লিখিত সকল তীর্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ তীর্থমাত্রেই শাস্ত্রানুসারে পঞ্চতীর্থের ব্যবস্থা আছে, তীর্থ যাত্রীর পঞ্চ তীর্থের সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাদ্বার কুশাবর্ত্ত বিল্লকেশ্বর, নীলপর্ব্বত ও কনখল—হরিদ্বারের পঞ্চতীর্থ।

গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্লকে নীলপর্ব্বতে।
তথা কণখলে স্নাত্বা ধূতপাপ্মা দিবং ব্রজেৎ॥ ম-ভাঃ অনুশাসন ২৫ অঃ।
সর্ব্বে দেবা সগন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নর তাপসঃ।
তিষ্ঠন্তি যত্র তীর্থেহি সর্ব্বেতে মুক্তিলালসা॥
চণ্ডীকা তীর্থরাজেহি সকৃতস্নাতো মহামুনে।
সঃধন্য পুরুষোলোকে সফলং তস্য জীবিতম॥
দক্ষেশ্বরং মহাদেবং দৃষ্টা বৈ ভক্তি তৎপরঃ।
কৃতকৃত্যো ভবেৎ মর্ত্ত্যো ধন্যতাং যাতি সত্বরম॥ স্কন্দ-পুঃ কেঃ খণ্ড।

গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্লকেশ্বর, নীলপর্ব্বত ও কণখল তীর্থে স্নান করিলে পাপমুক্ত হইয়া মনুষ্যের স্বর্গবাস হয়। সর্ব্বদেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও তাপসগণ মুক্তি-কামী হইয়া এই সকল তীর্থে বাস করিয়া থাকেন। চণ্ডিকা তীর্থে যে ব্যক্তি একবার স্নান করেন, তাঁহার জীবন ধন্য। ভক্তি তৎপর হইয়া দক্ষেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হ'ন।

১। গঙ্গাদ্বার।—(ব্রহ্মকুণ্ড)—হরিদ্বার নগরীর পশ্চাতে একটী পর্ব্বত আছে, যাহার শিখরে মনসাদেবীর মন্দির ও সূর্য্যকুণ্ড বিরাজমান। গঙ্গার অপর পারে প্রসিদ্ধ চণ্ডীর পাহাড়। "গঙ্গাদ্বার" নামের সার্থকতা বুঝিতে হইলে ও হরিদ্বারের মনোরম দৃশ্য-বৈচিত্র্য অবলোকন করিতে হইলে, এই পর্ব্বত-

দ্বয়ের কোন একটীতে আরোহণ করিতে হয়। পর্ব্বত চূড়া হইতে উত্তরে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত দিগন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গার রজত ধারা কলকল নাদে স্বর্গ সদৃশ হিমালয় হইতে পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ উপত্যকা বা দ্বার দিয়া সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতেছেন। পর্ব্বত-দ্বয়ের উপত্যকা মধ্যেই গঙ্গার ত্রিধারা এবং নগরী বিরাজমান। এই পর্ব্বত-দ্বয়ই হিমালয়ের শেষ পর্ব্বত (last spurs of the Himalaya) ইহার নাম শিবালিক পর্ব্বত। তাহার পরই ভারতের শস্যশ্যামলা সমতল ক্ষেত্র আরম্ভ হইয়াছে। উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকা যাহার মধ্য দিয়া গঙ্গার ধারা ভূমিতে অবতরণ করিতেছে, তাহা ঠিক দ্বারের ন্যায়ই দেখায়। গঙ্গাদ্বার হরিদ্বারেরই নামান্তর, কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটেই সকলে গঙ্গাদ্বারের তীর্থকৃত্য ও স্নান-দানাদি করিয়া থাকেন। এই ঘাটে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুগণ তাঁহাদের মৃত আত্মীয়গণের অস্থি ও ভস্মাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। কাশীর মণিকর্ণিকার ন্যায় এই ঘাটও পবিত্রতম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের শোভা অতি মনোরম। গঙ্গাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী এবং যমুনাতটে মথুরা নগরীর শোভা ভুবনে অতি দুর্লভ; যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত উপল-প্রতিহতা ঝঙ্কারকারিণী গঙ্গাতটশোভিনী হরিদ্বারের সৌন্দর্য্য আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বোধ হইয়াছিল। সৌধকিরীটিনী বারাণসী অপেক্ষা হরিদ্বার আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, ভাগীরথী সলিলের প্রখর প্রবাহ এবং পার্ব্বত্য ও হরিৎ কানন-শোভায় ইহার সৌন্দর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। গঙ্গাতীরে ঘাট ও ঘাটের সম্মুখে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত চত্বর (platform) প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। মাতা ভাগীরথী নিত্য নির্ম্মল শীতল প্রখর প্রবাহে সোপানশ্রেণী প্রক্ষালত করিয়া কুলকুল রবে দিবসযামিনী প্রধাবিতা হইতেছেন। চত্বরের পশ্চাদ্ভাগে শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, উচ্চ চূড়া সমন্বিত মঠ ও মন্দিরসমূহ এই পবিত্র তীর্থের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিতেছে। হরিদ্বারের এই প্রশস্ত তটভাগের রমণীয়তার তুলনা অন্য কোথাও আছে কি না জানিনা। হরিদ্বারে গঙ্গার শোভা বড় মনোহর। জল প্রবাহ দেখিলে মনে হয়, যেন প্রাণময়ী—চিন্ময়ি—তেজোময়ী—অমৃতময়ী—শুভ্রা ব্রহ্মময়ী * মাতা জাহ্নবী

* "গঙ্গা"র এই সকল নামের অর্থ "গো গঙ্গা গায়ত্রী" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

এখানে চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। আমরা মায়াচ্ছন্ন, চর্ম্ম-চক্ষুতে তাঁহার চিন্ময়ী দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু হৃদয়ে যেন একটা অপূর্ব্ব ভাবের অনুভব হইতেছে। কাশী প্রয়াগ গঙ্গাসাগর প্রভৃতি নানাতীর্থে গঙ্গার বিভিন্নরূপ দেখিয়াছি, কিন্তু প্রবাহের এরূপ অপূর্ব্ব শোভা হরিদ্বার ভিন্ন কোথাও আমাদের নয়ন গোচর হয় নাই।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের প্রাচীরের গায়ে একটী কুলুঙ্গীতে বিষ্ণুর চরণপদ্ম খোদিত আছে। সুতরাং এই ঘাট "বিষ্ণুপদী" নামেও খ্যাত। হিন্দুস্থানীরা বলেন,—"হরি কি চরণ পৈরী" কথিত আছে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার এই ঘাটে যজ্ঞকালে সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি এইস্থানে আবির্ভূত হন; সেইজন্য উক্ত পদচিহ্ন খোদিত। ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখ ভাগে গঙ্গার প্রবাহ মধ্যে একটী দ্বীপাকার প্রস্তর চত্বর বাঁধান আছে। ঘাটের সহিত উক্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ সেতু দ্বারা সংযোজিত। * ক্ষুদ্র দ্বীপ ও ঘাটের মধ্যবর্ত্তী কুণ্ডাকৃতি জল প্রবাহই ব্রহ্মকুণ্ড নামে খ্যাত। উপরেই কাষ্ঠনির্ম্মিত আর একটী সেতু আছে। ইহার উপর যাত্রী ও নাগরিকগণ বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, মৎস্যকে আহার্য্য দান † ও বিচরণ করিয়া থাকেন। এই সেতুর উপর বসিয়া গঙ্গার সান্ধ্য আরত্রিক দেখিতে অতি মনোরম।

ব্রহ্মকুণ্ড নিত্যোৎসব সমন্বিত। প্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম জনসমাগম, তীর্থব্রত ও স্নানদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান চলিতেছে। যতবার হরিদ্বারে ট্রেণ আসিতেছে দলে দলে ভারতের বিভিন্ন দেশবাসী বিচিত্র বেশভূষাধারী নূতন নূতন যাত্রী আসিয়া প্রথমেই এই ঘাটে ভক্তিভরে স্নানাদি করিতেছেন। ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে দলে দলে নরনারীগণ স্নানাহ্নিক, জপ ও পূজা করিতেছেন। দ্বীপটীর উপর কত ভক্ত গৃহী সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন ও পূজানিরত। ঘাটের পার্শ্বেই কত দেবালয়; কোন কোন মন্দিরে শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিতা "চন্দ্রাযুত সমপ্রভা" গঙ্গার সুন্দর প্রতিমা; কোন মন্দিরে মহাদেব; কোন মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ। ভিক্ষুকগণ নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। ঘাটের

* এই সেতু ও ব্রহ্মকুণ্ডের আংশিক চিত্র গত পৌষ মাসের "পন্থায়" প্রকাশিত হইয়াছে।

† ব্রহ্মকুণ্ডের হরিদ্রাভ সুবৃহৎ মৎস্যগুলির নির্ভয়ে নির্ম্মলজলে বিচরণ, ক্রীড়াভঙ্গী এবং যাত্রী প্রদত্ত খাদ্য বস্তুর ভোজন ব্যাপার একটী কৌতুককর দৃশ্য। এখানে জীবহিংসা না থাকায়, মৎস্যগণ ভয় কাহাকে বলে জানে না বা মনুষ্য দেখিয়া পলায়ন করে না বরং আহার পাইবার প্রত্যাশায় সাগ্রহে জলের উপর সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। যাত্রীগণ সেতুর উপর হইতে খই, মুড়ি, ময়দার গুলি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া মৎস্যের কৌতুককর ক্রীড়া দেখিয়া থাকেন।

উপরেই দুইটী বালক রাম সীতা সাজিয়া সম্মুখে ভিক্ষা'র থালা সাজাইয়া বসিয়া আছে। মহিলা যাত্রীগণ ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করতঃ প্রণামী দিতেছেন। মন্দির গুলিতে পূজা ও আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিনই এইরূপ আনন্দ-কোলাহল এবং মনোরম দৃশ্য-বৈচিত্র। কিন্তু সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মকুণ্ডের শোভা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম; সে শোভা অনির্ব্বচনীয়—অতুলনীয়, অন্য তীর্থে দুর্লভ! ব্রহ্মকুণ্ডের অর্দ্ধ বৃত্তাকার ঘাটের নিম্নতম সোপানের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান পূজক বৃহৎ একটী আরত্রিক হস্তে গঙ্গাদেবীর আরত্রিক করিতেছেন; জল, স্থল, ব্যোম, শঙ্খ-ঘণ্টারবে মুখরিত। পশ্চাতে ভারতের নানাদেশের তীর্থ যাত্রীগণ জয়ধ্বনি করিতেছেন; কুণ্ডের সম্মুখবর্ত্তী সেতু ও দ্বীপে কত সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সন্ধ্যাহ্নিক ও ধ্যান-ধারণায় আত্মহারা। কেহবা উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ করিতেছেন। বহু বিদ্যার্থী বৈদিক সুরতাল সংযোগে গঙ্গা-লহরী পাঠ করিতেছেন। ভক্ত কণ্ঠোচ্চারিত মনোরম স্তোত্রধ্বনি লহরে লহরে সেই অনন্ত লীলাময়ের শ্রীচরণে ভাসিয়া চলিয়াছে। জাহ্নবীর কুলুকুলু ধ্বনি তাহার সহিত মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুরতার সৃষ্টি করিতেছে। অপর পারে চাহিয়া দেখ, হরিৎবৃক্ষলতা মণ্ডিত দ্বীপ এবং পর্ব্বতমালা ধ্যানে নিমগ্ন। প্রদোষ কালে এই মনোরম শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার ধ্যানস্থ হও, দেখিবে তীর্থ-মাহাত্ম্যে তোমার চিত্ত-মল ধুইয়া গিয়াছে এবং এক অদ্বিতীয় আনন্দ মাত্রা চিত্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন বুঝিবে হরিদ্বার সত্যই "হবেস্তৎ প্রাপ্তে দ্বারমিব"—হরি বা হরের প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। ক্রমে সন্ধ্যান্ধকারে জল, স্থল, পর্ব্বতশৃঙ্গ আচ্ছাদিত হইলে, দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। মহিলাগণ ঘাটের ধারে অসংখ্য দীপাবলী সাজাইয়া দিতেছেন - কেহ বা প্রজ্বলিত দীপাবলী গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দিতেছেন, সে দৃশ্যও অতি মনোরম। তাই বলিতেছিলাম, ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট প্রত্যহ প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উৎসব-সমন্বিত যাত্রীগণের আনন্দ কোলাহলে ও শঙ্খ ঘণ্টারবে মুখরিত। যে কয়দিন হরিদ্বারে ছিলাম, আমাদের বাসার প্রকোষ্ঠ হইতেই এই আনন্দ দিবারাত্রি উপভোগ করিতাম।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের ৩৯টি সোপান আছে।* প্রথম ধাপ ২২॥০ হাত এবং নিম্নতম ধাপ ৮০ হাত লম্বা। পূর্ব্বে ঘাট আরও ছোট ছিল, উহা আকবর সেনাপতি অম্বর রাজ মানসিংহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে উহা ভগ্ন হইয়া

* গত ফাল্গুন সংখ্যায় চিত্র দেখুন।

যাওয়ায় এরূপ দুর্গম হইয়াছিল যে স্নানকালে বহু সংখ্যক লোক একটু অসাবধান হইলেই ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় রাজন্য ও ধনীগণের সাহায্যে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক সমাগম হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে যে কুম্ভমেলার সময় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এ সময় এখানে ২০।২৫ লক্ষ ব্যক্তি একত্রিত হ'ন। কুম্ভযোগ কয়েক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয়। ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও মহান্তগণ তখন নিজ নিজ দলবলসহ এখানে একত্রিত হয়েন। কোন্ সম্প্রদায় অগ্রে স্নান করিবেন, ইহা লইয়া পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণের মধ্যে বিষম বিবাদ এবং লাঠালাঠি হইত। Gazeteer পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের কুম্ভমেলায় শৈব, গোস্বামী ও বৈরাগী সম্প্রদায় মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া ১৮০০ ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নানক সম্প্রদায়ী শিখেরা ৫ শত গোস্বামীকে হত্যা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে কুম্ভমেলার ন্যায় পবিত্র যোগের সময় ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের মুনি উদার-হৃদয় সন্ন্যাসীগণ এবং ধর্ম্মপ্রাণ গৃহীগণ তীর্থসমূহে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম-মীমাংসা শাস্ত্রার্থ বিচার এবং যুগধর্ম্ম নির্ণয় করিতেন। কালক্রমে কলির প্রভাবে সন্ন্যাসীগণের কি অধঃপতন হইল! সর্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শন যাহাদের সন্ন্যাস গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—যাঁহারা সমস্ত তাঁহাতেই ন্যস্ত করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিতেন, তাঁহাদের কি ঘোরতর অধঃপতন। তাঁহারা স্বকীয় সম্প্রদায়ের "বিশিষ্ট" 'আমি" প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া আসুরিক হিংসায় প্রবৃত্ত! যাহা হউক সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সুধীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন্ সম্প্রদায় অগ্রে করিবেন, তাহার একটী ক্রম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আর ইহা লইয়া বিবাদ হয় না। তবে অল্প সময়ের মধ্যে (যোগের স্থিতি কাল) স্নান করিতে হইবে বলিয়া, যাত্রীগণের মধ্যে একটা কোলাহল ও বিষম হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও সম্যক্‌রূপ শান্তিরক্ষা করিতে পারেন না। কত যাত্রী ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়া পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা ঠিক থাকে না। কুম্ভের সময় গঙ্গার উপর নৌকা দ্বারা দুইটী সেতু প্রস্তুত হয়, একটী ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখে. আর একটী প্রায় ১।০

মাইল দক্ষিণে। প্রথমে শেষোক্ত সেতুদ্বারা দ্বীপে যাইতে হয়, ক্রমে উত্তরাভিমুখে ১॥০ মাইল চলিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখবর্ত্তী সেতু পার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া স্নান করিতে হয়। তৎপর হরিদ্বারের পথ দিয়া স্নানকারিগণ স্বীয় আবাস স্থানে ফিরিয়া যান, ইহাই দলবদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গণের স্নানের নিয়ম। কুম্ভমেলার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। যদি ভারতবর্ষের বিশালত্ব অনুভব করিতে চাহেন, যদি একস্থানে ভারতের সকল উপাসক সম্প্রদায়কে দেখিতে চাহেন, তবে কুম্ভমেলা দেখিতে ভুলিবেন না।* এক একটী সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীগণ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, ধ্বজপতাকা, মল্ল, লাঠি, খেলোয়াড়, বাদ্যকর, পাল্কী প্রভৃতি দলবল ও মহান্ত সহ গমন করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধুদের জমায়েত বলে। হস্তী পৃষ্ঠে প্রধান মহান্ত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ইষ্টদেব মূর্ত্তি ছত্র ও চামর যুক্ত হইয়া অগ্রে অগ্রে চলেন। সন্ন্যাসীগণ দলে দলে ইষ্টদেব মূর্ত্তি ও গুরুদেবের পার্শ্বে স্বসম্প্রদায়ানুরূপ জয়ধ্বনি করিতে করিতে গমন করেন। প্রথমে ইষ্টদেব মূর্ত্তি ও পরে প্রধান মহান্তের স্নান হইলে সন্ন্যাসীগণ স্নান করেন। নানক সম্প্রদায়ের উদাসীগণ ইষ্টমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে গুরু নানকের কাষ্ঠ পাদুকাকে প্রথম স্নান করাইয়া থাকেন। একদল হর হর বম্ বম বলিতে বলিতে গিয়া জলে পড়েন। তারপর একদল হরে নারায়ণ, হরে নারায়ণ বলিতে বলিতে অগ্রসর হ'ন। আর একদল হর শিব শম্ভো, জয় শিব শম্ভো বলিতে বলিতে স্নান করেন। এইরূপে সমস্ত দিন কুম্ভমেলার যোগের সময় ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে অপূর্ব্ব দৃশ্যের অভিনয় হয়।

২। কুশাবর্ত্ত।—ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি শেষ করিয়া কুশাবর্ত্ত ঘাটে পুনঃ স্নান করতঃ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি এবং গোদান করা বিধেয়। কেদার খণ্ডে কুশাবর্ত্ত তীর্থের উৎপত্তি কাহিনা এইরূপ বর্ণিত আছে। যোগীশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয় এইস্থানে সমাধিস্থ ছিলেন, সেই সময় গঙ্গা গিরিরাজ হিমাদ্রি হইতে অবতরণ করিতে করিতে স্রোতবেগে মহর্ষির কুশ, বস্ত্র ও দণ্ড প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি কুশাদি দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে নিষেধ করেন। গঙ্গাও ভয়ে স্রোত আবর্ত্তন করিয়া কুশাদি প্রত্যর্পণ করেন। মহর্ষির তপঃ প্রভাবে ও দেবগণের সান্নিধ্যে কুশাবর্ত্ত তীর্থে পরিণত হইল। যে স্থলে কোন মহাত্মা তপস্যা করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করেন, যে

* ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র বৈশাখে হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা হইবে।

স্থলে ঋষিগণের তপঃ প্রভাবে দেবগণের আবির্ভাব হয়, সেই স্থানই তীর্থে পরিণত হয়। এইরূপেই পুণ্যভূমি ভারতে অসংখ্য তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেবের তপস্যা ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর তীর্থে পরিণত হইয়াছে। তাই পুরাণ বলিতেছেন,—

ক্ষেত্রাণি সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাশ্চ নদস্তথা।
ঋষিণাং তপসো বীর্য্যাৎ মাহাত্ম্যং পরমং গতাঃ॥

ক্ষেত্র, সরিত পর্ব্বত, নদী ঋষিগণের তপস্যা প্রভাবে পরম মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তবীর্য্য গুরু মহর্ষি দত্তাত্রেয় ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন :—

অত্রৈব ভবতাং স্থানং নিত্যং সাত্তীর্থকে বরে।
আবর্ত্তনাদ্যতো গঙ্গা কুশান্ ধৃতবতী মম॥
কুশাবর্ত্তমিতিখ্যাতং তীর্থমে তদ্ভবিষ্যতি।
ধন্যাঃ লোকাঃ করিষ্যন্তি স্নানং পিতৃসমর্চ্চনম্।
তৎ পিতৃনাং চ তস্যাপি ন স্যাজ্জন্ম পুনঃ ক্বচিৎ।
কুশাবর্ত্তে মহাতীর্থেদত্তং স্যাদ্‌কোটী সংখ্যাকম্॥

হে ব্রহ্মাদিদেবগণ! আপনারা এই তীর্থে অবস্থান করুন। গঙ্গা আমার আকর্ষণে স্রোত আবর্ত্তিত করিয়া আমার কুশাদি প্রত্যার্পণ করিয়াছেন; অতএব এই তীর্থ কুশাবর্ত্ত নামে খ্যাত হইল। যে ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান এবং পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন, তিনি ধন্য, তিনি এবং তাঁহার পিতৃগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। কুশাবর্ত্তে দান করিলে, তাহা কোটীগুণ ফলপ্রদ; তাই তীর্থযাত্রী মাত্রেই এখানে পিণ্ড দানাদি করিয়া থাকেন। গঙ্গার স্রোত এই ঘাটে অত্যন্ত প্রবল, ঘাটে লৌহ শৃঙ্খল সংযোজিত আছে। তাহা ধরিয়া অতি সাবধান-তার সহিত স্নান করিতে হয়; হস্ত স্খলিত হইলে গঙ্গার প্রবল প্রবাহ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। বহু বর্ষ পূর্ব্বে, ইন্দোরের মহারাজা একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দালান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, সেই দালানেই সারি সারি লোক বসিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একদল যাইতেছেন আর একদল আসিতেছেন, আবার তাঁহারাও কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। অবিরাম শ্রাদ্ধের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে ঐ স্থান মুখরিত এবং ভক্তির তরঙ্গে নিমজ্জিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিং।

ঊর্দ্ধবাহু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"কাল্‌নার ঠাকুর বাটীতে মধ্যে মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া অবস্থান করেন। সেই সময়ে একজন সাধু সেইস্থানে ছিলেন। লোকটী অত্যন্ত স্বল্পভাষী, নির্জ্জন প্রিয় ও বিনয়ী। আপন মনে উদাস ভাবে বসিয়া থাকিতেন, কখনও বা ইষ্টদেবের পূজা করিতেন কিম্বা গুণ গুণ করিয়া ভজন গাহিতেন। আকৃতিটা কিন্তু আদৌ সাধুর মত ছিল না। দীর্ঘ শীর্ণকায়, এক চক্ষু বিহীন, বৈষ্ণবের মত মাথায় বড় বড় চুলে ঝুঁটী বাঁধা। কি জানি কেন এই কদাকার সাধুটীর আমার প্রতি করুণা হইল। একদিন একটী মৃৎপাত্র করিয়া কিছু চরণামৃত আনিয়া আমাকে বলিলেন,—

"অকাল মৃত্যু হরণম্ সর্ব্বব্যাধি বিনাশনম্।
বিষ্ণু পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়োম্যহম্॥"

এই মন্ত্র মনে মনে ভক্তিভরে উচ্চারণ পূর্ব্বক চরণামৃত পান করিও।" এবং নিজে তাঁহার কমণ্ডলু হইতে প্রত্যহ তিন বার করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে চরণামৃত ছিটাইয়া দিতেন। সেই সময় মনে হইত যেন সমস্ত শরীর জুড়াইয়া দিতেছে; শরীরের প্রদাহ ও ব্যথা অনেকটা উপশম বোধ হইত। একদিন করজোড়ে তাঁহার নিকটে ব্যাধি ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি ভিক্ষা করিলাম। সাধু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে নীরবে চলিয়া গেলেন। পরদিবস এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী আমাকে দিয়া বলিলেন,—

"ত্রিভির্দিনৈ ত্রিভির্পক্ষে ত্রিভির্মাসে ত্রিভিবর্ষে।
অত্যুৎকট পাপপুণ্যাং ইহৈব ফলমশ্নুতে॥"

আমি আজ এখান হইতে চলিয়া যাইব। তুমি দিবারাত্রে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে, একাগ্রচিত্তে এই শ্লোকটী পাঠ করিবে। মুখ শুকাইয়া গেলে ভাণ্ডস্থ চরণামৃত পান করিবে অথবা জিহ্বা আড়ষ্ট ভাবাপন্ন হইলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মনে মনে পাঠ করিব না উচ্চৈঃস্বরে?"

তিনি বলিলেন, মনে মনে এখন পাঠ করিতে পারিবে না; চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িবে। তৎপরিবর্ত্তে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে

বারম্বার পাঠ করিয়া যাইবে। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে।

পুনরায় বলিলাম "আমার রোগমুক্তির একটা উপায় করুন!"

সাধু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—দেখ ভগবান, গুরু বা সাধু সন্ন্যাসীর নিকট পবিত্রতা বা ধর্ম্মে মতি ব্যতীত কখন কিছু প্রার্থনা করিও না. কেননা তোমার পক্ষে কি উচিৎ, অনুচিত বা আবশ্যক, অনাবশ্যক, তাহা তোমা অপেক্ষা তাঁহারা ভাল বুঝেন।" যখন একটু সুস্থ বোধ করিবে, তখন প্রত্যহ দুই তিনবার ভক্তিভাবে গঙ্গাস্নান করিবে ও উত্তম করিয়া সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকা লেপন করিবে; ইহাতেই তোমার রোগমুক্তি হইবে। একমাত্র চরণামৃত ছাড়া কাহারও নিকট আহার্য্য বস্তু বা কোন কিছু প্রার্থনা করিও না। নিত্য প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উপস্থিত হইলে, তাহা স্পর্শ বা সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিও না। চরণামৃত না পাইলে তৎপরিবর্ত্তে গঙ্গাজল ব্যবহার করিও; কেন না ইহাও বিষ্ণু পাদোদকং। যথাসম্ভব অপরের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবে, এইরূপ ভাবে দিন কাটাইয়া যাও।

সাধু চলিয়া গেলেন; নিজে ঘৃণিত কুষ্ঠরোগী বলিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইবার সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত হইলাম।

বৈশাখী পূর্ণিমা সমাগত, বহুদিন হইতে সাধুর প্রতীক্ষায় ছিলাম। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি উপস্থিত হইল, তথাপি তিনি আসিলেন না। বহু দিনের আশায় বঞ্চিত হইলে প্রাণে যেমন একটা আঘাত লাগে, সেইরূপ ব্যথিত হইলাম। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, সেই সাধু আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া; প্রণাম-পূর্ব্বক পদধূলি লইলাম। তিনি বলিলেন,—"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতম্ কর্ম্ম শুভাশুভম্" এই পদটী অদ্য হইতে অর্দ্ধস্ফুট ভাবে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিও. ইহা স্বপ্ন বা তোমার কল্পনা নহে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আজ্ঞা প্রতি-পালন করিবে। অদ্য প্রত্যাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কিছু অভ্যাসের পরিবর্ত্তন উচিৎ নহে। স্বপ্ন ভঙ্গে একবার মনে হইল ইহা বুঝি কল্পনা। কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন বাধা দিয়া বলিল,—"না ইহা কল্পনা নয়।" নবোৎসাহে নূতন মন্ত্রে ব্রতী হইলাম।

ইহার পর হইতেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। দেহের ব্যথা কমিতে ও ক্ষতস্থান শুকাইতে আরম্ভ করিল, শরীর নূতন ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। মনে আবার উৎসাহ ও আশা জাগিয়া উঠিল।

নারিকেল ফল যখন বাহিরে সুন্দর হরিৎ-শোভা-মণ্ডিত ও পুষ্ট হয়, ভিতরেও তেমনি অলক্ষ্যে স্বাদু নীর ও শ্বেতশস্যে পূর্ণ হইতে থাকে। নদীস্রোত বহিয়া গেলে যেমন তলদেশে ধীরে ধীরে পলি পড়িয়া যায়, সেইরূপ দেহ ও মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরেও অজ্ঞাতসারে একটা সুন্দর স্তর পড়িয়া আসিতেছিল। কর্ম্মের ফলে ধীরে ধীরে জ্ঞান ও ভক্তি বিকশিত হইতে লাগিল। ভগবানকে পূর্ণ ও দয়াময় বলিয়া বোধ হইল। বুঝিলাম আমার কর্ম্মফল আমিই ভোগ করিতে বাধ্য! ইহার জন্য অন্য কেহ দায়ী নহে। আমারই দুষ্প্রবৃত্তি দমনের জন্য এই শাসনের ব্যবস্থা।

শরীর পুনরায় রোগ-বিমুক্ত, পুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত হওয়াতে, লোকেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নানারূপ বলাবলি করিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহারা মহাপাপী বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া দূরে চলিয়া যাইত, তাহারাও পরম সাধু জ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত চক্ষে দেখিয়া যাইত। ভারে ভারে খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্রাদি আসিয়া উপস্থিত হইত। দলে দলে লোকজনের আগমন, অজস্র প্রশ্ন ও উপদেশ এবং প্রার্থনায় আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

আষাঢ়ীয় পূর্ণিমা সমাগত; সেদিন দুই তিনটী সাধু আগমন করিলেন। কিন্তু আমার মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি দু'দণ্ড থাকিতে নিদ্রাভঙ্গে ভাবিয়াছিলাম, হয়ত গতবারের ন্যায় স্বপ্নে দর্শন দিবেন কিন্তু বঞ্চিত হওয়াতে বড়ই কাতর হইলাম। পরদিন নবাগত সাধুগণের মধ্যে একজন বলিলেন,—তুমি এখনি গঙ্গাস্নান করিয়া আইস।

আ। আপনি কে?

সা। সে পরিচয় তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই।

আ। তবে আপনার কথা শুনিব কেন?

সা। তুমি কি জান না যে, আজ হইতে তোমার নূতন ব্যবস্থা হইবার কথা আছে?

আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"হাঁ আছে বটে, তবে তিনি ত' অন্য লোক।

সা। তাঁহার সঙ্গে আমার জনকপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি তোমাকে অন্য নূতন ব্যবস্থা দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। তুমি স্নান করিয়া আইস, এখনি এস্থান হইতে যাত্রা করিতে হইবে।

স্নান হইলে "অপবিত্র পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরী-কাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তরেঃ শুচিঃ। এই শ্লোকটী মনে মনে ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে বলিলেন ; এবার আর অৰ্দ্ধস্ফুটভাবে নহে। পরে দুইজনে সেখান হইতে যাত্রা করিলাম ; চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাটে আমাকে রাখিয়া সাধু দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কেবল বলিয়া গেলেন যে শরীর ও মন যদি সুস্থ ও শ্রীসম্পন্ন রাখিতে চাও, ত' কদাচ অনাচারী হইও না, উচ্ছিষ্ট বা অভক্ষ্য ভক্ষণ করিও না।

শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, মন অতি প্রফুল্ল, হতাশা ও কাতরতা মিলাইয়া গিয়াছে ; তথাপি জপে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। মন ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার দেশের ও ললিতার প্রতি ছুটিতেছে। মনে হইল দেশে থাকিয়া এখন হইতে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করি, এ কষ্টকর বৈরাগী জীবন আর ভাল লাগে না। আত্মীয়-স্বজন, গৃহ ও বিশেষতঃ ললিতাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বারম্বার জাগিয়া উঠিতেছিল। শঙ্কিত হইলাম, সে কি! যার জন্য এত ক্লেশ, অপমান ও জীবন-মৃতবৎ অবস্থা, তার প্রতি আবার অনুরাগ! মন বুঝাইয়া দিল, না—ললিতার বিশেষ কোন অপরাধ নাই ; এ সমস্ত তাহার অনুগৃহীতগণের কারসাজীতেই হইয়াছে। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলাম একি! যাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এত চেষ্টা, পরিশ্রম, আবার কি না সেই আবর্ত্তে ডুবিয়া মরিবার প্রয়াস। আমি যে কায়মনোবাক্যে শপথ করিয়াছি যে, পূর্ব্বজীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্র ধৰ্ম্ম জীবন যাপন করিব। বিশ্বাসঘাতক মন বুঝাইল,—তা কেন, দেশে থাকিয়া কি ধৰ্ম্ম জীবন যাপন করা যায় না? কেবল দূর হইতে ললিতাকে দেখিয়াই তৃপ্ত থাকিবে। বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম, হায় অকৃতজ্ঞ মানব! হায় বিশ্বাস ঘাতক মন! যখনই বিপত্তি—যন্ত্রণা—রোগ-ভোগ, তখনই শপথ, ভক্তি ও পবিত্র ভাব, কাতরতা, প্রার্থনা এবং ধৰ্ম্ম জীবনের প্রয়াস বা মর্কট বৈরাগ্য! আবার যখনই ব্যথা কমিয়া ক্ষত স্থান শুষ্ক হয়, তখনই সকলি ভুলিয়া যাও! এইজন্যই বোধ হয় কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, নারায়ণ বিপদ দিও, সম্পদ চাই না। জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী জটিল কৰ্ম্ম-সূত্রের বন্ধন বুঝিতে না পারিয়া, অজ্ঞ মানব বলিয়া থাকে যে, ভগবান পাপের পরিণাম যদি দুঃখ হয়, ত' হাতে হাতে তাহার ফল দাও না কেন? তা'হলে কোন্ কৰ্ম্মের কি ফল বুঝিয়া সাবধান হই। পূর্ব্ব জন্মগত কৰ্ম্মফল রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

একদিন মধ্যাহ্নে এক দীর্ঘাকার হিন্দুস্থানী ব্রহ্মচারী ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—চল, তোমাকে এখনি এস্থান হইতে যাইতে হইবে। আমি বলিলাম, কেন? সাধু কর্কশ স্বরে বলিল বাবাজীর আদেশ অধিক বাক্যব্যয় করিওনা। অগত্যা তাহার সঙ্গে বেলুড় পর্য্যন্ত আসিলাম। সাধু অত্যন্ত স্বল্প ও কর্কশ ভাষী, একেবারে ঘোর বৈদান্তিক, সমস্ত নস্যাৎ। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও ধমক্ দিয়া উঠিতেন। এ স্থান অত্যন্ত নির্জ্জন, চতুর্দ্দিক পেয়ারা ও কণ্টক বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। সে জঙ্গলের ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন অত্যন্ত দুরূহ। চতুর্দ্দিকে নরমুণ্ড এবং অস্থিমালা বিক্ষিপ্ত। একত্রে এত নর অস্থির প্রচুর সমাবেশের কারণ বুঝিলাম না। আমার পক্ষে এই স্থানে বাস অতীব সঙ্কটময়। নির্জ্জনতা ও ভীষণতায় পুনরায় সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হইল। সাধুটী অনেক সময়েই থাকিতেন না, যেন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আগ্রহের সহিত অন্বেষণ করিতেন।

শয্যা ছিল না, আহারও তদ্রূপ কদর্য্য, তদুপরি কঠিন বন্ধন। প্রাতঃকাল হইলেই হস্ত ও পদদ্বয় লতাগুল্ম দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিতেন। হস্তদ্বয় সম্মুখ ভাবে প্রসারণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ন্যায় ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতাম; রৌদ্রের উত্তাপ বাড়িয়া উঠিলে উপুড় হইয়া পড়িতাম। ভয় হইল কাপালিক নাকি! পলাইবার উপায় নাই, অথচ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইত না। লোকটা শক্তিমান নিশ্চয়ই, কেননা তাহাকে দেখিবামাত্র ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম। দিবাভাগে কাঁচালঙ্কা ও নিমপাতা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, রাত্রে কোন দিন ছাতু, কোন দিন পুরী বা ফলমূল ইহাই আহার। ভয়ে, সন্দেহে ও অবস্থা বিপর্য্যয়ে শরীর ও মন দিন দিন শুকাইতে লাগিল। তিন দিন গত হইলে সাধু বলিলেন,—"ব্রহ্মচর্য্য বিহীনস্ত জীবনম্ বৃথা ধারণম্" এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিবে। আমি বলিলাম,—কেন?

সা। তোমার বাবাজীর আদেশ। আমি বলিলাম, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য জিনিষটা কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। সাধু কর্কশ ভাবে বলিলেন, তুমি এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; এখনো অধিকারী হও নাই। তবে এইটুকু জানিয়া রাখিও, যখন কাম ক্রোধাদি রিপু বর্জ্জন করিতে পারিবে, তখনই তুমি অল্পে অল্পে ব্রহ্মচর্য্য পালনের অধিকারী হইবে। আরও এক সপ্তাহ গত হইলে পদদ্বয়ের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। মনে করিলাম পলাইয়া যাই,

কিন্তু আপাততঃ আশঙ্কার কারণ নাই দেখিয়া পলাইলাম না। ভাবিলাম "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?" দেখি না ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়!

এই সময়ে সাধু প্রচুর পানীয় ও ফলমূল রাখিয়া ৫।৭ দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গেলেন। তখন অবশ্য অন্য কোন বিশেষ অসুবিধা ছিল না, তবে শরীর ও মন ক্রমশঃই দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। একদিন হঠাৎ আসিয়াই বলিলেন,—চল, এখান হইতে কালীঘাট যাইতে হইবে। ভাবিলাম, এইবার বলি দিবে নাকি? কিন্তু কালীঘাটের ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানে কিসের ভয় সুতরাং যাত্রা করিলাম। কালীঘাটে আসিয়া গঙ্গা স্নানান্তে সাধু বলিলেন,—এখন তোমাকে এইস্থানেই থাকিতে হইবে; এবং এই মন্ত্রটী সর্ব্বদা আবৃত্তি করিবে; "যত্র নারী তত্র গৌরী।" আরো বলিলেন যে প্রত্যূষে ও সায়াহ্নে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্য প্রণাম করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত পদদ্বয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার বা পথ চলিবার সময়—

"সমুদ্র মেখলে দেবী পর্ব্বত স্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণু পত্নী নমস্তভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"

এই শ্লোকটী মনে মনে আবৃত্তি করিয়া ভাবিবে যে, এক জন পাপী হইয়াও তোমার ভার ধরিত্রী মাতাকে বহন করাইতেছ; এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। সেই দিনই সাধু ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহার আর কোন সন্ধান পাইলাম না।

এখানে কিছুদিন বেশ আনন্দেই ছিলাম; বিশেষ কোন ক্লেশ বা অভাব ঘটে নাই। একদিন আসন তুলিতে গিয়া দেখিলাম, আসনের নিম্নে এক টুক্‌রা তুলট কাগজে লেখা আছে যে, এইবার উত্তর মুখে গমনপূর্ব্বক ঘোষ-পাড়া নামক স্থানে অবস্থান করিবে এবং

"সদা সত্য বচন অধীনতা উর পরস্ত্রী মাতৃসমান।
তিনোসে না হরি মিলে ত' তুলসী ঝুট্ জবান॥"

এই দোহাটী মনে মনে আবৃত্তি করিবে। হস্তাক্ষর বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। কাল্‌নায় অবস্থান কালে বিষম বিপত্তিকালে এই হস্তাক্ষর প্রথম দেখিয়াছিলাম। যাহা হউক ঘোষপাড়া যাত্রা করিলাম, তথায় কিছুদিন অব স্থানের পর একজন বাবাজীর সহিত পরিচয় হইল। বাবাজীটী অতিশয় সরল, বিনয়ী, কোমলান্তকরণ ও প্রকৃত ভক্ত। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে বাবাজী

পুরুষোত্তম যাইবার সময় আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরে ব্রহ্মপুর নামক স্থানে এক মহা সাধু পীড়িত হইয়াছেন; আমি যেন তথায় যাইয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করি; তাহা হইলে ইহ-পরকালে মঙ্গল হইবে।

ব্রহ্মপুর যাত্রা করিলাম; আসিয়া দেখি আমার সেই মুক্তি দাতা এক চক্ষু বিহীন সাধু! এক বৃক্ষমূলে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় দারুণ রোগে এক প্রকার ভূ-শয্যায় শায়িত। যুগপৎ আনন্দ, দুঃখ, কৃতজ্ঞতা ও অভিমানে চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল। যিনি আমায় ঘৃণিত কুষ্ঠ রোগের সময় নিকটে আসিয়া সস্নেহে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার এই কষ্ট ও অসহায় অবস্থা! পায়ে ধরিয়া এই সকল কারণে কত অনুযোগ করিলাম। তিনি কেবল নিস্প্রভ অস্তমিত চন্দ্রের ন্যায় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কাতর হয়ো না বাবা, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া থাকে, এ সমস্তই ইষ্টদেবের কৃপা।"

যাহা হউক প্রাণপণ চেষ্টা ও সেবা শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিলে, একদিন হঠাৎ সেই দীর্ঘাকার বৈদান্তিক ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত। নির্নিমেষ নয়নে উভয়ে উভয়ের দিকে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল, বহুদিনের পর অভাবনীয় ভাবে পিতাপুত্রের মিলনে বা কেহ অকস্মাৎ কোন হারানিধি খুঁজিয়া পাইলে যেরূপ অবস্থা হয়, ইঁহাদেরও যেন সেই ভাব। আমরাও পরস্পরকে দেখিয়া একটু অবাক্ হইয়া গেলাম।

ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, দরদর ধারায় নয়নাশ্রু ঝরিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী পদধূলি লইয়া স্নেহ-বিজড়িত স্বরে বলিলেন,—"বাবা এমন করিয়া কি আমাদের কাঁদাইতে হয়? আমরা যে আজ কতদিন ধরিয়া কত স্থানে বৃথা অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ভগবানই জানেন। সাধু কেবলমাত্র হাসিয়া স্নেহভরে মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্রমে জানিলাম বাবাজী বিখ্যাত সাধু পওহারী বাবা এবং বৈদান্তিকের নাম ব্রহ্মচারী রামানন্দ।

বাবাজীর অনুমতি ক্রমে ব্রহ্মচারী রামানন্দজী সেই স্থানেই আমাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সে দীক্ষা যে কি, তাহা তোমায় বলিব না; তোমারও জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। ব্রত লইয়া অবধি মৌনী ও ঊর্দ্ধবাহু। যে বাক্‌শক্তি ও দক্ষিণ বাহুর অপব্যবহারে আমি চরিত্রভ্রষ্ট,

কুপরামর্শ, মিথ্যা কথন ও নরহত্যায় লিপ্ত হইয়াছিলাম, সেই দুইটী প্রধান কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ইহ জীবনের জন্য পরমাত্মার নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। আমার গভীর বিশ্বাস যে এই ত্যাগে পূর্ব্ব কর্ম্মগুলি ভবিষ্যৎ ফল দানের জন্য সঞ্চিত হইবে না। এখনো সেই আমি,—আমার প্রকৃত 'আমিত্বের' বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই; তবে অদ্ভুতরূপে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের 'আমি'—না পাপী; না পুণ্যবান।

বৃথা কৌতূহল সৃজনের বা নূতন ধরণের গল্প পাঠের জন্য এ বৃত্তান্ত তোমাকে দিই নাই। ইহাতে তোমার চাঞ্চল্য দূর হইয়া শান্তি, সন্তোষ এবং জানিবার, শিখিবার, বুঝিবার ও পাইবাব অনেক বস্তু আছে; এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই লিখিলাম।

আরো দুই একটী কথা আছে। আমার পূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া যেন ঘৃণা করিও না, তাহা হইলে তোমার প্রত্যবায় হইবে। দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসী বা উদ্ধবাহু সম্প্রদায়ের প্রতি যেন মনে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব পোষিত না হয়। লোকে কত ভাবে, কত বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া বন্ধন কাটাইয়া স্রোতে আসিয়া পড়ে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বরঞ্চ আমার মত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্প; কেননা এরূপ ব্যক্তির বৈরাগ্য সচরাচর দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না।"

আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পড়িলাম; পড়িয়া মনে এককালীন বহুবিধ ভাব ও চিন্তার সমাবেশ হইয়া, কখনো উৎফুল্ল, কখনো স্থির—বিস্মিত, কখনো বা রোমাঞ্চিত হইলাম। একবার এই ঊর্দ্ধবাহু ও এইরূপ সাধুদের প্রতি ঘৃণার ভাব আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাম্‌লাইয়া ফেলিলাম। বরঞ্চ আমার প্রতি সাধুর অনুকম্পা ও সহৃদয়তা দেখিয়া মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম।

পরদিন যথারীতি সাধুর নিকটে গিয়া দেখিলাম, স্থান শূন্য। শুনিলাম তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ধুনি সদ্য নির্ব্বাপিত, অঙ্গার ও ভস্মরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

1914
BUILDI

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

য় ভাগ। শ্রাবণ, ১৩২১। ৪র্থ সংখ্যা।

মোক্ষ]

পূজার ফুল।

আকাঙ্ক্ষা।

এই যে আমার শীর্ণ দেহ, এই যে আমার জীর্ণ গেহ,
তারি মাঝে ঢাল্‌ছ বসে উজল আলোর প্রভা রাশি।
এই যে দুঃখ তাপে মলিন ক্ষীণ হৃদয় শুষ্ক কঠিন,
তারি মাঝে মধুর স্বরে, বাজাও তোমার মোহন বাঁশী।
চাইনা তোমার দিকে ফিরে, আমায় তবু আছ ঘিরে;
সর্ব্ব দিকে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বরূপে রাজ-তপসি।
এমন ক'রে তোমার পানে, টান্‌ছ আমায় প্রাণে প্রাণে;
সেই তুমি কে? কেমন তুমি? দেখ্‌তে তোমায় ভালবাসি।

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক-চৌধুরী।

মোক্ষ]

জ্ঞানই—অগ্নি।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ॥

আগুনে কি করে তা' অবশ্যই জান; তবুও একবার বলি। কাঠ পেলে কাঠকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে, লোহা কি অন্য ধাতু দাও গলিয়ে জলের মত করে দিবে; মূল্যবান্ ধাতু—সোনা রূপার মধ্যে যদি কোন খাদ থাকে, তা বার করে দিয়ে ধাতুটিকে মলশূন্য উজ্জ্বল করে দিবে,—তা'র কত চাক্‌চিক্য বাড়িয়ে

তুল্‌বে। ঘর বাড়ী পেলে তো কথাই নাই,—বেশ করে পুড়িয়ে তার চারিদিকের মানুষের হাত-গড়া ও মন-গড়া ব্যবধান গুলো নষ্ট করে ফেল্‌বে। খাদ্যদ্রব্য,—যদি নজর রাখ্‌তে পার, তবে পাক করে আহারের উপযোগী করে দিবে! একটা পাত্র ক'রে যদি আগুনের উপর জল চাপিয়ে দিতে পার, তবে জলকে বেশ ক'রে সিদ্ধ করে, তার মধ্যে দুষ্ট কীটানুদলকে ধ্বংস করে স্বাস্থ্যের অনুকূল পানীয়ে পরিণত ক'রে দিবে! তোমার গায়েতে এক টুক্‌রা রগ্‌রগে আগুন যদি ফেলে দেওয়া যায়, তুমি যত কুড়েই হও, আর স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার্‌বে না। দু' হাত তুলে চারিদিকে নেচে বেড়াবে! সেকালে আবার এই অগ্নিদেবই জজ সাহেবের মত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য বিচারের ভার লইতেন। আজকাল যে তিনি এ কাজ হতে পেন্সন লইয়াছেন, তাহা আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না! যাই হ'ক আগুনের এত গুণ—আগুন দেবতা নয় ত' কি? যা'রা জড়বুদ্ধি, তারাই অগ্নিকে জড় পদার্থ মধ্যে গণনা করে!

লোক হাহাকার করে উঠ্‌চে,—"ওরে আগুন লেগেছেরে, ঘর পুড়ে গেল, পাড়া পুড়ে গেল, দেশ জ্বলে গেল—বাপ্‌রে, মারে"—অগ্নির এই বিভীষণ করাল মুর্ত্তি দেখে লোকে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ে! কিন্তু বাপু এই আগুন লোকের সর্ব্বস্ব নষ্ট করে দিবার সময়েও লোকের যে উপকার করে, মানুষ উপকার কর্‌বে ব'লে কোমর বেঁধে এসেও ততখানি উপকার কর্‌তে পারে না। বায়ুর মধ্যে যে সব রোগ বীজাণু বিবিধ ভোগ্য পদার্থের মধ্যে বসত-স্থান পাবার জন্য অহরহঃ অন্বেষণ ক'রে ফির্‌চে, এই সকল দস্যুগুলিকে ঘর জ্বালাইবার অছিলায়, অগ্নি তাহাদের গলহস্ত দিয়া দেশের বার করে দিয়ে আসেন! মানুষের এমন বন্ধু আর কে? তাই আর্য্য ঋষিরা অগ্নিদেবকে আপনাদের যজ্ঞ-কর্ম্মের পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন!

এই অগ্নির রূপ অনেক; এবং সর্ব্বত্রই তিনি দহনকার্য্যে ব্যাপৃত! জঠরের মধ্যে ইনিই জঠরাগ্নি। প্রতিদিন চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ ভুক্তান্নকে পরিপাক কর্‌চেন এবং তাঁহার ভোগ-ভুক্ত অন্নই মনুষ্যের মধ্যে কান্তি, বল, ধী-রূপে পরিণাম লাভ করিতেছে; ইহাই মনুষ্য-সমাজে, পুষ্টি, আরোগ্য, শান্তি বিধান করিয়া সমাজকে এক অপূর্ব্ব শ্রী প্রদান করিতেছে। প্রাণের মধ্যে অগ্নি একটু কমিলেই চিকিৎসকের বাড়ী ছুটাছুটি করিতে হয়; দেশ-বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের ধুম লাগিয়া যায়! মনের মধ্যে আবার ইহার একছত্র রাজত্ব। কখন কামাগ্নি, কখন চিন্তাগ্নি, কখন ক্রোধাগ্নিরূপে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ

করেন। তখন এই বিশ্ব সংসারটাকে একটি কুম্ভকারের চক্র বলিয়া ভ্রম হয়! সেখানে তখন শরীর ও শরীরস্থ ধাতুগুলিই কাষ্ঠের কার্য্য করে। এই অগ্নিরই আর এক মূর্ত্তি আছে, তাহার ন্যায় পবিত্র ও হিতকর বুঝি এ জগতে আর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণের ধীর বাতাসে এই মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে, ইহারই নাম জ্ঞানাগ্নি। তখন মানুষের এই দেহখানি এবং তাহার কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি নিচয় ইহার ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন অগ্নিতে যত কাষ্ঠ সংযোগ করিবে, অগ্নি ততই 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি দিক্ সকলকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিবে; তেমনি তপস্যা ও পুণ্য প্রভাবে জ্ঞানাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে, সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিবে। সেই জ্যোতির সাহায্যেই আমরা শুক্ল দেবযান পন্থাকে চিনিয়া লইতে পারি—"তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ"। অগ্নি যতক্ষণ গুপ্তভাবে কাষ্ঠের মধ্যে বাস করেন, ততক্ষণ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, শুধু কাষ্ঠকেই দেখিতে পায়। আবার অগ্নি প্রকাশ পাইলে কাষ্ঠ আর কাষ্ঠ থাকে না; তখন তাহাও অগ্নি হইয়া যায়। তদ্রূপ আমার মধ্যে যে জ্ঞান গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন, সাধু ও গুরু কৃপায় যখন তাহা প্রকাশিত হয়, তখন দেহটাকে পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে, শরীরটাকেও তখন যেন শুধু জ্যোতি বলিয়া মনে হয়। কাষ্ঠ যখন অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মাবশেষে পরিণত হয়, তখন শুধু অগ্নি-জ্যোতির একটা 'অরূপ' তেজঃ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। যখন মানুষের অসংখ্য কর্ম্ম-কাষ্ঠ সেই জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ছাই হইয়া যায়, তখন জ্ঞানাগ্নি ফুটিয়া ধক্ ধক্ করিতে থাকে, তাহাতে মানুষের দুশ্চিন্তা, সঙ্কল্প, অহংকার প্রভৃতি কাম-শরীর—সেই প্রদীপ্ত অগ্নি-জ্বালার মধ্যে আত্ম-গোপন করে! এই আগুন তোমার আমার সকলের মধ্যেই আছে। "ষ্যায়সে গিরিসুত্ মে জ্যোতি"—এই জ্যোতিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই মনুষ্যের নিষ্কাম কর্ম্ম;—এই জন্যই তাহার জীবনব্যাপী সাধনা! প্রস্তরের মধ্যে অগ্নির প্রকাশ দেখিবার জন্য যেমন আর একখানি প্রস্তরের প্রয়োজন, তেমনি এখানেও জ্ঞানাগ্নি ছুটাইবার জন্য সদ্‌গুরুরূপী একখানি প্রস্তর খণ্ডের প্রয়োজন হয়। এই অগ্নির প্রকাশ হইবামাত্র, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার হওয়ার মত সমস্ত অজ্ঞানতা—সমস্ত জড়তা ও কর্ম্ম-বন্ধন কোথায় মিলাইয়া যায়। তখন খালি আগুন! সর্ব্বত্রই আগুন! কেবল প্রকাশ, কেবল জ্যোতি, কেবল আলোক! একেবারে সমস্ত দিক্ ভরপুর হয়ে উঠে। আলোকসম্পাতে সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে এক অপরূপ

রূপ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় ;—তখন মনে হয় এক অখণ্ড ভাতি এই ভুবনত্রয়কে আচ্ছাদিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। জড়তাতে দেহকে বড় ভার করে ; দেখনা কেন, আল্‌সেগুলো উঠ্‌তেই চায় না, সব কাজই তা'দের কাছে ভার বলে বোধ হয়! আগুনের কাছে থাকৃলে এই জড়তা ভাঙ্গে! শীতকালে ঠাণ্ডার সময় যখন সমস্ত শরীরটা জড়বৎ হ'য়ে উঠে, তখন অগ্নির কৃপাতেই আমরা কি জড়ত্বের কঠিন নিগড় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি না? অগ্নি শোক হরণ করে। শোক তো মোহেরই কাজ কি না, অগ্নি প্রকাশ স্বরূপ ; তা'ই আগুনের প্রকাশময়ী সত্ত্ব শক্তির নিকট মোহের তামসিক শক্তি টিকিতে পারে না! অগ্নি যে শোকনাশক, তাহা শবদাহের সময় বেশ বুঝিতে পারা যায়! পূর্ব্বকালে তাই ব্রাহ্মণেরা অগ্নিকে জীবনের সাথী ক'রে রেখেছিলেন! তাঁহারা ভিতরে বাহিরে এই আগুনের ধুনি জ্বালিয়ে রেখে দিতেন বাহিরের অগ্নি যা দেখ্‌ছ, তাই ভিতরের অগ্নি—জ্ঞান! তাহা আবার লৌকিক ভেদে দুই প্রকার। লৌকিক এই যাহাতে ইন্দ্রিয়-সাধ্য বস্তুজ্ঞান হয়, অলৌকিক জ্ঞানে অতীন্দ্রিয় পরমার্থ জ্ঞান হয় এই অগ্নির উপাসনা কর্‌তে কর্‌তে "যো দেব অগ্নৌ" প্রকাশিত হ'য়ে পড়েন! সেই অগ্নিদেবই হচ্ছেন তোমার "অপূর্ব্বং জ্যোতিষাং জ্যোতি"; আত্মানুসন্ধানীরা তারই সন্ধান জেনে কাজ গুচিয়ে নেন, তখন এই পরমতত্ত্বকে লাভ করে, অন্য লাভকে তাঁরা লাভ বলেই মনে করেন না! আত্ম তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরা তাঁরই জন্য সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্যে অটল-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকেন। এই জ্যোতি দেখেই অর্জ্জুন ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন ;—

"লেলিহ্যসে গ্রসমান্‌ সমন্তাল্লোকান সমগ্রান্‌ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরা পূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।"

প্রথম প্রথম রোগ, শোক, অভাব, দুঃখের আগুনে মানুষ জ্বলে পুড়ে মরে : তবুও এই আগুনকে মাথায় থেকে কখন নামায় না—এই আগুনের প্রবাহের মধ্যেই সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। কোন কিছুতেই যখন তার মনকে অবসন্ন করতে পারে না, সেই—পরে এই বিদ্যুজ্জ্বালাময়ী প্রকাশের অভ্যন্তরে কোটি সূর্য্যের প্রকাশ এবং তন্মধ্যে "চন্দ্রকোটি সুশীতলম্‌" অবস্থা দেখে আশ্বস্ত হয়! তাহার মনুষ্য-জীবন ধন্য হয়! যে এই পরম জ্যোতি না পায়, সে কেবল আগুনের জ্বালাই অনুভব করে ; এর প্রকাশ শক্তিকে—জ্ঞানময়ী দিব্যশক্তিকে বুঝিবার অবসর পায় না! এস আমরা সেই প্রকাশমান শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের চরণ বন্দনা করি।

মোক্ষ]

প্রত্যাবর্ত্তন।

১।— আমি পাতকিনী, তোমারে ভুলিয়া, দেহেরে স'পেছি প্রাণ,
নীচ সহবাসে, নারকিনী হ'য়ে, খোয়ানু তোমার মান!
ভালবেসে মোরে, যাহা দিয়েছিলে, সকলি স'পিনু তা'য়,
তবু তার মন, না উঠে কখন, দহে মোরে পায় পায়!

২।— কত না সোহাগে, ধরিনু চরণে, মরম দলিয়া গেল,
আদরে অধরে, সুধা বাঁটি দিতে, সকলি গরল ভেল!
কিন্তু নাথ! তুমি এত অযতনে পাসরিলে নাহি মোরে,
আড়ালে দাঁড়ায়ে আমার লাগিয়ে তিতিছ নয়ন-লোরে!

৩।— সে যে নিদারুণ, তুমি কি করুণ, ক্ষমার নাহিক ওর,
নাহি কর রোষ, নাহি ধর দোষ ভাঙ্গিল গরব মোর!
সাজায়ে পসরা, দিয়েছিলে ভরা, ভাসায়ে নদীর জলে,
আজি ভাঙ্গা তরী ডোব' ডোব' হ'য়ে, ফিরিল চরণ তলে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

মোক্ষ]

মোক্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে মোক্ষতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি জ্ঞান-ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এ বিষয় বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক; কারণ ধর্ম্মার্থকাম এই তিনটির পরিজ্ঞান না হইলে প্রকৃত ভাবে মোক্ষতত্ত্বের কথঞ্চিৎ উপলব্ধিও সম্ভবপর হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজকাল লোকের বুদ্ধি ঐকদেশিক ভাবে সনাতন-শাস্ত্র-রূপ মহামহীরুহের শাখা-প্রশাখার তথ্য নিরূপণেই প্রযোজিত। মূল তত্ত্ব সমূহের কথঞ্চিৎ অবভাস না জন্মিলে, শাখা প্রশাখাদিরও প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। সেই জন্যই আমরা চৈতন্যের মূল ভাষা বুঝিয়া, তাহার পরে "ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলং জ্ঞানং" বুঝিবার চেষ্টা করিব। কি বৈজ্ঞানিক ভাবে বাহ্য 'বহু'র অনুশীলন দ্বারা, কি দার্শনিক ভাবে আমাদিগের নিজ চৈতন্যের অনুশীলন দ্বারা,—বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদিগের চৈতন্যের অভ্যন্তরে দুইটী

মৌলিক প্রবৃত্তি গতি বা প্রবণতা (trend) আছে। একই চৈতন্য "উভয়ায়িত আত্মানং" (polarised) হইয়া একদিকে কেন্দ্র জ্ঞানে 'আমি' বা 'পুরুষ' প্রভৃতি ভাবে,—অপর দিকে 'সর্ব্ব,' 'বহু' বা জগৎ'ভাবে খেলিতে থাকে। একথা সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত গত বৎসরের "মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রামকে সম্মোহিত করিয়া তাহার চিত্ত হইতে 'সে রাম' প্রভৃতি বুদ্ধি অপসারিত করিয়া দেওয়া হইল। তারপর তাহাকে একটী বালিশ প্রদান পূর্ব্বক বলা হইল যে, এইটী তাহার সন্তান; সে অমনি সংস্কার বশে সেই বালিশটীকে অঙ্কে স্থাপন করতঃ সন্তান বোধে আদর করিতে লাগিল। সে স্ত্রী কি পুরুষ এরূপ কোনও কথাই তাহাকে বলা হয় নাই। তাহার পর তাহাকে একগাছি বালা পরিধান করিতে বলা হইল। অনেকেই অবগত আছেন যে, ধনবান্ নন্দনগণও শৈশবে বলয়াদি অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে; সুতরাং এই বলয় পরিধান ব্যাপারেও তাহার স্ত্রী কি পুরুষ বুদ্ধি উন্মেষের কোনও কারণ নাই। কিন্তু রাম, চৈতন্যের কি আশ্চর্য্য গতির বশে পূর্ব্বোক্ত সন্তান পালন ও বলয় ধারণ উভয় ব্যাপারই সমানুপাতী করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে বিরাজমান, অথচ অনির্দ্দিষ্ট (undefined) 'আমি' ভাবটীর সহিত মিলিত করিয়া দেখিবে। ওরূপ ভাবে মিশাইলে কাজে কাজেই স্ত্রীবুদ্ধি জাগরিত হইবে। তাহার পর তাহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে আদেশ করিলে, সে স্ত্রীলোকের মত করিয়াই বস্ত্র পরিধান করিবে। এ প্রকার স্ত্রীজন সুলভ বস্ত্র পরিধানের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে, সে বলিবে 'সে স্ত্রীলোক, তাহার নাম সরোজিনী'। তদনন্তর তাহার সরোজিনী ভাবের পিতা, মাতা, পতি প্রভৃতি সর্ব্ব' ভাব আপনা আপনি প্রকটিত হইতে থাকিবে। এস্থলে বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি বৃত্তিগুলির জ্ঞান হইয়াই চৈতন্যের খেলার শেষ হইল না। অপিচ ঐ সকল বৃত্তি হইতে, প্রতি বা বিপরীত ভাবে বিম্বিত হইয়া,—প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন 'আমি'র অভিমুখী একটী গতি প্রকাশিত হইল। ঐ গতির বশেই সন্তান পালন, বলয় ও বস্ত্রাদি পরিধান নানা 'বাহ্য' ভাবের সমানুপাতী, অথচ অতিগ একটি আমি' বোধ জাগরিত হইল। এই গতিটিকে শাস্ত্রে 'প্রতি' (বিপরীত ভাবে) অঞ্চতি (মিশিয়া যাওয়া) অর্থাৎ বিপরীত ভাবে মিশিয়া যাওয়া বা 'প্রত্যয়', 'প্রত্যভিজ্ঞতা', প্রত্যগ্‌জ্যোতি প্রভৃতি শব্দে ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে। 'উপনিষৎ' এই গতিকেই "সা কাষ্ঠা সা পরাগতি" বাক্যে অভিহিত করেন।

এই গতিটির বিষয় আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। ইহা

বৃত্তি সমূহের সমানুপাতী হইলেও বৃত্তির বিরুদ্ধ ধর্ম্মী। বৃত্তিগুলি বাহিরে আসিয়া পড়িতে চায়; আর এই গতি অন্তর্ম্মুখী হইয়া মিশিয়া যায়; ইহা কেন্দ্র বা একত্ব অভিমুখী; বৃত্তি নিচয় 'বৃত্ত' বা 'সর্ব্ব' অভিমুখী। ইহা বৃত্তি সমূহের সংযোগ বা জন্য-ফল নহে; বৃত্তিসমূহ হইতে (উৎ-স্থিত) উত্থিত হইলেও এই 'আমি'টি বিশিষ্ট বৃত্তিরাশিতে পরিসমাপ্ত নহে; কারণ তাহা হইলে সম্মোহিত রাম কেবল সন্তান পালন ও বস্ত্র পরিধানের ভাণ মাত্র করিতে সমর্থ হইত, অপর কিছুই করিতে পারিত না। 'আমি সরোজিনী' এই বোধে সমস্ত বৃত্তি, ক্রিয়া, স্মৃতি ও ভাবরাশির দ্রষ্টা হইয়া খেলিতে পারিত না। রামের স্মৃতিতে পুরুষ ভাবেরই আধিক্য ও প্রাবল্য আছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার স্মৃতি-ক্ষেত্র হইতে স্ত্রীবুদ্ধির উপযোগী ভাবগুলি সংগৃহীত (Select) হইয়াও সেই গুলিকে সংমিশ্রিত (co-ordinated) করিয়া 'আমি' জ্ঞানটী স্বপ্রকাশিত হইতেছে। এই সংগ্রাহক শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। এক অধিকরণের সমানুপাতী বৃত্তিসমূহকে অবসান বা লীন করিয়া দেওয়া বা অধ্যবসায়ই বুদ্ধির ক্রিয়া। তাহা হইতে চিত্ত 'আমি' সরোজিনী রূপ খ্যাতি বা বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপাদন করিল। এই খ্যাতি 'পুরুষ' বা 'আমি' নহে; কারণ 'আমি সরোজিনী' না হইয়া সরলা, কমলা, মেরি বা লুৎফুন্নিসা অনেকই হইতে পারিত। এই 'আমি' অভিমুখী গতিটিকে 'পুরুষ' তত্ত্ব বলে।

'পুরুষ' বলে কেন? 'পুরী শয়নাৎ পরিপূর্ণত্বাৎ বা'; ইহাই আচার্য্যের উক্তি। বৃত্তির পুরাভ্যন্তরে সমানুপাতী হইয়া বৃত্তিসমূহের অন্ত বা অবশেষামৃতং রূপে আছেন বলিয়া ইনি 'পুরুষ'; অথচ 'পুর' হইতে পর বা অতিগ; কতকটা যেমন "হাতে আছে হাতে নাই, হাত বাড়া'লে পেতে নাই" গোছের। তাঁহাকে ধরিতে যাও, সে মহা-লম্পট—পলাইয়া উপরে উঠিয়া বসিবে। যদি বল তাহা কি প্রকার? যেমন centre of gravity বা meta-centre এর ন্যায়। জড়ের অবয়ব (volume) ও আয়তন (mass) বৃত্তির ন্যায় 'বিশিষ্ট' অণু সমূহে সংগঠিত। অণুগুলিকে 'সর্ব্ব' ভাবে মিশাইয়াই বস্তুর অবয়ব স্থির রহিয়াছে; কিন্তু উহার কেন্দ্রটি (centre of gravity) কি বিশিষ্ট অণুজাতীয়? বস্তুটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতঃ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও কেন্দ্র বলিয়া কোনও অণু-জাতীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না; কেবল 'বহু' ভাবের অণু সমূহ পাইবে। কিন্তু এই কেন্দ্রের অস্তিত্ব কি অলীক? উহা কি মিথ্যা জ্ঞান মাত্র? উহা অলীক হইলে ব্যবহারে আসিতে পারিত না। বস্তুর যে অংশে ঐ কেন্দ্রের

স্থিতি, তাহার সহিত ভূ-কেন্দ্রের প্রতি রেখাপাত করিলে, সেই রেখা স্থানে একটী সূচ্যগ্র মাত্র সাহায্যে সমগ্র বস্তুটিকে ধারণ করিতে পারিবে। যাত্রিগণ সমারূঢ় তরণী যখন প্রবল ঝটিকাবেগে আন্দোলিত হইতে থাকে ও আরোহিগণ নৌকার নিমজ্জনাশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠে, সে অবস্থায় আরোহিগণ নৌকাগহ্বরে নামিয়া বসিলে, নৌকার meta-centre বা কেন্দ্রটীকে একটু নীচে নামাইয়া আনা হয় ও তন্নিবন্ধন নৌকার আন্দোলন ও বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কা কিয়ৎ-পরিমাণে উপশমিত হইয়া থাকে। বস্তুর কেন্দ্রটী (centre) অবয়বকে ধারণ করিয়া থাকিলেও উহা অণুসমূহের সমজাতীয় নহে। উহা স্থূল—জড় নহে। পরন্তু শক্তিমাত্রা জাতীয় ও জড় ভাবের অতিগ কি এক প্রকারের। অথচ দেখ, ঐ শক্তিকেন্দ্রে অণুগুলির সমস্ত আকর্ষণ (attraction) ও বিশ্লেষণ repulsion) ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। ঐ কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া জড়ের সমষ্টিভূত অণুগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে (inter space) বা আকাশে এমন ভাবে স্পন্দিত হইতেছে যে, সেই স্পন্দন সমূহ সমানুপাতী হইয়া কেন্দ্রে পঁহুছিবামাত্রই স্থির হইয়া যায়; আর গতি বা স্পন্দন থাকে না। সেইজন্যই ঐ কেন্দ্রকে আমরা পুরি—শয় (পুরি—শেতে যঃ) 'পুরুষ' বলিতে পারি। আবার দেখ, ঐ কেন্দ্রের শক্তিবিলাস আছে বলিয়াই, বিশিষ্ট অণুসমূহের অসংশ্লিষ্ট স্পন্দনরাশি ঘন বা পরিপূর্ণ হইয়া বস্তুর একত্বে পর্য্যবসিত হইতেছে। জলের অণুসমূহের ক্ষেত্র (inter space) বরফরূপে প্রসারিত হইয়া গেলেও, উহার কেন্দ্র যেমন তেমনই রহিয়া গেল।

আমাদিগের বৃত্তি সমূহ দৃষ্টান্তের অণু-জাতীয়। উহাদের স্বকায় ক্ষেত্রে 'অবকাশ' 'গুণ' প্রভৃতি আছে। বৃত্তিগুলির এই খেলাকে প্রাকৃতিক খেলা বলে। কাম-প্রবৃত্তির খেলা এক প্রকার, ক্রোধের অন্য প্রকার। দৃষ্টির একরূপ, শ্রুতির অন্যরূপ মনের একরূপ, বুদ্ধির অন্যরূপ। ঐ বৃত্তি নিচয় ও তাহাদের প্রাকৃতিক বিলাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তবে কেন ভাই সংসারি! ধন, মান, পুত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া 'আমিকে' খুঁজিতে যাইতেছ? তবে কেন ভাই 'বিষয়াক্লিষ্ট'! দেহ, প্রাণ, মন প্রভৃতি প্রাকৃতিক তত্ত্বে, পিতৃ-দেবতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি খেলার বিশ্লেষণে সেই 'পর' অতিগ পুরুষকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছ? বৃত্তিসমূহের অভ্যন্তরে যে সমানুপাতী গতির স্বত্বা বিরাজমান, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে আপাতঃ প্রতীয়মান ক্ষুদ্রতা, মোহ, অধর্ম্ম ও পক্ষান্তরে কর্ম্ম বিকাশ, জ্ঞান

প্রভৃতির ভিতর দিয়া কে এক মহান্ পুরুষ এই বৃত্তি সমূহকে আকর্ষণ করতঃ তাহাদের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশিত হইতেছেন। সে যে 'অজাতি'—মাণ্ডুক্য-কারিকার অজাতি—তাঁহারই জন্য ঐ সমুদয় অণু সমূহের জাতি, কুল, মান, গতি উৎসর্গিত হইতেছে। অজ্ঞ লোকেরা যেমন জলের কেন্দ্রকে তারল্য-ধর্ম্ম বিশিষ্ট, ও বরফের কেন্দ্রকে নিশ্চয়ই স্থিতিশীল ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে, ঠিক সেই প্রকার মানব দেহের 'আমিটীকে' মানুষ, দেবদেহের 'আমি'টিকে দেবতা ও পশু দেহের 'আমিটি'কে পশু বলিয়া আমাদিগের ভ্রান্তি হয়। বস্তুর অন্তর্গত অণুসমূহের বিশিষ্ট গতি ও ধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে গুণ, স্বভাব, প্রকৃতি প্রভৃতি ভাবে যেমন করিয়াই যোগ কর না কেন, তাহাতে যেমন কেন্দ্রের কোন জ্ঞানই উপপন্ন হয় না, তদ্রূপ তত্ত্বগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এবং যে কোনও প্রাকৃতিক ভাবে উহাদের যোগ করিলে পুরুষের সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মিবে না। কিন্তু যাই পরাভি-সারিণী গতি (transcendent trend) তোমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে, যাই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মোহ অতিক্রম করতঃ রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি ভাবের ধর্ম্ম-অর্জ্জন বা মোক্ষ-সাধন করিবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবে, অমনি সেই পুরুষের কাল-রূপের আভাস হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে। যখন বাহ্যবস্তু ও তত্ত্বের মধ্যে আর বিশিষ্ট গুণ, ধর্ম্ম প্রভৃতি দেখিতে রুচি থাকিবে না,—যখন পর পুরুষের বীর্য্য বা আভাস হৃদয়ে পতিত হইয়া তোমার বহিঃস্বত্ব ভাব ঘুচিয়া তোমাকে অন্তঃসত্ত্বা করিয়া বাহ্য-বিলাসে তোমার অরুচি জন্মিবে, যখন ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত আকর্ষণ অনুভব করতঃ, সেই আকর্ষণের জন্যই সাধের ব্যক্তিত্বের ব্যবহার করিতে পারিবে, তখনই ত' পুরুষের বংশীরব তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে।

দেখ ভাই, সকলেই 'আমির' প্রয়াস', সকলেই 'আমি' 'আমি' করিয়া কোথায় ছুটিতেছি। 'আমি রাম' বলিয়া, রাম এই সংজ্ঞার অন্তরালে অনন্ত ভাবরাশি, জন্ম কর্ম্ম প্রভৃতি অনন্ত বৃত্তি-সমূহকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ধন চাই, মান চাই, পুত্র চাই, অপরদিকে ধর্ম্ম চাই, যোগও চাই; অথচ এত বিরুদ্ধ ভাবগুলি রামে কি প্রকারে মিশিয়া যাইবে, তাহা জানে না। এই প্রকারে রাম বাহ্য ভাব-রাশিকে ধরিয়া রহিয়াছে; সে ত' সেগুলিকে ঘন করিয়া মিশাইতে সমর্থ হইয়াছে না, সেই সমুদয় সংগ্রহ করতঃ যক্ষের মত বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। রাম যদি উহাকে 'আমিতে' মিশাইতে পারিত, যদি সব আত্মসাৎ করিতে পারিত, যদি অবয়বীভূত বিভিন্ন অঙ্গের ঘন রস বা 'আঙ্গিরস'

তত্ত্বের বোধ হইত, তাহা হইলে কি সে সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের দোলারোহণ করতঃ এই মুহূর্ত্তে হৃষ্ট ও পুলকিত এবং পরক্ষণেই দ্বেষের কূপে নিপতিত হইয়া দারুণ মুহ্যমান হইত? তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ'। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিত্বের স্রোতে পতিত বাম' বাহ্য ভাবে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া জল ও বরফ-কেন্দ্রের পার্থক্যানুভব করিয়া সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণতত্ত্বের ভাষা বুঝিতে পারিতেছে না। সেই পরমাকর্ষক যে প্রেমভরে আকুল হইয়া প্রতি জীবহৃদয়ে 'রাধা' 'রাধা'-ভাবে আপনার জগত-বিধ্বংসকারিণী আকুল পিয়াসার ভাষা জাগরিত করিতেছেন!! তাঁহার আকুল পিয়াসার বশে অনুপ্রাণিত হইয়াই ত' তাঁহাকে 'পরা' ভাবে দর্শনে অসমর্থ জীব বাহিরের সর্ব্ব' ভাবে সেই পিপাসা মিটাইতে চেষ্টিত ও ধাবিত হইতেছে। সত্য বটে ভাই, তোমার হৃদয়ে সুখের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু যে সুখে সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্ত হইবে যে সুখে আর চাঞ্চল্য নাই, আর অস্থিরতা নাই; সেই সুখের টানটি যে দারা-পুত্রাদিতে শেষ বা পরিসমাপ্ত হইবে, তাহা কে বলিয়া দিল? কিন্তু যখন জীব রসিক হইয়া ঐ তৃষ্ণার গতি বুঝিতে পারে, তখন দেখিতে পায় যে ঐ তৃষ্ণা 'সর্ব্ব'ভাব হইতে (উৎ-স্থিত) উত্থিত হইতেছে বটে, কিন্তু 'সর্ব্ব' ভাবে মিশিতেছে না। তখন সে দেখিতে পায় যে উহা 'সর্ব্ব' ভাবে (প্রতিকূলে তিষ্ঠ'ত) প্রতিষ্ঠিত। এক নয়নে 'সর্ব্ব' ভাবের দিকে থাকিলেও উহা জগন্মাতা চৈতন্যময়ীর 'পর-অধিষ্ঠান ও 'পরাগতি' পদর্শন করতঃ জীবকে তাঁহারই পাদপীঠ-সমীপে আনয়ন করিবার জন্য বিরাজমান রহিয়াছে। এইরূপে জীব যখন 'আমির খেলার' অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া বুঝিতে পারে যে,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল;
ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে কে আর আমার আছে,
রাধা বলে আর জুড়াইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে।

তখন 'কর্ম্মচিত লোক' সুখ প্রভৃতি পরীক্ষা করতঃ—"বিবিচ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ পরীক্ষ্য"—আমির পরিসমাপ্তিরূপ 'পর' পুরুষের শরণ গ্রহণ করে। সকলেই যখন 'আমি' 'আমি' বলে, তখন নিশ্চয়ই এক নিষ্কাম 'আমি' আছে, যাঁহাতে এই সকলের পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা। স্রোতস্বিনীর গতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তীরস্থ স্থান ও প্রতিষ্ঠানাদির যতটুকু আবশ্যকতা, পুরুষের পরিপূর্ণতা দেখাইবার জন্য আমাদিগের ব্যক্তিত্বেরও ততটুকু আবশ্যক। সেই

পুরুষের ভাষা একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, জলপ্লাবনে সর্ব্বদেশ প্লাবিত হইয়া গেলে বিশিষ্ট কূপ তড়াগাদির যতটুকু আবশ্যকতা, বেদাদি অনন্ত শাস্ত্রেরও ততটুকু আবশ্যকতা থাকে ;—

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

কিন্তু যদি 'পর'-পুরুষাভিসারিণী বুদ্ধির আবির্ভাব না হয়, তবে—

শরীরং সুরূপং ততো বা কলত্রং,
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরু তুল্যং।
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা ;
সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু—
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং॥

মোক্ষ] উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ভূমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইবার বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। দেশ কালাদি জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। কারণ শ্রুতি প্রথম বলিতেছেন যে আত্মা একই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন "বহুস্যাম. এই ইচ্ছা দ্বারা তিনি প্রপঞ্চাকারে বহু হইলেন। সে অবস্থায় তিনি যে একই আছেন, ইহাও উপনিষদ দেখাইতেছেন। আবার দেখাইতেছেন,—প্রপঞ্চতঃ আকার দেখিতে পাইলেও আত্মার কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই। তাঁহার যেরূপ থাকা উচিত, সেইরূপ পূর্ব্বে ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকিবেন। ইহা দ্বারা কি বুঝিবে? দর্পন-স্থানীয় মায়ায় আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া এক আত্মাই বহু আকারে প্রতিভাসিত হইয়াছেন। বস্তুর প্রতিবিম্ব কিছুই নহে—মিথ্যা, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহা অন্য স্থানে সবিশেষ বর্ণিত হইবে। এইরূপে যে প্রপঞ্চের উপপত্তি করা যায়, তাহাকে 'বিবর্ত্তবাদ' কহে। যাহা যাহা নহে, তাহাকে যে তাহাই দেখা, সেই হইল বিবর্ত্ত। "অতত্ত্বতোঽন্যথা এবং বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ। যে যাহা সে তাহাই থাকিবে, অথচ তাহাকে অন্যরূপে যে দেখা, সেই অন্যথা প্রকাশকে বিবর্ত্ত বলে। একই আত্মার অজ্ঞান-দোষে বহুরূপে প্রকাশই বিবর্ত্ত, এটি কি করিয়া বুঝাইতে পারা যাইবে? না, যদি সৃষ্টিকে

মিথ্যা প্রমাণ করা যায়। সকলেই বলে এ জগত সত্য; শ্রুতি দেখাইতেছেন—এ জগৎ যাহা হইতে হয়, আবার তাহাতেই যাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তবেই দেখ এ সৃষ্টি কিরূপ? আত্মা হইতে হয়, কিন্তু আত্মায় থাকে না; তবেই এ সৃষ্টি কিছুই নহে, মিথ্যা। দর্পণ-গৃহে শত সহস্র দর্পণ আছে, তুমি সে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যে দিকে দেখিবে, দেখিবে সেই দিকেই তুমি;—তুমি তখন শত সহস্র বিম্ব হইতে বিম্বরূপে প্রতিভাসিত। সেই শত সহস্রে তুমি,—স্বয়ং তুমিই কি? যেই শত সহস্রই তুমি; অথচ তুমি ব্যতীত ঐ শত সহস্র "তুমি" হইতে পার না। এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যাহা হইতে যাহা হয়, তাহাতে যদি তাহা না থাকে, তবে তাহা সত্য নহে। আত্মা হইতে জগৎ হইয়াছে, অথচ আত্মায় জগৎ বস্তুতঃ কখনই নাই; সুতরাং জগৎ সত্য নহে। সৃষ্টি বাক্যের এইটাই প্রয়োজন। "ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনৎ". সুতরাং এই নিমিত্ত বিবর্ত্তবাদকেই দৃঢ় করা আবশ্যক।

শ্রুতি আরও কহিতেছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না এবং মহাপ্রলয়ের পরেও জগৎ থাকিবে না। সুতরাং মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা মিথ্যা। মাণ্ডুক্য যথা—"মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং" আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা"। সুতরাং জগৎ মিথ্যা

ঋগ্বেদ কহিতেছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে "অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"; তৎপরে কহিতেছেন "তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ" অর্থ অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। সুতরাং যে তম হইতে জগতের উৎপত্তি, তাহা যখন নিজেই তুচ্ছ, তখন জগৎ যে তুচ্ছ হইবে তদ্বিষয়ে বক্তব্য কি আছে? ঋগ্বেদ আরও কহিতেছেন যে, কেই বা জানে, কেই বা বর্ণন করিবে—কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল 'নানা' সৃষ্টি হইল?

"কো অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্রবোচৎ, কুত অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।"

"চকিত অভিধত্তে শ্রুতিরপি"।

ঋগ্বেদ পুনঃ কহিতেছেন,—"কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু-স্বরূপ পরমাকাশে আছেন; তিনি না জানিলে কে জানিবে?

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব, যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অঙ্গ বেদঃ যদি বা ন বেদঃ।"

শ্রুতিতে প্রথমে জগতের অধ্যারোপ করিয়া, তৎপরে 'নেতি নেতি' ইত্যাদি দ্বারা দৃশ্য-প্রপঞ্চের বাদ করিয়া অপবাদ করাতে জগতের মিথ্যাত্বই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চতে"।

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" এবং তত্ত্বমসি" প্রভৃতি চারি বেদের চারি মহা-বাক্য স্পষ্টাক্ষরে জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রমাণ করাতে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "না সতো বিদ্যতে ভাবঃ, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইত্যাদি বহু স্থলে অর্জ্জুনকে জগতের মিথ্যাত্বই উপদেশ দিয়াছেন। তাহা উত্তম অধিকারীর অনুভব-সিদ্ধ।

পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য দেবীসূক্তের ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন,—' ময়ি হি সর্ব্বং জগৎ, শুক্তৌ রজতমিবাধ্যস্তং সৎ দৃশ্যতে, মায়া চ জগদাকারেণ বিবর্ত্তে। তাদৃশ্যা মায়য়া আধারত্বেহপ্যেমসঙ্গস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তস্য সর্ব্বস্যোৎপত্তিঃ'। সুতরাং জগৎ বিদ্যা মায়ার বা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এবং অবিদ্যা মায়ার পরিণাম। মায়া মিথ্যা সুতরাং জগৎ মিথ্যা।

চণ্ডীতেও ঐরূপ কথিত হইয়াছে "আধারভূতা জগতস্ত্বমেক মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। অপাং স্বরূপাস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে।" ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে জগৎ অপের বা কারণ-বারির বিবর্ত্ত এবং মায়ার পরিণাম।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য যতিপঞ্চকে লিখিয়াছেন,—"যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভবতি মনোবিলাসং"। সচ্চিৎ সুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশীকাহং নিজ বোধরূপং॥' ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে জগৎ সর্ব্বাত্মক মনের পরিণাম মাত্র; এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত; সুতরাং সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনুভব দ্বারা প্রতীয়মান হয়, জগৎ অপ্, তেজ অন্নের পরিণাম এবং সচ্চিদানন্দের বিবর্ত্ত। চণ্ডীর অন্য স্থানে লিখিত হইয়াছে "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা, পশ্যৈতা দুষ্টময্যেব বিশন্ত্যোমদ্বিভূতয়ঃ॥" ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মায়া ছিলেন, পরেও সেই মায়া থাকিবেন। মধ্যে এই সমস্ত প্রকাশ; সুতরাং মিথ্যা।

সমগ্র যোগবাশিষ্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 'জগৎ কোনকালে হয় নাই, এখনও নাই এবং পরে কোন কালে হইবেও না। ইহা বেদমূলক, সুতরাং নিঃসংশয়িত ভাবে প্রামাণ্য।"

দেবীসূক্তে "অহমেববাত ইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা। পরোদিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সম্বভূব॥" জগৎ মায়ামূলক। সম্বিতের সম্বেদনকে পৃথক্‌রূপে সৃষ্টি করাতে জগতের কল্পিত সত্যত্ব। এ সমস্ত প্রমাণ এবং আরও অনেক শ্রুতিস্মৃতি সম্মত প্রমাণ সত্ত্বেও যে সকল বিদ্যাভিমানী শ্রুতি অভিজ্ঞ পণ্ডিত বেদ প্রতিপাদ্য বিবর্ত্তবাদ বুদ্ধিতে না আনিয়া বৃথা কুতর্ক করেন, তাঁহাদের নিতান্ত দুর্ম্মতি এবং তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ অত্যন্ত অনুগ্রহের বিষয়; কারণ তাঁহাদের উপর ভগবানের একান্ত নিগ্রহ জানিবে।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে যাওয়া যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দিক, কাল, দেশ, চিৎ, অহং, অনুভব, চেতন, স্পন্দন প্রভৃতি 'সর্ব্ব' স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত বা অধ্যস্ত। ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রসম্মত যে, কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। যেরূপ কল্পিত সর্প রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে। এই কারণে সেই ভূমাই সর্ব্ব জগৎরূপ এইরূপে হে নারদ, এই সর্ব্ব জগতের অধিষ্ঠানরূপে তুমি সেই ভূমাকে প্রথমে আপনার বুদ্ধিতে আরূঢ় কর। তদনন্তর সেই ভূমার তটস্থ রূপতা নিবৃত্তি করিবার জন্য, সেই সর্ব্বত্র ব্যাপক ভূমাকে অহং অস্মি এই প্রকারে আপনার আত্মারূপে জান।

হে ভগবন্! পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কার বিশিষ্টের বাচক যে অহং শব্দ, সেই অহং শব্দকে ব্যাপক ভূমা বিষয়ে প্রয়োগ করা অত্যন্ত অসঙ্গত, সুতরাং সম্ভব নহে। হে নারদ! যদ্যপি অহং এই শব্দ দ্বারা অহঙ্কার প্রতীতি হয়, তথাপি সেই অহঙ্কারের সেই ভূমা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়া সেই অহং শব্দ গৌণী লক্ষণা দ্বারা সেই ভূমারই ইঙ্গিত করে। এক্ষণে সেই অহঙ্কার এবং ভূমা আত্মার সাদৃশ্য নিরূপণ করা যাইতেছে। পুর্ব্বাদি দশ দিক বিষয়ে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালে স্থিত যত প্রকার দেহধারী জীব আছে, সেই সমস্ত জীব প্রথমে অহং এই প্রকার অনুভব করিতে থাকিয়া পশ্চাৎ বচন উচ্চারণাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই অহং অনুভব বিনা কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এই জানা যাইতেছে যে, এই অহঙ্কারই জীবের সর্ব্ব ব্যবহারের কারণ। এরূপ সর্ব্ব ব্যবহারের মূল কারণভূত অহঙ্কার যেরূপ সর্ব্ব দিককে এবং সর্ব্বভূত প্রাণীকে ব্যাপিয়া স্থিত হইয়া আছে, সেইরূপ এই অহঙ্কারের আশ্রয়রূপ এই জীবাত্মাও সেই সর্ব্ব দিককে এবং সর্ব্বভূত

প্রাণীকে ব্যাপিয়া স্থিত হইয়া আছে। এই প্রকার অহঙ্কারের এবং ভূমা আত্মার সর্ব্বত্র ব্যাপকতা রূপ সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্য অঙ্গীকার করিয়া সেই অহং শব্দ লক্ষণাবৃত্তি রূপে সর্ব্ব উপাধি রহিত কূটস্থ আত্মাকেই বোধন করে। সেই কূটস্থ আত্মার তৎপদার্থ রূপ ভূমার সহিত অভেদ তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিপাদন করিতেছে। এক্ষণে সেই অভেদ জ্ঞানের জীবন্মুক্তি রূপ ফল নিরূপণ করা যাইতেছে। হে নারদ, ইহলোকে অজ্ঞানী পুরুষ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং মন দ্বারা সর্ব্ব ব্যবহার করিয়াও আপনার মনুষ্যভাব বিস্মৃত হয় না; কিন্তু আপনার মনুষ্যভাবকে সংশয়-বিপর্য্যয় রহিত হইয়া সর্ব্বদা অনুভব করে। সেইরূপ যে পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে সেই অহঙ্কারাদি উপাধি বিস্মরণ করিয়া 'আমি' আত্মা ভূমারূপ এই প্রকার সংশয়-বিপর্য্যয় রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সেই বিদ্বান্ পুরুষ বেদান্ত শাস্ত্রের চিন্তন কালে আনন্দ স্বরূপ আত্মাতেই ক্রীড়া করতঃ স্থিত হইয়া থাকেন। যেরূপ বালক, বালক সমুদায়ের মধ্যে ক্রীড়া করতঃ স্থিত হয়। সেই বিদ্বান্ পুরুষ স্নান ভোজনাদি কালেও সেই আনন্দ স্বরূপ আত্মাতেই চিত্তের শক্তিরূপ রতি ধারণ করতঃ স্থিত হন; যেরূপ কামী পুরুষ বিদেশে অবস্থিত করিয়াও চিত্তের শক্তিরূপ রতি সর্ব্বদা আপন স্ত্রীর উপর রাখেন। ইহা দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হইল যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের দুই প্রকার দশা থাকে। এক সমাধি দশা এবং দ্বিতীয় সমাধি হইতে উত্থান দশা। তন্মধ্যে সমাধি হইতে উত্থান দশাও আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে; এক বেদান্ত শাস্ত্রের চিন্তনরূপ উত্থান দশা, দ্বিতীয় স্নান ভোজনাদি ব্যবহার রূপ উত্থান দশা। তন্মধ্যে প্রথম উত্থান দশাতে বিদ্বান্ পুরুষ যে আত্মার চিন্তন করে, তাহাকে শ্রুতি ক্রীড়া শব্দে বর্ণন করিয়াছেন, আর দ্বিতীয় উত্থান দশাতে বিদ্বান্ পুরুষ যে আত্ম চিন্তন করে, তাহাকে শ্রুতি রতি শব্দে কথন করিয়াছেন। আর যেরূপ সেই ব্যুত্থান দশা দুই প্রকার, সেইরূপ সেই সমাধি দশাও দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক সবিকল্প সমাধি, দ্বিতীয় নির্ব্বিকল্প সমাধি। তন্মধ্যে সবিকল্প সমাধিতে এই বিদ্বান্ যে আত্মার চিন্তন করে, সেই আত্ম-চিন্তনকে শ্রুতি 'মিথুন' শব্দে কথন করিয়াছেন। আর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সেই বিদ্বান্ পুরুষ যে আত্ম-ভাবে সমাপ্ত হ'ন, সেই আত্ম-ভাবকে আনন্দ শব্দে কথন করিয়াছেন। ক্রীড়া ও রতি এই দুই শব্দের অর্থ নিরূপিত হইল। এক্ষণে মিথুন ও আনন্দ এই দুই শব্দের অর্থ নিরূপণ করা যাইতেছে।

হে নারদ, যেরূপ ইহলোকে গৃহের সর্ব্ব ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া একান্ত দেশস্থিত স্ত্রী-পুরুষের উভয়ের যে পরস্পর মিথুনী ভাব, সেই মিথুনী ভাবই উভয়ের বিষয়ানন্দের হেতু। সেইরূপ এই বিদ্বান্ পুরুষের ধ্যাতা ধ্যেয় ভাবে যে আত্ম বিষয়ে মিথুনী ভাব, সেই মিথুনী ভাবই এই বিদ্বান পুরুষের সবিকল্প সমাধিকালে আনন্দের হেতু হইয়া থাকে। আর হে নারদ, যেরূপ ইহলোকে গন্ধর্ব্বাদি বিষয় প্রাপ্তির পর পরীক্ষক পুরুষের তদ্বিষয়ে যে আনন্দরূপ ফল অনুভূত হয়, সেই আনন্দানুভব নির্ব্বিকল্পই হয়। সেইরূপ এই বিদ্বান পুরুষের নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে যে নিরতিশয় আনন্দানুভব হয়, সেই আনন্দের অনুভবও ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ইত্যাদি ত্রিপুটীরূপ বিকল্প রহিত হইয়া থাকে। হে নারদ, সেই বিদ্বান্ পুরুষের যে আত্ম বিষয়েই আনন্দ হয়, তাহার এই কারণ। অদ্বিতীয় আত্মাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে করিতে এই বিদ্বান্ পুরুষ জন্মমরণাদি সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা করেন না। এই কারণে সেই বিদ্বান পুরুষ বিরাট ভগবানের ন্যায় স্বরাট্ এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'ন। আর তিনি ব্রহ্মরূপ হওয়াতে সর্ব্ব জীবের আত্মারূপ হ'ন। এই কারণে সেই বিদ্বান্ পুরুষ সমস্ত শ্রেষ্ঠ লোকে কামাচার হ'ন। এখানে প্রতিবন্ধ রহিত সেই সর্ব্বলোক প্রাপ্তির নাম কামাচার। যে পুরুষের সেই ভূমা আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই পুরুষের এই সমস্ত জন্মমরণাদি দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। এই যে আমি তোমাকে আত্ম জ্ঞানের ফল কথন করিলাম, তদ্বিষয়ে বেদবেত্তা পুরুষ এই প্রকার শ্লোক কথন করিয়াছেন। 'ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোতদুঃখতাং। সর্ব্বং পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ।''

এক্ষণে সেই আত্মজ্ঞানীর আহার, শুদ্ধি আদি সাধন সংক্ষেপে নিরূপণ করা যাইতেছে। যে পুরুষ বাহ্যতঃ সর্ব্বদা পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, পরন্তু যাঁহার মনে সর্ব্বদা পাপ বাসনা থাকে; এরূপ পুরুষের শত কোটী জন্মেও এই সর্ব্বাত্মজ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ। যখন অন্তরে পাপ বাসনাযুক্ত পুণ্যবান পুরুষেরও এই আত্মজ্ঞান দুর্লভ হইল; তখন যে পুরুষের বাহ্য অন্তর সর্ব্বদা পাপ কর্ম্ম আচরণ করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহার আত্মজ্ঞান দুর্লভ হইবে এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে! সুতরাং যে অধিকারী পুরুষের এই আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা হইবে, সেই অধিকারী পুরুষ প্রথমে আপনার চিত্ত শুদ্ধ করিবেন।

হে ভগবন্, চিত্তশুদ্ধি কি প্রকারে হইবে? হে নারদ, আপন আপন বর্ণাশ্রম অনুসারে যে অন্নপানাদি বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিষয় গ্রহণের নাম আহার। সেই আহার যে পুরুষের রাগ দ্বেষ রহিত বুদ্ধি দ্বারা পাপ রহিত ও শুদ্ধ হইয়াছে, সেই পুরুষের চিত্তশুদ্ধি হয়। এই আহার শুদ্ধি বিনা চিত্তশুদ্ধি কদাচ হইবে না। হে নারদ, যেরূপ আহার শুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষের পাপ কর্ম্মে প্রীতি হয় না, সেইরূপ যে পুরুষ বীজ, যোনি, ব্যবহার এই তিন শুদ্ধি সম্পন্ন হইবেন, সেই পুরুষের বিপদ কালেও পাপ কর্ম্মে প্রীতি হইবে না। পিতৃকুলের নাম বীজ; মাতৃকুলের নাম যোনি; আর পদার্থ গ্রহণ ও ত্যাগের নাম ব্যবহার। হে নারদ, এই প্রকার আহার, ব্যবহার, বীজ, যোনি এই চারি শুদ্ধি দ্বারা যে পুরুষের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, সেই পুরুষের কখনও পাপ কর্ম্মে প্রীতি হইবেনা। পরন্তু পাপ কর্ম্মই চিত্তের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক হয়। যখন আহারাদি শুদ্ধি দ্বারা এই পুরুষ পাপ কর্ম্মহইতে রহিত হইবেন, তখন এই অধিকারী পুরুষ চিত্তের একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ শুদ্ধ-চিত্ত সম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্মবেত্তা গুরুর উপদেশ হইতে শীঘ্রই আপনার ভূমা স্বরূপ 'আত্মাকে' সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ দ্বারা প্রতিপালিত কোন ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র কোন মহাত্মা পুরুষের মুখ হইতে "তুমি ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র" এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই আপনার ক্ষত্রিয় স্বরূপ স্মরণ করেন; সেইরূপ "তুমি ব্রহ্মরূপ" এই প্রকার ব্রহ্মবেত্তা গুরুর বচন শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ-চিত্ত সম্পন্ন পুরুষ শীঘ্রই আপনার ব্রহ্মস্বরূপ স্মরণ করেন। হে নারদ, যে কোন পুরুষ পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য কর্ম্মের প্রভাবে ব্রহ্মবেত্তা গুরুর উপদেশ দ্বারা সেই ভূমা আত্মার স্মৃতিলাভ করেন, সেই পুরুষ সেই আত্মজ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা কাম ক্রোধাদি গ্রন্থি শীঘ্রই ছেদন করেন। আত্মজ্ঞান বিনা কাম ক্রোধাদি গ্রন্থি সমূলে নিবৃত্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং এই অধিকারী পুরুষ সেই কাম ক্রোধাদি বন্ধ নিবৃত্তির জন্য সেই ভূমা 'আত্মার' জ্ঞান অবশ্য সম্পাদন করিবেন। যদিও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধান দ্বারা ও কাম ক্রোধাদি কারা নিবৃত্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিনা উহা সমূলে উৎপাটিত হয় না। এ বিষেয় শ্রুতি যথা—

"ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

হে শিষ্য, যে সনৎকুমার ভগবান্ নারদ মুনিকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া

জন্ম মরণ দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সনৎকুমার ভগবান্ অন্য জন্মে কার্ত্তিকের অবতার ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র, (৺কাশীধাম।)

ধর্ম্ম]

কঃ পন্থা।

(গতবৎসর চৈত্র সংখ্যার পর।)

কাত্যায়ন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী কর্ত্তব্য প্রাতঃসন্ধ্যাদি যথা-বিহিত সমাপন করিয়া গুরুদেব ভরদ্বাজের শ্রীচরণ বন্দনা করিল তার-পর ধীরে ধীরে নিবেদন জানাইল, "গুরুদেব, অগ্নিকার্য্য, হোম সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই হউক।

ভর। বৎস কাত্যায়ন, নিত্য ও নৈমিত্তিক হোম ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"নাজপ্তঃ সিদ্ধ্যতি মন্ত্র আহুতশ্চ ফলপ্রদঃ।
নানিষ্টো যচ্ছতে কামান্ তস্মাৎ ত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ॥"

মন্ত্রের সার্থকতা আহুতি দ্বারাই ঘটে; সিদ্ধি জপের দ্বারাই লাভ হয়। হোম দৈব-যজ্ঞ। হোম দ্বারা যে পারত্রিক উন্নতি লাভ করা যায়, তাহা কেবল কথা দ্বারা বুঝান যায় না। মন্ত্রের মাহাত্ম্য সাধকই জানেন, হোমের ফল হোম কর্ত্তাই প্রাপ্ত হন। হোমের রশ্মি আকাশ মার্গে যাইয়া স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করে, কারণ-শরীরী জীব সেই রশ্মি সোপান সাহায্যে অনায়াসে স্বর্গ গমনে অধিকারী হ'ন। কথাটি অলঙ্কারের মত।—স্তুতির মত শুনাইল। বৎস, শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর, ফল শ্রীভগবৎ প্রসাদে হইবেই।

পূর্ব্বে যাগ যজ্ঞাদিতে অসংখ্য হোম করা হইত, হোমের গন্ধে সারা দেশ সুরভি ও পবিত্র হইয়া উঠিত। এক্ষণে দীক্ষা শ্রাদ্ধ পূজাদি কার্য্যে সামান্যই হোম করা হয়। সামান্যেরও ফল অসীম। দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিমুখে সমন্ত্রক ঘৃত আহুতি, আর সঘৃত বিল্বদল, সমিধ প্রভৃতি অর্পণ করার নামই হোম। অগ্নি মুখে যথাশাস্ত্র আহুতিই হোম।

কাত্যা। হোমের ঐহিক ফল কি? আর তাহা অগ্নিমুখেই করিতে হয় কেন?

ভর। অগ্নিই দেবতার মুখ। অগ্নিমুখ ভিন্ন দেবতারা আহুতি গ্রহণ করেন না। যজ্ঞীয়াগ্নিতে মন্ত্রাহুত হবিই দেবতাদের অমৃত। আর এই অমৃত পানেই দেবগণের পুষ্টি। অগ্নি, বায়ু, জল ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পুষ্টিতে

জগতের পুষ্টি, ইহাদের শুদ্ধিতে জগতের শুদ্ধি, ইহাদের দৌর্ব্বল্যে জগতের অনিষ্ট। জগতের রক্ষার জন্য, শান্তি স্থাপনার জন্য, দেবগণ অসুর ধ্বংস-কার্য্যে ব্রতী। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্পাদি আসুরিক উপদ্রব নিবারণ করিতে হইলে, অগ্নি বায়ু প্রভৃতির বিশুদ্ধ ও পুষ্টি কর্ত্তব্য, নচেৎ অসুরগণ মাথা চাড়া দিবে, সারা পৃথিবী অশান্তির দাহে দগ্ধ হইবে! এই বিশুদ্ধি, এই পুষ্টি, হোম দ্বারাই সাধ্য। অগ্নিমুখে হুত দ্রব্য যত সহজে অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতারা গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য কোনরূপে তত সহজে পারেন না। অগ্নিমুখে আহুতি ধূমাকারে অতিক্রত প্রকৃতির সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ধূপগন্ধি, হবিঃ কণাময় হোমের পবিত্র বায়ু সমস্ত দেশ হইতে রোগের বীজ, পাপের অঙ্কুর সমূলে উৎপাটিত করে। এই বাতাসের স্পর্শে রবিকরোদয়ে কুয়াসার মত পাপরাশি উড়িয়া যায়, এই বাতাসের গন্ধে মালিন্য নষ্ট হয়। হোমা অনলশিখা যে গৃহে প্রজ্জলিত হয়, সে গৃহ সত্ত্বময়, রোগশূন্য, পুণ্যস্নিগ্ধ ও আনন্দদীপ্ত হইয়া থাকে। দূষিত বাষ্প ও কলুষিত বাতাস নষ্ট করিতে এমন মহৌষধ আর নাই। হোম্য হবির্গন্ধে ক্ষুধার বৃদ্ধি, সত্ত্বগুণ উপচিত, শরীর ধাতুর সমীকরণ আর রসের সমন্বয় ঘটে! হোমের ভস্ম চক্ষুতে দিলে চক্ষুরোগ জন্মে না, ললাটে দিলে ললাট স্নিগ্ধ থাকে, সন্ধিস্থলে দিলে বাতাদি আক্রমণের সম্ভবনা থাকে না। প্রাত্যহিক হোম গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারীর অবশ্য করণীয় কার্য্য। হোমের অগ্নি যে স্থানে রক্ষা করা হয়, তাহার নাম অগ্নিগৃহ। অগ্নি গৃহ, উপনয়ন হইতে অগ্নির রক্ষা এক্ষণে শাস্ত্রের সীমানা মধ্যেই অবস্থিত। তবে একেবারে উঠিয়া যায় নাই, ইহাই মঙ্গল। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আর ত' দৃষ্টই হয় না। ইহাই ক্ষুদ্র যজ্ঞ।

কাত্যা। নিত্য হোম ক্ষুদ্র যজ্ঞ। নৈমিত্তিক হোম কি ?

নিত্য হোম ত' শুনিলে! নৈমিত্তিক হোম যাগ-যজ্ঞেই বিহিত। শ্রাদ্ধ, দীক্ষা, পূজাদি কার্য্যে সামান্যরূপ হোম বিহিত; এ কারণে উহা ক্ষুদ্র যজ্ঞ বিশেষ। অসংখ্য হোমের ফলও তদ্রূপ। হোম দ্বারা যে বাষ্প জন্মে, সে বাষ্প বিশুদ্ধ, পবিত্র, নির্দ্দোষ ও শক্তিময়। এই যজ্ঞীয় তপ্ত হোমশিখা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধ-তম প্রদেশে উত্থিত হইয়া মেঘগুলিকে উত্তপ্ত করে ও বিশৃঙ্খল মেঘগুলিকে জমাট বাধাইয়া দেয়,এবং মেঘগুলির নিম্নে মৃদু মৃদু আঘাত দেয়, ফলে পরিমিত বৃষ্টিপাত ঘটে। আর এই হোমোত্থিত বাষ্পরাশিকে মেঘরূপে পরিণত করান যায় বলিয়া অতি বৃষ্টি বা অল্প বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না। কেবলই যে মেঘরূপে পরিণত হয়,

তাহা নহে, উপরোক্ত ত্রিবিধ উপকার সাধন করে।

বৎস কাত্যায়ন, তপোবনের তরুগণ যে অপর্য্যাপ্ত ফলভারে নম্র হয়, পুষ্প-রাশি যে থরে থরে ফুটিয়া উঠে, ক্ষেত্রে যে অজস্র নীবার শস্য প্রদান করে,—তাহার কারণ ঐ হোম। যজ্ঞীয় অগ্নি শিখা তরুগুলিকে সতেজ রাখে, পত্রাবলীকে শ্যামল ও চিক্কণ করে এবং উৎপাদিকাশক্তি সত্বরই জন্মাইয়া দেয়।

"অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ শম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ"॥

অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যে উপস্থাপিত হয়, আদিত্য আবার ঐ গৃহীত আহুতি বৃষ্টিরূপে প্রদান করেন; বৃষ্টি হইতে শস্যাদি দ্বারাই জীব রক্ষা। হোমের ফল শুনিলে ত'?

কাত্যা। তাহা হইলে আমি কোন্ পথ আমার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট বুঝিব?

ভর। বৎস, তুমি এক্ষণে শিক্ষার্থী! কঠোর সন্ন্যাসমার্গ ও গভীর আত্মতত্ত্ব উপদেশের পাত্র তুমি এখন নহ। বর্ত্তমানে তোমার মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রথম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ব্রহ্মচারীর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগুলি পালন;—যথা ভিক্ষাচর্য্যা, বেদাধ্যয়ন, গুরুসেবা প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রদ্ধাসহ জপ তপাদি কর্ম্মকরণ। চতুর্থ শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পালন। পঞ্চম নিত্য সন্ধ্যা, পূজাদি হোম কার্য্য যথাযথ সম্পাদন। এই সকলগুলি এক্ষণে তোমার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট পথ।

কাত্যা। একটি পথ ত' হইল না? এই অনেকগুলি পথই কি অবলম্বন করিতে হইবে?

ভরদ্বা। এই অনেকগুলি পদ্ধতি ধরিতে গেলে একই পথ। ভেদ অবান্তর,—মূলতঃ এক। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সর্ব্বজীবে করুণা, দীন দরিদ্রের উপকার, গুরুসেবা, গো-শুশ্রূষা, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যাহ্নিকাদি নিত্যকর্ম্ম—সমস্তই যথাসাধ্য অবহিতমনা হইয়া পালন করিয়া যাইতে হইবে। বিলাস, আলস্য, জড়তা, ক্রোধ, রাগ, কাম, মোহ, হিংসা যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে। মন থাকিলে,—শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, থাকিলে,—ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে, সাধনা কখনই বিফল হইবে না! আশ্বস্ত হও বৎস, এক্ষণে ইহাই তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ। পরে চিত্ত-শুদ্ধির সহিত,—আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত—যখন নিত্যদৃষ্টি তোমার দূর প্রসারিণী হইবে, তখন দেখিতে পাইবে—সরল, দীর্ঘ, প্রশস্ত একই পথ অনন্তাভিমুখে ছুটিয়াছে। তখন আর অবান্তর ভেদ নাই, "একমেবাদ্বিতীয়ং।"

কাত্যা। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য। বীজ ত' পুঁতিলাম! প্রাণপণে জল

সেচন করিব—দেখি বৃক্ষ হয় কিনা? দেখি ফল হয় কিনা আর আপনার আনুকূল্য, কৃপা ও আশীর্ব্বাদের জল বাতাস পাইলে, এ বীজ ব্যর্থ হইবে না—ইহা আমার আশা, ভরসা ও বিশ্বাস!

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

[মোক্ষ। **পন্থা।**

সমাগত সন্ধ্যা বেলা,
সাঙ্গ করি ভবের লেখা,—
কালের কোলে সকল ফেলে,—
লুকায় ভানু চরমে।
সুখের আশা, বাঞ্ছা কত,
কতই ছবি মনের মত;
মনের মাঝে উদয় হ'য়ে,—
মনেই মরে মরমে॥
(কতই খেলা উষার সনে,
কতই খেলা কমল-বনে;
কতই আশা রাজ্য-শাসা,—
কতই প্রতাপ ভুবনে !!)
এখন হের, প্রবীন রবি,
আঁকিয়া সুদূর অতীত ছবি,
দেখায় জীবে—চিত্রপটে,—
শৈশবেই সুখ জীবনে।
গেছে যা, তা' আর কি ফিরে?
নিরাশ-আঁধার আসে ধীরে;
মনের দুঃখে আপন বিলয়,
কালের গভীর কোলে রে?
একই পথে চল্‌ছি মোরা,
বিষয়-ভাবে মত্ত-ভোরা;
চাইনা ফিরে পিছন পানে,—

শিশু ছিনু, যুবক এবে,
অন্ধ, বিষয়-ভ্রান্তি সেবে;
শেষের বেলা কর্‌তে খেলা,
ইচ্ছা আবার হবে কি?
আবার কি সেই রবির মত,
শিশুর ছবি আঁক্‌তে রত;
রইব' তখন সন্ধ্যা-আগে—
বাঞ্ছা তখন রবে কি?,
কি-ই বা জানি—কেমন ধারা
আস্‌বে নিশা অন্ধকারা;
কিম্বা সাধের জ্যোতির্ম্ময়ী,—
ইন্দু-কিরণ পরশে?
পথের সীমা—আকাশ কোলে,
তার পরে কি, দেখ্‌তে হ'লে;
কেমন ক'রে দেখ্‌বে জীবে?
নাইক' নগ বরষে।
থাক্‌তো যদি, উঠ্‌তো কিরে,
অভ্রভেদী ভূধর শিরে;
দেখ্‌তো বুঝি নাইক' সীমা,—
গগন সীমা করেছে?
'পন্থা' অশেষ,—পান্থ মোরা,
চল্‌ছি এমন আগাগোড়া;
নাইক' বিরাম, নাইক' স্থিতি,—

কি ভাব হবে ম'লে রে ?
নয়ক' মরণ,—বিরাম বুঝি ?
তাই কি ক্ষণেক আঁখি মুদি ;
নূতন তেজে—নবীন সেজে,—
আবার ছুটে প্রাণী রে ?
নূতন যখন, নবীন সবি,
ভ্রান্ত শিশু মধুর ছবি,
মত্ত হেরে ;—শ্রবণ করে,
মায়ার আশার বাণী রে !
সকাল বেলা হৃদয়-মাঝে,
আশার বাণী মধুর বাজে ;
"আবার চল !—আবার চল
দেখ্‌বে কত নয়নে !"
চলবে কত ? নাইক' সীমা,
শ্রান্তি নাশে মধুরীমা ;
শ্রান্ত রত, ক্লান্ত দেহে,—
আবার পড়ে শয়নে।

চল্‌তে কত মরেছে।
'পন্থা' অশেষ,—পান্থ মোরা,
চল্‌তে হবে আগাগোড়া ;
শ্রান্ত বড়, তিক্ত লাগে,—
তা'ই দেছ কি সাথিটী ?
জীবন-সাথী পত্নী মম,
শান্তিদায়ী সুধার সম ;
কিন্তু কেন ক্ষণিক তাহা,—
তারো বিরাম রাত্রিটী ?
আস্‌বে যবে শান্তমতি,
তখন হবে কি মোর গতি ?
চাইনা সখা, বন্ধু কোনও !
দাও গো প্রভু কহিয়া !
বিরাগ বড়, চল্‌তে নারি,
দাও গো বলে ত্রিতাপহারি !
কে-ই বা আমি, যাই বা কোথা ?
সময় যে যায় বহিয়া !

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কাম]

অরুচি।

রোগ হলে কারো কারো বড় অরুচি হয়, দুনিয়ার কোন জিনিষ তার মুখে ভাল লাগে না। সুস্থাবস্থায় মিষ্ট দ্রব্যের প্রতি রসনার কথনো কখনো অন্যায় পক্ষপাতও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্যাধিগ্রস্তের নিকট উহা আদৌ উপাদেয় বলিয়াই মনে হয় না। শুধু ইন্দ্রিয়গুলি কেন, ইন্দ্রিয়দের রাজা মনও দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিলে কেমন খিট্‌খিটে হয়ে যায়! রোগ হলে খাওয়া, পরা, আমোদ, আহ্লাদ সবই মাথায় উঠে ; পুত্র, পরিজন, ধন, ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই যেন বিরস ঠ্যাকে। আবার এই রোগীই যখন সার্‌তে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ; হৃদয়ের সরস ভাবগুলি যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। তখনি বোঝা যায় সে সেরে উঠ্‌চে। পরিজনের

অক্লান্ত শুশ্রূষায়, চিকিৎসকের গভীর নিপুণতায় এবং ভেষজের গুণে রোগী রোগমুক্ত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটিলে, রোগীর রক্ষা পাওয়া প্রায়ই অসম্ভব। কিন্তু আমাদের যে দুঃসাধ্য ভবব্যাধি আক্রমণ করেছে, যার প্রভাবে আমাদের মন দুর্ব্বল হয়ে যাচ্চে—বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়্‌চে,—সুমিষ্ট সদ্ভাবরাশিতে ক্রমশঃই অরুচি বেড়ে উঠ্‌চে—তার উপায় কি? ইহার ভেষজ, কি ইহার চিকিৎসক কে? এ দীনহীন রোগাতুরদের শুশ্রূষাকারীই বা কাহারা? শুনি বটে, এ ভবরোগের একমাত্র ঔষধ ভগবত নামকীর্ত্তন; কিন্তু তাহাতে রুচি নাই যে! দীর্ঘকাল ধরিয়া ভবব্যাধিতে পীড়িত, অবসাদগ্রস্ত; উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, কোন জিনিষেই রুচি নাই—শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই—নামে রতি নাই; আমার গতি কি হইবে? কোথায় তুমি ওগো ভবরোগের চিকিৎসক, দীনহীন কাঙালের বন্ধু, অশরণ জনের আশ্রয় স্থল! কোথা তুমি ভবপারের কাণ্ডারী, আমার সদ্‌গুরু! তুমি সহায় হও দেব—নচেৎ এ ব্যাধির আর প্রতীকার কে করিবে? আর কোথায় আমার সাধু সজ্জন মহাত্মা, সৎপথের সহায়, ভবব্যাধির শুশ্রূষাকারী দীন দয়ালেরা! একবার এই ব্যাধিগ্রস্ত—পীড়িত দুর্ব্বলের প্রতি করুণ নেত্রে চাহ! একবার তোমরা এস, তোমাদের শুশ্রূষার গুণে এই ভবরোগ হইতে মুক্তিলাভ করি! ব্যাধিগ্রস্ত দেহ, রোগাতুর মন, ক্ষীণবুদ্ধি, দুর্ব্বলেন্দ্রিয় —আমাকে তোমরা রক্ষা কর! ঔষধের গুণে, তোমাদের সেবার গুণে, আমি যেন আমার স্বাস্থ্যকে ফিরিয়া পাই; আমার রোগ বিকার যেন ঘুচিয়া যায়—অরুচি সারিয়া যায়! তুমিই বল নাথ, তোমাকে কাতর কণ্ঠে ডাকিতেছি, কত-দিনে আমার এ রোগ সারিবে? তুমি যে সকল আত্মার প্রিয়তম, সমস্ত রসের নিলয়, কবে তোমাকে স্বাদু বোধ হবে—প্রিয় বোধ হবে? প্রভো! এ অরুচি কি কিছুতেই সারিবে না—ইহার কি কোন ঔষধ নাই?

অর্থ]

হরিদ্বার।

পঞ্চতীর্থ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩। বিল্বকেশ্বর;—রাজপথ ছাড়িয়া রেলের রাস্তার নীচে দিয়া কিছুদূর যাইলেই শিবালক পর্ব্বতের একটী মনোরম উপত্যকায় এই পরম পবিত্র

শিবলিঙ্গের দর্শনলাভ হয়। স্থানটী নিরবতার নির্জ্জন-নিকেতন, পবিত্র ও সুন্দর। সাধন ভজনের সম্পূর্ণ উপযোগী একটী তপোবন। এই স্থানেই ঋচিক মুনির আশ্রম ছিল। মন্দিরের অদূরেই গৌরীকুণ্ড। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই মনোরম উপত্যকার শোভা দেখিতে দেখিতে গৌরীকুণ্ডের ধারে গিয়া বসিতাম। দুই দিকে উন্নত পর্ব্বত, হিমালয়ের নানাবিধ নূতন নূতন বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত। বিল্ব বৃক্ষেরও অভাব নাই; বিল্বগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। স্থানটী নিরব ও নির্জ্জন; মধ্যে মধ্যে কেবল ময়ুরের কেকারব এবং পক্ষীর মধুর কূজন এই মধুর গম্ভীর পার্ব্বত্য-নিরবতা ভঙ্গ করিতেছে। এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র গিরি নদী-প্রবাহের খাত। তাহার মধ্যে একটী বাঁধান জলপূর্ণ কূপ; ইহাই গৌরীকুণ্ড। নদীটী শিবধারা নামে খ্যাত; আমরা জলপান করিয়া কূপের পার্শ্বে বসিয়া এই অপূর্ব্ব স্থানের মহিমা অনুভব করিতাম। শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ কি এক উদাসভাবে পূর্ণ হইয়া।—চিত্ত কেমন ভগবৎ অভিমুখী হইয়া যাইত। প্রসিদ্ধ মুন ঋষির আশ্রমের এবং দেবস্থানের এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে, আমাদের সংসার-পরায়ণ বিষয়-বিমুগ্ধ বিক্ষিপ্ত-চিত্ত স্থান মাহাত্ম্যে কি এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেই বিশ্বপতির চরণ পানে ছুটিত। আমাদের সহচর বরদা বাবু—ভক্তি বিগলিত প্রাণে গান ধরিতেন;—

"মন চল নিজ নিকেতনে,—
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক, আর ভূতগণ,
সকলি ত' পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলেছ আপন জনে॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ;
সঙ্গেতে সম্বল রেখ পুণ্যধন—গোপনে অতি যতনে॥
পথে দেখ যদি ভয়েরি আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার;
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ—শমন ডরে যার শাসনে"—

গান শুনিতে শুনিতে এবং শোভা দেখিতে দেখিতে ক্রমেই অন্ধকার ঘনীভূত হইত; সুতরাং আমরা আর এই বন মধ্যে বিলম্ব না করিয়া

তথা হইতেই বিল্বপত্র এবং গৌরীকুণ্ডের জল সংগ্রহ করিয়া বিল্বকেশ্বর—অর্চ্চনা করিলাম। আর প্রার্থনা করিলাম—

"ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধ শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো !!"

বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গনে নিম্ব-বৃক্ষতলে কুণ্ডলিনী বেষ্টিত আর একটী শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। একজন ভক্ত একটী ইন্দারা ও পূজারীগণের বাসার্থ একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎভাগ দিয়াই 'শিবধারা' প্রবাহিতা ; এ সময় নদীর জল শুষ্কপ্রায়। অপর পারে একটী পর্ব্বতগাত্রস্থ গুহায় অন্নপূর্ণা গণেশ প্রভৃতি চারিটী দেব দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। বিল্বকেশ্বরেই আমরা হিমালয়ের কয়েক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষাদি অবলোকন করিয়া বুঝিলাম, হিমালয়-দৃশ্য আরম্ভ হইয়াছে। বিল্বকেশ্বর প্রভৃতি প্রত্যেক তীর্থেরই মাহাত্ম্য সূচক নানা উপাখ্যান পুরাণে বর্ণিত আছে ; তাহা লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। কৌতূহলী পাঠক 'মায়াপুরী মাহাত্ম্যে' তাহা পাঠ করিতে পারেন।—

"শিবধারা সমাখ্যাতা শিবদা তত্র পর্ব্বতে।
তস্যাং নরঃ সকৃৎ স্নাত্বা শিবেন সদৃশঃ ভবেৎ ॥
তত্রৈকা বিল্ববৃক্ষস্তু তস্যাধঃ শিবলিঙ্গকম্।
যস্ত দর্শনমাত্রেন শিবতাং যাতি মানবঃ" ॥ কেদার খণ্ড ১০৭ অঃ।
তত্র বিল্বেশ্বরোঃ নাম মহাদেব বিমুক্তিদঃ।
যস্তত্র নিয়তাহারঃ সপ্তরাত্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ
জপতে শিবমন্ত্রং চ রুদ্র চাগম তৎপরঃ
পরাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি যা সুরৈরপি দুর্লভা।
বিল্বপত্রৈ সমভ্যর্চ্চ ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ কেঃ খণ্ড—১১৫ অঃ।

ফিরিবার সময় অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রকাণ্ড ভৈরব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। প্রস্তর-নির্ম্মিত উপবিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ভিত্তি সংলগ্ন। মূর্ত্তিটী ভীষণ।

৪। নীল পর্ব্বতের চণ্ডীকা তীর্থ বা চণ্ডীকা পাহাড়।— হরিদ্বারের অপর পারে যে বৃক্ষলতাচ্ছাদিত, নবীন জলদ-বর্ণাভ মনোরম অভ্রভেদী পর্ব্বত ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় প্রতীমান হয়, তাহাই 'নীল পর্ব্বত।'

ইহার শিখরে শিখরে চণ্ডীকাদেবীর শুভ্র মন্দির, হরিদ্বার হইতেই দেখা যায়। এই পর্ব্বতের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া 'নীলধারা'—কণখলের সম্মুখে গঙ্গার মূলধারার সহিত সম্মিলিতা হইতেছেন। চণ্ডী পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে

ও কিঞ্চিৎ নিম্নে পর্ব্বতের গাত্রেই নীল্লোকেশ্বর বা নীলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। নীল্লোকেশ্বর মহাদেবের মন্দির হইতে প্রায় ২ বা ২॥০ মাইল উর্দ্ধে চণ্ডীর মন্দীর।

"চণ্ডীকা তীর্থ রাজেহি সকৃৎ স্নাতঃ মহামুনে।

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে সফলং তস্য জীবিতম্ ॥"

চণ্ডীকা তীর্থে যিনি একবার স্নান করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য।

নীল পর্ব্বত ইতি বৈ স্মরণাৎ শিবদায়কঃ।

তং পর্ব্বতং সকৃৎ দৃষ্টা সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে ॥

অত্র বৈ নিবসিস্যামী ত্বয়া সহ গণেশ্বর।

নীলেশ্বর ইতি খ্যাতো ভক্তানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।

নীলপর্ব্বত স্মরণ মাত্রই মঙ্গলদায়ক; দর্শন ত' দূরের কথা। এই পর্ব্বত একবার দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। মহাদেব বলিয়াছেন 'হে. গণেশ্বর আমি তোমার সহিত এই নীল-পর্ব্বতে 'নীলেশ্বর' এই নামে খ্যাত হইয়া ভক্তগণের প্রীতিবর্দ্ধক হইয়া সর্ব্বদা নিবাস করিব।'

নীলপর্ব্বত হরিদ্বার যাত্রীর অবশ্য দর্শনীয়; কারণ ইহা পঞ্চতীর্থের অন্যতম। কিন্তু ইহা প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত এবং পথও অতি দুর্গম। যানাদিরও বিশেষ সুবিধা নাই, সুতরাং অতি অল্প যাত্রীই তথায় গমন করেন। কিন্তু যিনি কষ্ট করিয়া চণ্ডীর পাহাড় দর্শন করিবেন, তিনি হিমালয়ের বৃক্ষলতা-মণ্ডিত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা, নানা বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখণ্ড সমাচ্ছাদিত নীলধারার মনোরম শোভা এবং উপল-প্রতিহত প্রখর-প্রবাহ এবং পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ হইতে হরিদ্বার কণখলের মনোহর দৃশ্য, ত্রিধারায় প্রবাহিতা গঙ্গার শোভা, দূরে পর্ব্বত গাত্রে ঘন অরণ্যানীর শ্যামল শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। তাঁহার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। যাঁহারা কেদার ও বদ্রীনারায়ণ যাইবেন না, তাঁহারা যেন হরিদ্বারে আসিয় চণ্ডীপর্ব্বত দর্শন করিতে না ভুলেন। চণ্ডীর পাহাড় ভ্রমণ করিলে তাঁহারা নগাধিরাজ হিমালয়ের উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া নির্ম্মল আনন্দ পাইবেন। যাঁহারা হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম, তাঁহারা চেষ্টা করিলে ডুলীর সাহায্যে পর্ব্বতারোহণ

---

* পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন স্নান ষড়্‌বিধ যথা—১। ব্রাহ্ম ২। আগ্নেয় ৩। বায়ব্য ৪। দিব্য ৫। বারুণ ও ৬। যৌগিক। ঈশ্বরে আত্ম-নিবেদন বা চিত্ত সমর্পণকে যৌগিক স্নান বলে। এস্থলে যৌগিক স্নানেরই কথা বলা হইতেছে। কারণ চণ্ডীতীর্থে বারুণ স্নান সম্ভব নহে,—তথায় জলের একান্ত অভাব।

করিতে পারেন। হরিদ্বার অবস্থানের শেষ দিন (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) চণ্ডীকা-তীর্থ দর্শন করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে একদল বলিলেন, বদ্রীনারায়ণ যাত্রার পূর্ব্বদিন এই বার মাইল হাঁটা ও পাহাড়ে চড়িয়া শক্তির অপচয় না করিয়া, হরিদ্বারেই বিশ্রাম করা উচিত। আমরা বলিলাম 'ইহা পঞ্চতীর্থের অন্যতম, সুতরাং অবশ্য দর্শনীয়। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা" তাঁহাকে পূজা করিয়া যাত্রার পূর্ব্বে শক্তি ভিক্ষা করা উচিত। আর সম্ভবতঃ নীল পর্ব্বতস্থ ভৈরবই নীল ভৈরব! বদরীকাশ্রম মহাত্ম্যে আছে, "হরিদ্বারে স্নানাদি করিয়া নীল ভৈরবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কেদার বদ্রীনাথ যাত্রা করা কর্ত্তব্য।" সুতরাং নীল ভৈরবের নিকট প্রার্থনা না করিয়া যাত্রা করা অসঙ্গত।' যাহা হউক আমরা প্রভাতেই কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পদব্রজেই পর্ব্বতারোহণ মানসে সদ্য সংগৃহীত পার্ব্বত্য যষ্টী লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ এক্কারোহণে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মায়াপুরের দক্ষিণে গঙ্গার উপর যে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু আছে, তাহা পার হইলাম। এখান হইতে গঙ্গার তীরে তীরে প্রায় ১৷৷০ মাইল পদব্রজে উত্তরাভিমুখে হাটিয়া আসিয়া নীল-ধারার নৌকা পারানীর ঘাটে পৌছিতে হয়। এই দেড় মাইল পথ প্রস্তরাকীর্ণ নদীরই শুষ্ক গর্ভ। বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে, হাঁটা কিছু কষ্ট কর। নৌকা পার হইয়া আমরা নীল-ধারায় স্নান করিলাম। পারের মাশুল ৫ পয়সা হিসাবে লাগে। অদ্য অষ্টমী তিথি; সুতরাং অনধ্যায়। "ঋষিকুল" বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারী-ছাত্রবৃন্দ তাঁহাদের আচার্য্যসহ অদ্য চণ্ডীদেবীর দর্শনার্থে যাইতেছেন। তাঁহারা স্নান করিয়া সমবেত ঐক্যতানে সুমধুর বৈদিক ছন্দে গঙ্গালহরী পাঠ করিতে লাগিলেন। চণ্ডীকা দেবীকে দর্শন পূজন করিয়া এবং তথায় চণ্ডীপাঠ করতঃ তাঁহারা ফিরিবেন। আমরাও স্নানাদি করিতে করিতে ব্রহ্মচারীদের দর্শন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। নীলধারার উভয় তটে হরিৎ, নীল, পীত, প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। বিধাতার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। আরও প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলাম। পর্ব্বতের উপর কোন স্থানে 'চড়াই,' কোন স্থানে কিছু 'উৎরাই,' এইরূপে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গে চণ্ডীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। পথে নানাবিধ বৃক্ষ লতার সুন্দর শ্যামল শোভা প্রস্ফুটিত কুসুম সমূহের মধুর সৌরভ এবং পক্ষিগণের

কল-কূজন আমাদের চিত্ত বিমোহিত করিয়াছিল। আর যখনই একটু ক্লান্তি বোধ করিয়াছি, তখন পর্ব্বত গাত্রে বসিয়া হরিদ্বারের বিমল শোভা বিলোকন করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলাম। মন্দির মধ্যে চণ্ডীকা দেবীর সিন্দূর লেপিত মূর্ত্তি। অদূরে একটী বাঁধান প্রস্তর-চত্বরে ভৈরব মূর্ত্তি। অনতিদূরে একটি শিখরস্থ মন্দিরে আগ্নেয় মন্দির। উক্ত মন্দিরের বহিঃ চত্বরে গণেশ, হনুমানজী প্রভৃতি মূর্ত্তি আছে।

চণ্ডীমাতার দর্শনাদি করিয়া মন্দিরের চত্বরে বসিয়া আমরা বিশ্রামান্তে জল-যোগ করিলাম। পর্ব্বত শিখরে জলের বড়ই অভাব, কোন ঝরণা নাই। নীচে হইতে পার্ব্বত্য অশ্বের দ্বারা জল বহন করিয়া লইতে যাইতে হয়। একটী ছোট ঘটী, জলের মূল্য ৫ হিসাবে দিতে হয় আমরা খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম; ৪।৫ জনে প্রায় দুই আনার জল খাইয়া ফেলিলাম। চণ্ডীদেবীর মন্দিরের পশ্চাৎ বসিয়া কিছুক্ষণ আমরা চতুর্দ্দিকের মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দৃশ্য বড়ই মনোরম; সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে গঙ্গা নানা ধারায় বিভক্তা হইয়া পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। মধ্যে মধ্যে সাদা বালীর চর পড়িয়াছে; কোথাও বা তাহা হরিৎ বৃক্ষ রাজিতে পরিপূর্ণ। উত্তর পশ্চিম দিকে দিগন্ত বিস্তৃত গভীর অরণ্যানী নদীর অপর পারে—অতি দূরে কখন ও হরিদ্বারের শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র মন্দির ও সৌধাবলী গঙ্গাতীরে কি মনোহর শোভাই বিস্তার করিয়া একটী মনোরম আলেখ্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্তরে স্তরে জলদ-বর্ণাভ অগণ্য পর্ব্বত শ্রেণী দিগন্ত বিস্তৃত। বেলা অধিক হওয়ায় দুই মাইল নিম্নে নামিয়া নীলেশ্বর দর্শন করিতে আসক্ত হইলাম; কারণ যে দিক দিয়া আসিয়াছি, তাহার অপর দিক দিয়া নামিয়া নীলেশ্বর দর্শন করিতে হয়। অতঃপর পূর্ব্ব পথে অবরোহণ করিয়া বেলা প্রায় ১ টায় নিশ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে হরিদ্বার ফিরিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

ভারতে লিঙ্গ পূজা।

(১)

অনেকের বিশ্বাস, কেবল ভারতবর্ষের লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল; এবং পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্য বা অসভ্য দেশে তাহা প্রচলিত ছিল না। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, লিঙ্গপূজা একটী অনার্য্য-সম্মত প্রথা। প্রাচীনকালে আর্য্যেরা অনার্য্যদের সংসর্গে আসিয়া, উহা অনার্য্যগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনার্য্য দ্রবিড়গণ লিঙ্গপূজার আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হ'ন। এই সকল বিভিন্ন মতের সমালোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রবন্ধান্তরে তাহাদের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন কালে পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশে, এমন কি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপেরও বহু প্রদেশে কোনও না কোনও আকারে লিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল প্রাচীন এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি দেশে লিঙ্গ পূজা যে প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি প্রমাণ আছে। খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে এবং পরেও এই সমস্ত দেশে লিঙ্গ পূজার সমাদর ছিল। আধুনিক অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে, খৃষ্টিয়ানগণের পবিত্র ক্রুশ (+) চিহ্ন লিঙ্গ পূজার নিদর্শন। এই পবিত্র চিহ্ন যীশু খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই য়িহুদী ও অন্যান্য জাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও পূজিত হইয়া আসিতেছিল। পরে খৃষ্টিয়ানগণ তহা তাঁহাদের ধর্ম্মের জ্ঞাপক বিশিষ্ট পবিত্র চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সমস্ত কথা সত্য হইলে বুঝা যাইতেছে যে লিঙ্গ পূজা এক সময়ে পৃথিবী ব্যাপিনী এবং আর্য্যানার্য্য জাতি নির্ব্বিশেষে প্রায় সকল সভ্য জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কোন্ জাতি এই লিঙ্গ পূজার আদি প্রবর্ত্তক, তাহা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন বটে; কিন্তু প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে যদি লিঙ্গ পূজার উল্লেখ বা আভাস থাকে, তাহা হইলে ইহাকে একটী অনার্য্য সম্মত প্রথা বলিবার কোনও কারণ নাই। বরং আর্য্যেরাই এই প্রথার আদি প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। হিন্দু আর্য্যগণ যে প্রাচীন কালে পারস্য, এসিরিয়া ব্যাবিলন, আরব ও মিশর প্রভৃতি দেশে নানা কার্য্য-ব্যপদেশে গতায়াত করিতেন, তাহা এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহাদের দ্বারা

উক্ত দেশ সমূহে লিঙ্গ পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নহে। লিঙ্গপূজার জন্মস্থান ভারতবর্ষে অদ্যাপি তাহা পবিত্র আকারেই বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু কালক্রমে এই প্রথা ভারতবর্ষীয় পবিত্র প্রথার সহিত বিযুক্ত হইয়া একটী নীতি-বিগর্হিত ও দূষিত প্রথায় পরিণত লিঙ্গপূজা হইয়াছিল। ভারতে এখনও ব্রহ্মোপাসনারই অঙ্গ রহিয়াছে; কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতে বাহিরে গিয়া তাহা জঘন্য Bacchanal festival অর্থাৎ কদর্য্য ও জুগুপ্সিত ইন্দ্রিয় পূজায় পরিণত হইয়াছিল। প্রবন্ধান্তরেবিস্তারিত ভাবে এই সমস্ত কথার আলোচনা করিব। এক্ষণে লিঙ্গ পূজা সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে কিরূপ উক্তি আছে, তাহা দেখা যাউক।

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি তাহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Active ও passive অথবা Positive ও Negtive নামক যে দুইটী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা এই প্রকৃতি ও পুরুষেরই রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয় কিন্তু ব্রহ্মশক্তি ক্রিয়াশালিনী। এই শক্তি 'ত্রিগুণাত্মিকা এবং গুণভেদে সৃষ্টি-লয়-পালন কর্ত্রী। আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে তিনি বিশ্বের পালনকর্ত্রী ও জগদ্ধাত্রী, এবং করালবদনা' কালী বা চামুণ্ডারূপে তিনি সংহারকর্ত্রী। মায়ের এই ত্রিবিধা মূর্ত্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব সময়েই দৃষ্টিগোচর হয়। স্থাবর, জঙ্গম ও উদ্ভিদ সর্ব্বত্রই মায়ের এই ত্রিবিধা মূর্ত্তি প্রকটিত। ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত এবং নিষ্ক্রিয় হইলেও, তিনিই এই মহাশক্তির একমাত্র আশ্রয়-স্থল, এবং তাঁহার সংযোগ ব্যতীত মহাশক্তির স্ফুরণ ও ক্রিয়া একান্ত অসম্ভব। বৈদ্যুতিক প্রবাহের যেরূপ Positive ও Negative current একত্র মিলিত না হইলে, অগ্নির স্ফুরণ হয় না, ইহাও তদ্রূপ। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপিণী মহাশক্তির এই অদ্ভুত লীলা ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই হইতেছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্য বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির, পুরুষ ও প্রকৃতির, বা হর ও গৌরীর সংযোগ ও মিলন কাহিনী হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত এবং লিঙ্গপূজায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি ব্রহ্ম, শিব বা মহাদেব, তিনিই পুরুষ বা প্রধান, এবং যিনি মহাশক্তি বা মহামায়া, তিনিই প্রকৃতি। এই পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতঃ এক ও অভিন্ন! একই দ্বিধা বিভক্ত, আবার পরস্পরে সংযুক্ত ও একীভূত হইয়া "অর্দ্ধ নারীশ্বর" রূপে বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছেন। সেই আদি কারণ একক বুঝিবার জন্য, একের দ্বিত্ব এবং দুইয়ের একত্ব হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত আবশ্যক।

লিঙ্গ পূজার দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির, অর্থাৎ বিশ্বের জনক জননী বা সেই একে দুই ও দুইয়ে একেরই পূজা করা হয়। লিঙ্গের মৌলিক অর্থ 'চিহ্ন' বা লক্ষণ। জনকের জনকত্ব এবং জননীর জননীত্ব লিঙ্গ নামে অভিহিত হয়। এই লিঙ্গপূজা সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা বটে ; কিন্তু এতদ্দ্বারা ভক্ত উপাসক বিদুরদাভাসের ন্যায় নিজ হৃদয়ে নির্গুণ ব্রহ্মেরও আভাস উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক-ভাব-প্রবণ ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ভক্ত উপাসকের নিকট জনকের জনকত্ব ও জননীর জননীত্ব চিরপূজ্য, চির পবিত্র ও চির গৌরবময়। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র, নীচ ও কুৎসিত ভাবের স্থান নাই। সেই সোজ্জ্বল মহাভাবের প্রদীপ্ত জ্যোতির মধ্যে অসৎ বা কুৎসিৎ ভাবের উদয়, সূর্য্যালোকের মধ্যে অন্ধকারের অবস্থানের ন্যায় একান্ত অসম্ভব। এই কারণে হিন্দু জাতির আবালবৃদ্ধবণিতা পবিত্র হৃদয়ে, নির্ব্বিকার চিত্তে ও ভক্তিপূর্ণ মনে সেই লিঙ্গরূপী ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের ও বেদী বা গৌরীপট্টরূপিনী সেই বিশ্বজননীর পূজা করিয়া আপনাদের জীবনকে সার্থক জ্ঞান করেন ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

হিন্দু পুরাণে লিঙ্গের নির্দ্দেশ এইরূপ :—পণ্ডিতগণ নির্গুণ ব্রহ্মকে লিঙ্গের কারণ ও অব্যক্তকে লিঙ্গ বলিয়া থাকেন। মহাদেব সেই নির্গুণ কারণ ; তাঁহা হইতে অব্যক্ত আবিষ্কৃত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধ। গন্ধ, রূপ, রস, শৃঙ্গ, শব্দ, স্পর্শাদি গুণ বর্জ্জিত, নির্গুণ সত্য সনাতন পরমব্রহ্ম শিবই অলিঙ্গ। তাঁহা হইতে গন্ধ বর্ণ ও রস শব্দ, স্পর্শাদিগুণ-ভূষিত জগতের উৎপত্তি কারণ, স্থূল সূক্ষ্ম ও মহা ভূতময় জগতের শরীরাত্মক লিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছেন। পরম ব্রহ্মের মায়া দ্বারা সেই অব্যক্ত লিঙ্গ ষড়বিংশতি প্রকারে বিস্তৃত হইয়াছেন। * * * সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী সেই শৈবী মায়া প্রথমে পরমেশ্বর শিব কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া, স্বভাবতঃ ব্যক্ত ভাবে আবির্ভূত হইলেন। অব্যক্ত প্রভৃতি স্থূল ভূতচয় যাহার অন্ত, সেই জগত তাঁহা হইতেই প্রকাশিত। সেই শৈবী-প্রকৃতি বিশ্ব-প্রসবিনী, সনাতনী বলিয়া বিখ্যাত। * * * পরমেশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত সেই প্রকৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী। (লিঙ্গ পুরাণ, তৃতীয় অধ্যায়)।

উক্ত পুরাণের একাদশ অধ্যায়ে হর-গৌরীর এইরূপ বর্ণনা আছে :—"পণ্ডিতগণ পরমাত্মা শিবকে কল্যাণময় ও শিবাকে কল্যাণময়ী কহিয়া থাকেন। শিবকে ঈশ্বর ও গৌরীকে মায়া বলিয়া থাকেন। * * * পুরুষগণ,

শঙ্কর, স্ত্রীগণ মহেশ্বরী। এমন কি ব্রাহ্মাণ্ডে যে কিছু স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাচ্য, তৎসমুদয়ই ভগবতী গৌরীর অংশ। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঐ উভয়ের বিভূতি। সমস্ত পদার্থ শক্তিই দেবী বিশ্বেশ্বরী, ও যে কিছু শক্তিমান্ পদার্থ, সকলই মহেশ্বর। জীবগণের, শরীরস্থিত অষ্ট প্রকৃতি ও বিকৃতি ঐ দেবীর মূর্ত্তিবিশেষ, এবং যেরূপ এক অগ্নিতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ একমাত্র যুগলরূপী ভগবান শিবই যাবৎ জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। শরীরীগণের শরীর হর-গৌরীর রূপমাত্র ও শরীরিগণ স্বয়ং শঙ্করের অংশ রূপে অবস্থিত। জগতে যে কিছু শ্রোতব্য, তৎ সকলই উমার রূপ এবং দেব মহেশ্বর শ্রোতারূপে অবস্থিত। জগতে যে ভগবান্ বিষয়ের ভোক্তা ও ভগবতী যাবদ্বিষয়রূপে অবস্থিতা। শঙ্কর-প্রিয়া যাবৎ দ্রষ্টব্য বস্তু; ও সেই বিশ্বরূপ দেব চন্দ্রশেখর দ্রষ্টা জগদীশ্বরী প্রপঞ্চরূপ দৃশ্যবস্তু, কিন্তু সেই শশিশেখর দেব বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দ্রষ্টা। যাবৎ রস ও যে কিছু ঘ্রাণযোগ্য পদার্থ সকলই উমার রূপ, এবং জগদীশ্বর শম্ভু রসাস্বাদক ও ঘ্রাতা। যাহা কিছু বিচার্য্য বস্তু, সকলই মহাদেবী বিশ্বেশ্বরী, ও ঐ বিশ্বরূপ মহাদেব একমাত্র বিচারক। বোদ্ধব্য যাবৎ বস্তু ভবানী ও সেই ভগবান্ চন্দ্রশেখরই একমাত্র বোদ্ধা। দেবী উমা বেদী-রূপিণী, ও শঙ্কর লিঙ্গস্বরূপ। সুরাসুরগণ সযত্নে বেদীতে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করেন। যে যে পদার্থ পুরুষ-চিহ্নক তৎসমুদায় শিবের; ও যে যে পদার্থ স্ত্রীচিহ্নক, তৎসমুদায় গৌরীর অংশ। জ্ঞানের বিষয়ীভূত স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালস্বরূপ যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড উমাস্বরূপ, একমাত্র দেব মহেশ্বরই জ্ঞাতা।"

লিঙ্গ পুরাণের এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, লিঙ্গপূজা বিশ্বের আদিকরণ মহাদেব, বিশেশ্বর ও তাঁহার মহাশক্তিরই পূজা। এই পূজার মধ্যে কোনও কুৎসিৎ ভাবের অবসর নাই, এবং ইহাতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইতে পারেন। তবে যাঁহাদের মন কুসংস্কারময়, সঙ্কীর্ণ ও অনুদার, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পুরাণের উক্তি উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় কি উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

অর্থাৎ "হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ইহাকে তত্ত্বতঃ জানেন, ক্ষেত্রবিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই উভয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান (মুক্তির হেতু বলিয়া) আমার অভিমত।"

যাঁহারা পুরাণোক্ত শিব ও উমার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা মহেশ্বর এবং ক্ষেত্র স্বয়ং প্রকৃতি বা গৌরী। এই উভয়েরই যে জ্ঞান, তাহাই মুক্তির হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে —

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥
কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে॥ (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

অর্থাৎ "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি জানিবে। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে জাত। কার্য্য এবং কারণ ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হ'ন, আর পুরুষ সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়া কথিত হ'ন। যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ সকল ভোগ করেন কিন্তু এই পুরুষের সৎ এবং অসৎ যোনিতে যে জন্ম, তদ্বিষয়ে সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণের সংসর্গই কারণ। এই প্রকৃতি কার্য্য স্বরূপ দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃত কার্য্য দেহ হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ তদ্‌গুণে যুক্ত নহেন। যেহেতু তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং অন্তর্যামি স্বরূপ, ইহাও উক্ত আছে। যিনি এই প্রকার পুরুষকে জানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে কোনও প্রকারে অথবা যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মেন না, অর্থাৎ মুক্ত হ'ন।"

পুনশ্চ গীতায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে :—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অর্থাৎ "হে কৌন্তেয়, মহদ্‌ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) আমার যোনি (গর্ভাধান স্থান) এবং তাহাতেই আমি গর্ভক্ষেপণ করি। তাহা হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়, মনুষ্যাদি যোনি সকলে স্থাবর জঙ্গম স্বরূপ যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং আমি বীজ-প্রদ (গর্ভাধান কর্ত্তা) পিতা।"*

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা যে মূলতঃ পৌরাণিক ভাব হইতে অভিন্ন; তাহা পাঠকবর্গ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

উপনিষদ বা বেদান্তেও এই ভাব দেখিতে পাইবেন। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া হইতে অভিন্ন। উপনিষদ সমূহের নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর মায়া প্রভাবে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। যথা :—

নেহনানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ। মাণ্ডূক্যকারিকা

অর্থাৎ 'ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ নাই' এবং ঈশ্বর মায়া দ্বারা (বহুরূপে প্রকাশ পান) এই শ্রুতি অনুসারেও (জানা যায়) যে, সেই পরমেশ্বর জাত না হইয়াও মায়া প্রভাবে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।" †

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্ত নিশ্চয়ঃ॥ (ঐ)

অর্থাৎ "স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় মায়া প্রভাবে আপনিই আপনাকে (বিভিন্ন পদার্থাকারে) কল্পিত করেন এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থ অনুভব করেন। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।"

* গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশনের প্রকাশিত গীতা হইতে গৃহীত হইল। লেখক।

† পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।

এই ব্রাহ্মী মায়াই ব্রহ্মশক্তি, দুর্গা, গৌরী বা উমা। ইঁহার সাহায্যেই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর নানা আকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন। উমার কৃপা ব্যতীত ইন্দ্রাদি দেবগণও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হ'ন নাই তাহাও উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।* গীতাতে এই মায়া সম্বন্ধে যে উক্তি আছে, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যথা :—

"ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভি সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। (সপ্তম অধ্যায়)

অর্থাৎ "এই ত্রিবিধ গুণময় (সাত্ত্বিকাদি) ভাব সকল কর্তৃক মোহিত এই সমুদায় জগৎ, এই সকল ভাবের অতীত এবং নির্ব্বিকার আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। এই সত্ত্বাদি গুণবিকারময়ী অলৌকিক আমার মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা ; যাঁহারা (কর্ম্মযোগ দ্বারা) আমারেই পান, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন।" পুনশ্চ অন্যত্র এইরূপ উল্লেখ আছে :—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢোঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥　(সপ্তম অধ্যায়)

অর্থাৎ "আমি যোগমায়াসমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত নহি। মূঢ় এই জীবলোক জন্ম-রহিত ও নিত্যস্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না।"

ব্রহ্ম ও মায়া, অর্থাৎ শিব ও শক্তির উল্লেখ যে বেদান্তশাস্ত্রেও আছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

অতঃপর বেদের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, বেদ পাঠের বিদ্যা বুদ্ধি, শক্তি বা অধিকার আমার নাই। আমি বেদের অনুবাদ পাঠ করিয়া ব্রহ্ম ও মায়া সম্বন্ধে যৎসামান্য যে আভাস উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব।

ব্রহ্মের সঙ্কল্প হইতেই যে সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ উপনিষদ্ এবং বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। সামবেদে সৃষ্টির উদ্ভব এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"He (Brahma) experienced no bliss, being isolated

* কেনোপনিষদ্ পাঠ করুন।

alone He ardently desired a companion, and immediately the desire was gratified He caused his body to divide, and became male and female; they united, and human beings were made" (Quoted by Sellon in *Anthrop. Soc. Mem.*)

ইহার ভাবার্থ এই:—ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ হইয়া নিরানন্দ হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গ কামনা করিবামাত্র, তাঁহার দেহ দ্বিধা বিভক্ত হইল. ইহার একাংশ পুরুষ, অপরাংশ নারী। পরে উভয়ে মিলিত হইয়া মানবের সৃষ্টি করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মের এই দুইটী অংশের নাম, ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তি, এবং হর ও গৌরী। এই দুই অংশের মিলনেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মিলিত ব্রহ্ম ও মায়াই পুরাণে "অর্দ্ধনারীশ্বর" রূপে উক্ত হইয়াছেন।

এই ভাব ঋগ্বেদেরও বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ৺রমেশচন্দ্র মহাশয়ের ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহা দেখাইব।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের প্রথমাংশ এইরূপ:—

"তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না; যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক্ জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। (মূলে এই অংশটি এইরূপ আছে:—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ")। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন।"

"অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন" এবং "অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপিত হইল।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই "অবিদ্যমান বস্তুটি কি?" যাহা আছে, তাহাই সৎ বা সত্য। ব্রহ্মই

সত্য স্বরূপ; তিনি ব্যতীত আর সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ "অবিদ্যমান" বা মায়া। সুতরাং "অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন" —এই বাক্যের অর্থ এই যে, সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আবৃত ছিলেন। গীতার উক্তি এই স্থলে স্মরণ করুন, "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।" আর "এই অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপিত হইল," ইহার অর্থ এই যে, এই স্থূল প্রপঞ্চময় জগৎ যাহা আমরা (মায়াপ্রভাবে) বিদ্যমান দেখিতেছি, তাহা ("অবিদ্যমান বস্তু) অর্থাৎ মায়া হইতে উৎপত্তি লাভ করিল। ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত সূক্তে "চতুর্দ্দিক্ জলময় ছিল" বলিয়া যে উক্তি আছে, সে জল ভৌতিক জল নহে; পরন্তু তাহা কারণ বারি বা Primal waters। "তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন" এই বাক্যের অর্থ এই যে, ব্রহ্মের সঙ্কল্প বা মনন (will) হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হইল।

অবিদ্যমান বস্তু হইতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তির কথা ঋগ্বেদের অন্যত্রও আছে। যথাঃ—

"দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব (অর্থাৎ ব্রহ্ম) কর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।" (দশম মণ্ডল, ৭২ সূক্ত)। দশম মণ্ডলের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১২৯ সূক্তে আরও উক্ত হইয়াছে :—

"রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। মহিমা সকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হইল। নিম্নদিকে স্বধা রহিল, প্রযতি উর্দ্ধদিকে রহিলেন।"

সায়নাচার্য্যের 'মতে' মহিমা অর্থে পঞ্চভূত 'স্বধা' অর্থে অন্ন, আর 'প্রযতি' অর্থে ভোক্তা পুরুষ। Muir বলেন, স্বধা ও প্রযতির অর্থ "A self-supporting principle beneath, and Energy aloft" অর্থাৎ শিব ও শক্তি

এই প্রযতি ও স্বধাই দ্যাবা-পৃথিবী। দ্যাবার অর্থ আকাশ। আকাশকে পিতা বা দ্যুঃপিতা (Lat. Jupiter, Greek Zeus) এবং পৃথিবীকে মাতা বলা হয়। এই পিতা মাতার সংযোগেই যাবৎ সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তি। আকাশ হইতে বৃষ্টিরূপ রেতঃ পৃথিবীর গর্ভে নিপতিত হয়; তাহা হইতে উদ্ভিজ্জ ও ঔষধির জন্ম এবং উদ্ভিজ্জ ও ঔষধি হইতেই জীবের উৎপত্তি, পালন ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই দ্যাবা বা আকাশই মহাদেব ব্যোমকেশের এবং পৃথিবীই জগদ্ধাত্রী দুর্গার স্বরূপ। ঋগ্বেদের নিম্নোদ্ধৃত সূক্তটি পাঠ করুন :—

"আমি দ্রোহ রহিত পিতৃস্থানীয় দ্যুলোকের উদার এবং সদয় মন আহ্বান মন্ত্র দ্বারা জানিয়াছি। মাতৃস্থানীয়া পৃথিবীর মনও জানিয়াছি পিতা মাতা দ্যাবা-পৃথিবী নিজ সামর্থ্য দ্বারা পুত্রগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করতঃ প্রভূত বিস্তীর্ণ অমৃত প্রদান করেন।' (ঋগ্বেদ ১।১৫৯২)।

পুনশ্চ নিম্নোদ্ধৃত ঋকের অনুবাদ পাঠ করুন :—

বিস্তীর্ণা ও মহতী ও পরস্পর বিযুক্তা পিতা মাতা দ্যাবা-পৃথিবী) ভূত সমহকে রক্ষা করিতেছেন। দ্যাবা পৃথিবী শরীরীদিগের মঙ্গলের জন্যই যেন সযত্না; কারণ পিতা সমুদয় পদার্থকে রূপ প্রদান করিতেছেন" (ঋগ্বেদে ১।১৬০।২)।

হরগৌরীর শিব ও শিবা নাম কেন হইল, তাহা পাঠকবর্গ এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন।

পুনশ্চ নিম্নোদ্ধৃত ঋকের অনুবাদটি পাঠ করুন,—

"স্বর্গ আমার পিতা, যজ্ঞস্থান আমার বন্ধু, বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা। উত্তান পাত্রদ্বয়ের মধ্যে যোনি আছে, তথায় পিতা গর্ভ উৎপাদন করেন।" (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৩)।

লিঙ্গপূজা আর্য্যপ্রথা কি না, এবং লিঙ্গপূজার অর্থ কি তৎসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করিলেও চলে। ঋগ্বেদেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রথার বীজ নিহিত আছে। জগতের মধ্যে যাহা কিছু সত্য তাহাই বেদে প্রকটিত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই সত্যকে দর্শন করিয়া নানা ভাবে ও নানা উপমা দ্বারা তাহা প্রচারিত করিয়াছেন। এই দ্যাবা পৃথিবীই ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তির স্থূল প্রকাশ, তাহা বুদ্ধিমানগণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঋগ্বেদে আদিত্য বা সূর্য্যকে দ্যাবা-পৃথিবীর সন্তান বলা হইয়াছে। যথা :—

"আদিত্য পিতামাতাস্বরূপ দ্যাবা-পৃথিবীর পুত্র।" (ঋগ্বেদ ১।১৬০।৩)।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। পরে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বা মায়ার পারস্পরিক সংযোগ হইবেক, জ্যোতির্ম্ময় দেবগণের মধ্যে পরম জ্যোতির্ম্ময় আদিত্যই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে "দ্যাবা-পৃথিবীর পুত্র' অর্থাৎ শিব ও শক্তির কুমার (স্কন্দ) দেবসেনাপতি; এবং ইনিই অন্ধকার-রূপ অসুর বিনাশ করিয়া আদিত্য বা সূর্য্যরূপে প্রকটিত। এই সূর্য্যই সবিতা, এবং ইনিই কাল ও কার্য্য ভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। (সন্ধ্যোপাসনার মন্ত্রগুলি পাঠ করুন)। যিনি আদিত্য, তিনিই অগ্নি। যথা :—

'অগ্নি অসৎও বটেন, সৎও বটেন। তিনি পরমধামে আছেন। তিনি

আকাশের উপরে সূর্য্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদিগের অগ্রে জন্মিয়াছেন। তিনি যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের উভয়রূপী।" * (ঋগ্বেদ ১০.৫.৭)।

এই অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের অন্যত্র এইরূপ উক্তি আছেঃ—

"দুই অরণি যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ, তাহাদিগের কার্য্য অতি আশ্চর্য্য। তাহারা একত্র হইল এবং যথাসময়ে অগ্নিরূপী বালককে জন্মদান করিয়া লালন পালন করিল। (ঋগ্বেদ ১০।৭।৩)

পূর্ব্বে দ্যাবা-পৃথিবী সূর্য্যের জন্মদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পরে সূর্য্য ও অগ্নি অভিন্ন বলিয়া উক্ত হইলেন। অগ্নির জন্মদাতা হইলেন। দুইটি মিলিত অরণি। এই কারণে দ্যাবা পৃথিবী, অর্থাৎ বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতা, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বা লিঙ্গ ও যোনি অথবা পরস্পর মিলিত দুইটী অরণি-কাষ্ঠ (খৃষ্টিয়ানগণের, ক্রশ + বা (Crux Ansata) বিশ্বসৃষ্টির সাঙ্কেতিক কারণরূপে পরিগণিত হইত এবং এই সঙ্কেত জগতে এরূপ পূজ্য ও পবিত্র হইল। দুই প্রস্তরের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারাও অগ্নির ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্ত্তার উৎপত্তি হয়। এই কারণে প্রস্তররূপী লিঙ্গ ও যোনি (বেদী বা গৌরীপট্ট) বিশ্ব-সৃষ্টির তথা বিশ্বেশ্বর ও মহামায়ার সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ভারতে সম্পূজিত হইতেছেন। এই পূজা কালক্রমে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি, এই পূজার উৎপত্তিস্থল পবিত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র ইহা জুগুপ্সিত আকার ধারণ করিয়াছিল। কেবল খৃষ্টিয়ানেরা ক্রুশের নিদর্শন দ্বারা এখনও এই মহান্ তত্ত্বের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ইহার যে অর্থ করেন, তাহাতে উক্ত মহান্ তত্ত্বটি সূচিত হয় না। প্রবন্ধান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রী অবিনাশ চন্দ্র দাস।

---

* ঋগ্বেদে অগ্নির অপর নাম রুদ্র। রুদ্র পুরাণে শিব নামে পরিচিত। অগ্নি "বৃষ বটেন, গাভীও বটেন"—ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্ত্রী পুরুষ ও উভয় রূপী, অর্থাৎ "অর্দ্ধ নারীশ্বর।" বৃষ কেন শিবের বাহন হইয়াছেন, এবং গো বা গাভী কেন ভগবতীরূপে পূজিত হইতেছেন, তাহার কারণ উদ্ধৃত ঋকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। লেখক

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাদ্রমাস। ভাগীরথী পূর্ণ কলেবরা হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া নদী-গর্ভস্থ নৌকাগুলিকে ঈষৎ দোলাইয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। অপূর্ব্ব প্রস্তর নির্ম্মিত আকাশ-চুম্বি হর্ম্ম্যরাজ গঙ্গার বাম পার্শ্বে শোভা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। পুণ্য সলিলা নদীর তরঙ্গগুলি মন্দ মন্দ বায়ু সংস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালা সৃজন করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানে আঘাত করিতেছে। সৌধ চূড়াগুলি অরুণোদয়ে বালার্করাগে রঞ্জিত হইয়া যেন কলধৌত বলিয়া বোধ হইতেছে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ মালার উপর ঈষৎ অরুণরাগ পতিত হইয়া যেন স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বদিকে নানাবিধ বৃক্ষরাজি সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত! ঘাটে নবীনা, প্রবীনা, সাধু, সন্ন্যাসী সকলেই স্নান করিতেছে। কেহ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া 'বোম বোম' শব্দে গগণভেদ করিতেছে; কেহ বা অঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিয়া অঙ্গে ভগবানের নাম লিখিতেছে। কেহ মালাহস্তে ধ্যানে নিমগ্ন। দণ্ডী উর্দ্ধবাহু গিরিপুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসীর দল একে একে ঘাটে স্নান করিয়া উপরে যাইতেছে। কেহবা "মাতর্গঙ্গে তব জল মহিমানিগমে খ্যাতঃ।" বলিয়া গঙ্গার স্তোত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণু পাদোদ্ভূতা সুরেশ্বরী হরপ্রিয়ার আরাধনা করিতেছে। সন্তরণপটু বালকগণ সন্তরণ দিয়া এ ঘাট হইতে ও ঘাটে যাতায়াত করিতেছে। সর্ব্বদাই জন সমাগম; কত লোক ঘাট হইতে উপরে যাইতেছে, কিন্তু পথিপার্শ্বে ঐ যে এক ব্যক্তি পড়িয়া 'একটু জল দাও' শব্দে চীৎকার করিতেছে, এ কথা কি কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। সকলেই ত' বেশ চলিয়া যাইতেছে! তাহার কাতর প্রার্থনা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিল না। লোকটী পীড়াগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়, নতুবা ঘাটের এত নিকটে থাকিয়া জলের জন্য ব্যাকুল হইবে কেন? আর অত মাছি বা ছিন্ন বস্ত্রের উপর বসিবে কেন? নিকটে যাইতে লোকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করিবে কেন? বোধ হয় তাহার অঙ্গে দুর্গন্ধ মল সংযুক্ত থাকিবে।

অনেকক্ষণ পরে একটী ব্রহ্মচারীর হৃদয় সে আকর্ষণ করিয়াছে। সন্ন্যাসী স্নান করিয়া এক কমণ্ডলুপূর্ণ জল লইয়া আশ্রমে যাইতেছেন ; মুখে বলিতেছেন—

"নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী।"

সহসা সম্মুখে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহার স্তোত্র বন্ধ হইয়া গেল। সাগ্রহে তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন -"এ অবস্থায় পড়িয়া কেন ?"

সে কিছুই বলে না ; কেবল বলিল—"একটু জল"!

সন্ন্যাসী কমণ্ডলুর জল তাহার মুখে দিলেন ; তখন তাহার কথা বাহির হইল। সে বলিল,—"মহাশয় কাল রাত্রি হইতে কয়েকবার দাস্ত হওয়ায় আমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি ! জল পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় এই ঘাটে জল খাইব বলিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু এত দুর্ব্বল-- যে পড়িয়া গেলাম, আর উঠিতে পারি নাই ; তাই এইখানেই পড়িয়া আছি। কতলোক এইখান দিয়া চলিয়া গেল, কেহই একটু জল দিল না। আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইলেন।"

সন্ন্যাসী বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে তাহার চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট ; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালিমা পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বমি হইয়াছে ?"

সে ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, কয়েকবার বমিও হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী। তোমার প্রস্রাব হইয়াছে ?

লোকটী। প্রথমে একবার হইয়াছিল ; কিন্তু শেষে আর হয় নাই।

সন্ন্যাসী। মল কি খুব পাত্লা হইয়াছিল ?

লোকটী। হাঁ পাত্লা জলের মত—একটু শাদা।

সন্ন্যাসী বেশ বুঝিলেন যে ইহার 'কলেরা' হইয়াছে। বলিলেন—"তোমার হাত দেখি ?"

লোকটী। না—না, আমাকে ছুঁইবেন না। আমার কাপড়ে ময়লা লাগিয়া আছে।

সন্ন্যাসী। সেজন্য 'তোমায় ভাবিতে হইবে না।' হাত দেখিয়া সন্ন্যাসী নাড়ী পাইলেন বটে, তবে বড় ক্ষীণ। যাহা হউক সন্ন্যাসী ইহার সুব্যবস্থা না করিয়া আশ্রমে যাইতে পারিলেন না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি থাক কোথায় ?"

লোকটী বলিল—"থাকিব আর কোথায়। বাবা বিশ্বনাথের সীমানার মধ্যে—এখন যেখানে দেখিতেছেন—সেইখানে।

সন্ন্যাসী। তোমার কেহ আছে কি ?

লোকটী। আজ্ঞে এই একখানা গামছা, আর ছেঁড়া একখানা কাপড় ছাড়া আর আমার সঙ্গে কিছুই নাই।

সন্ন্যাসী। সংসারে তোমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেহ আছে কি?

একটু চিন্তা করিয়া লোকটী বলিল—"হাঁ আছে আমার স্ত্রী নাকি এই কাশীতেই আছে।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন—"তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এরূপ পীড়িতাবস্থায় একাকী এখানে কেন?"

লোকটী হাঁসিয়া বলিল—'ঠিক—ঠিক। আমি ত তা'কে ত্যাগ করে ছিলাম, কিন্তু এখন তা'কে ত খুঁজে পা'চ্ছি না।"

সন্ন্যাসী। তবে কি তা'কে খুঁজতে এসে এই অবস্থায় পড়েছ?

লোকটী। প্রথমটা তাই বটে তবে এখন আর তা নয়। এখন বাবার কৃপায় বেশ বুঝেছি ও সব খোঁজাখুঁজি মিছে।

সন্ন্যাসী। তোমার স্ত্রীর কোন খবর পাওনি বোধ হয়।

লোকটী। খবর পাই নাই—পাবার চেষ্টাও নাই। এখন বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি য, ভগবান তা'কে ঠিক আশ্রয় দিয়েছেন। দেখুন আমি কত লোককে 'জল—জল' বলে চীৎকার ক'রেম কেউ দিলে না—শেষ চুপ করে রইলেম, আর আপনি এসে পড়লেন।

সন্ন্যাসী। যাক্ এখন সে সব কথা। তোমাকে আমাদের আশ্রমে লইয়া যাই, সেখানে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ হইলে, যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইও।

লোকটি। আমি এখানেই বেশ আছি। সম্মুখে ঐ যে ভাগীরথীর পূতধারা—ঐ যে বিশ্বেশ্বরের মন্দির। আমার জীবনও বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। আর কেন—বেশ নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ সহকারে চলেম। কিন্তু—

সন্ন্যাসী। কিন্তু কি—তোমার মৃত্যু লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না, আর তোমাকে বেশ বিবেক সম্পন্ন দেখছি।

লোকটী। ওহো ঠাকুর। ভুল বল্লেন—ভুল বল্লেন। আমি যে সব পাপ করেছি, তার তালিকা তৈয়ার কল্লে খুব বড় হয়ে পড়বে। তবে এখন কোন কষ্ট নাই; কেবল ঐ পাপের কথাগুলো মনে মনে জেগে উঠে.তখন বড় জ্বালাতন হয়ে পড়ি।

সন্ন্যাসী। বেশ কথা এখন তোমার সঙ্গে বচসা কর্ত্তে ইচ্ছে নাই;—চল তোমায় নিয়ে যাই; তুমি নিশ্চয়ই আরোগ্য হবে।

লোকটী। আমার এখন সব জায়গায় সমান! লোকের দয়ার উপর আমার

জীবন নির্ভর। আপনি দয়া করে নিয়ে যান ভালই ; কিন্তু উঠ্‌বার যে শক্তি নাই।

সন্ন্যাসী। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই ; আমি তোমাকে কোলে ক'রে নিয়ে যাব। ঐ দেখ আমাদের আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

তখন তিনি একজনকে ডাকিলেন ; এবং স্বহস্তে তাহার বমি ও বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া দুইজনে তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন।

আশ্রমে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে অবাক্। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার জন্য ধৌত বস্ত্র আনীত হইল ; অতি সুন্দর পরিষ্কার বিছানা। তৎক্ষণাৎ ঔষধের ব্যবস্থা ও একটী নবীন সন্ন্যাসী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। সে যেন তাহাদের একান্ত আপন। লোকটী মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল ও হাসিয়া ফেলিল।

পরিচর্য্যাকারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাসিতেছেন কেন" ? আগন্তুক বলিল—"আমার হাসির একটু কারণ আছে। আমি মহাপাপী,—কোথায় পূতিগন্ধময় নরক আমার জন্য নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা না হইয়া ভুলক্রমে স্বর্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছি ;—সেই জন্য হাসি পাইতেছে"।

পরিচর্য্যাকারী বলিলেন—"আপনি এখন কথা বলিবেন না : এখন কথা বলা নিষেধ।" পাঠক বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন যে, ইনিই আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত উমাপদ ব্রহ্মচারী। এইটীই ইঁহার প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রম।

যাহা হউক ইঁহাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় সে ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিল। কিছুদিন তথায় অবস্থান করার পর লোকটী ভাবিল যে, 'এখন ইহাদের এখানে থাকিয়া অনর্থক কষ্ট দিই কেন।' তাই কৃতজ্ঞতার আবেগে সে উমাপদ ব্রহ্মচারীর নিকট গমন করিল। উপস্থিত হইবামাত্র সন্ন্যাসী বলিলেন, —"কেমন, এখন বেশ সুস্থ বোধ হইতেছে ত' ?" "আজ্ঞে হাঁ। আপনার কৃপায় এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম ; আর একবার এক সন্ন্যাসীর কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছি। যাহা হউক আপনি যে বিরাট ব্যাপার করিয়াছেন, তাহাতে যে জগতের কতদূর উপকার হইতেছে, তাহা আর কি বলিব ? আপনি ধন্য !"

"আমায় ধন্যবাদ দিবার প্রয়োজন নাই ; সকলি মায়ের ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারার-ইচ্ছায় জগত চালিত। লোকে মিছে 'আমি করি' রবে মত্ত হয় মাত্র।"

"তবুও নিমিত্ত হওয়া চাই। মা ত' নিজের হাতে করেন না !"

"কে বলিল তিনি নিজের হাতে করেন না ? তিনি যে, —"সর্ব্বতঃ পাণি

পাদং সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং”—মায়ের হাত সর্ব্বত্র—তিনিই কার্য্য করিতেছেন। যেদিন যে কার্য্যের শেষ করা আবশ্যক হইবে, সেদিন অমনি হাত গুটাইয়া লইবেন। আমরাও তখন আর এ কার্য্যে ব্রতী থাকিব না। আমরা ত' যন্ত্র; যন্ত্রী না বাজাইলে যন্ত্র বাজিবে না। ভাই, ক্ষমা করিও! এতদিন তোমার নাম জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—তোমার নাম কি ভাই?

“আমার নাম নবকুমার দেবশর্ম্মা। কিন্তু আমি কেবল বংশগত ব্রাহ্মণ—কার্য্যতঃ কিন্তু অতি নীচ প্রকৃতির—মহাপাপী—অতি জঘন্য!

ব্রহ্মচারী। তুমি ওসব কথা বল্‌ছ কেন? তোমার কথায় বোধ হয় যে তুমি জীবনে কোনরূপ গুরুতর বেদনা পাইয়াছ;—সেদিনও ঐরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলে। তোমার নিবাস কোথায়?

নবকুমার। আমার নিবাস বীরভূম জেলার একটী পল্লীগ্রামে।

ব্রহ্মচারী। গ্রামের নাম।

নবকুমার। গ্রামের নাম বনগ্রাম।

ব্রহ্মচারী। দেশে তোমার কে কে আছে।

নবকুমার। আজ্ঞে কেহই নাই।

ব্রহ্মচারী। সেদিন বল্লে যে তোমার স্ত্রী এইখানেই আছে। তা'র নাম বল্লে খোঁজ ক'রে দেখা যেতে পারে। আমাদের ত' লোকের অভাব নেই।

নবকুমার। বোধ হয় আমার স্ত্রী বাঁচিয়া নাই। আমি কাশী এসে অনেক অনুসন্ধান কল্লেম, কিন্তু কোন সন্ধান কর্ত্তে পারি নাই। তবে রাস্তায় কোথাও কোথাও জান্‌তে পেরেছি যে সে এই কাশীধামে এসেছে।

ব্রহ্মচারী। যদি এখানে এসে থাকে, তবে তুমি খোঁজ নাও পেতে পার। কারণ স্ত্রীলোক হয়ত কোন ভদ্রঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সে যাহোক তুমি এমন মলিন মুখে বসে রইলে কেন?

নবকুমার নীরব, কোন কথা বলিল না; একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ব্রহ্মচারী তখন সান্ত্বনাবাক্যে বলিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, যাহা হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া কোন লাভ নাই। আমাদের এই আশ্রমের সেবকদিগকে অদ্যই একথা জানাইয়া দিব। তাহারা সমস্ত কাশী অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে।

নবকুমার এই দেবতুল্য আশ্রয়দাতার বাক্যে হৃদয়ে যে কি আনন্দ অনুভব করিল—কথায় তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া প্রাণের আবেগে বলিল,—

"আপনি সন্ন্যাসী—নারায়ণ! আমার কথা একটু শুনুন—আপনি আমার কথা একটু শুনুন। আমি অতি হতভাগ্য। বাল্যকালেই পিতৃহীন,—অভিভাবক অভাবে কুসঙ্গে পড়িয়া নানাবিধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হই। আমার পাপের কথা শুনিলেও পাপ!"

ব্রহ্মচারী। তোমার গভীর অনুতাপে সে পাপ অনেকটা ধ্বংস হইয়াছে।

নবকুমার। না—না, আমার এখনও বলা হয় নাই। আমার স্বগ্রামে একটী রূপবতী কামিনীর পানি গ্রহণে আমি উন্মত্ত হইয়া পড়ি; পরে সেই স্ত্রীলোকটী বিধবা হইলে প্রকারান্তরে তাহাকে ঘরের বাহির করি, সেইদিন হইতে চির প্রবাসী—পরান্নদাস—ভিক্ষায় জীবন নির্ব্বাহ।

ব্রহ্মচারী। অবশ্য কর্ম্মের ফল মানুষকে কোন না কোন সময়ে ভোগ করিতে হইবেই হইবে। তবে এ পাপ অতি উৎকট বলিয়া এত শীঘ্র তোমায় ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন যখন অনুতাপ হইয়াছে, তখন তোমার চিত্ত-শুদ্ধির বিলম্ব নাই। তবে সে স্ত্রীলোকটীকে পরিত্যাগ করিলে কেন?

নবকুমার। আমি পরিত্যাগ করিব কেন! সে সতী রমণী আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না;—আমি কেবল পুড়িয়া মরিলাম!

ব্রহ্মচারী। তবে এ পাপ গুরুতর আকার ধারণ করে নাই; এ ভোগাশা কেবল প্রবৃত্তি জনিত; শীঘ্রই ইহা শেষ হইবে। এখনও তাহাকে পাইবার আশা রাখ?

নবকুমার। না—না, এখন তাঁহাকে আমি মাতৃজ্ঞানে পূজা করি। আমি এক মহাত্মার উপদেশে এখন সে ভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার কথামত বাটী গিয়াছিলাম; গিয়া দেখিলাম আমার বৃদ্ধ মাতা মারা গিয়াছেন,—স্ত্রীটী আমার অনুসন্ধানে কাশী যাত্রা করিয়াছে; তাই আমিও কাশী আসিলাম। অনেক দিন খুঁজিলাম, তারপর ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া আপনার সঙ্গলাভ। অবশ্য এখন হৃদয়ে অনেক শান্তি পাইয়াছি। প্রার্থনা করি পরজন্মে সেই স্ত্রীকে পুনরায় পাইয়া আমার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করি।

ব্রহ্মচারী। তোমার চিত্ত অনেক সবল হইয়াছে। তুমি এই আশ্রমে সেবাকার্য্যে মন দাও—তোমার চিত্ত জীবের সেবায় সংযুক্ত করিলে, তুমি হৃদয়ে শান্তি পাইবে। আর যদি তাহাতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে এই সেবাশ্রমের কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হও। তোমার অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা তোমার স্ত্রীর নাম কি এবং সেই স্ত্রীলোকটীরই বা সংবাদ কি?

নবকুমার। আমার স্ত্রীর নাম বিনোদিনী এবং সেই স্ত্রীলোকটীর নাম হেমলতা। তাঁহার সংবাদ কিছুই অবগত নহি। তাঁহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি আমি দেখিতে পাই তাহাতেই আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি; সেও কোথায় চলিয়া যায়। আর কোন সংবাদ পাই নাই।

ব্রহ্মচারী। তাহার স্বামীর নাম তোমার জানা আছে কি?

নবকুমার। তাঁহার স্বামীর নাম নির্ম্মলকুমার। তিনি ধনীর সন্তান; তাঁহার পিতার নাম বীরেন্দ্র বাবু। বাটী ঐ জেলায় প্রায় ১২।১৪ ক্রোশ দূরে হইবে।

ব্রহ্মচারী। তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ও তোমার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার বেশ মনে হইতেছে যে, তোমার চিত্ত এখন বেশ নির্ম্মল হইয়াছে। তুমি আমার কথা শোন। এই সেবাশ্রম হইতে যাইও না। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, চেষ্টা করিলে শীঘ্রই তোমার হৃদয়স্থ লুপ্তপ্রায় ধর্ম্ম-বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে। তুমি বলিয়াছ যে, একবার এক সন্ন্যাসীর দ্বারা তোমার জীবন রক্ষিত হইয়াছে, এবং তাঁহার অনুগ্রহে ভ্রান্তি ঘুচিয়াছে। এ অবস্থায় তুমি সেবা কার্য্যে মন দিলে, নিশ্চয়ই ভগবান তোমায় কৃপা করিবেন সন্দেহ নাই।

নবকুমার। এমন সৌভাগ্য কি আমার হইবে। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য! আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আমায় যাহা আদেশ করিবেন, তাই সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালনের চেষ্টা করিব তবে আপনার নিকট হইতে দূরে না যাইতে হইলেই ভাল হয়। এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে—"জয় কালীমায়ীকী জয়" 'জয় কাশী বিশ্বনাথজী কি জয়" ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। কয়েক জন ব্রহ্মচারী ভিতরে প্রবেশ করিয়া মায়ের সম্মুখে প্রণামান্তর উমাপদ ব্রহ্মচারীর সন্নিকটে গমন করিয়া প্রণাম করিতেই—ব্রহ্মচারী বলিলেন "কি ভাই কালীপদ। সংবাদ কি বল।"

কালীপদ। "সংবাদ আর নূতন কি বলিব দাদা—গ্রাম ত' উৎসন্ন প্রায়! সর্ব্বত্রই মায়ের সংহার মূর্ত্তি! তবে অন্নাভাবে এ সকল গ্রামে একটীরও মৃত্যু হয় নাই,—কেবল প্লেগ রোগেই মৃত্যু। অবশ্য অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছে; সকলি মায়ের ইচ্ছা।

উমাপদ। তোমরা সকলেই কুশলে ফিরিয়াছ ত'—তোমাদের আরো দুই একজন সহগামীদিগকে দেখ্‌ছি না কেন?

কালীপদ। না দাদা, তাহারা কয়েকজন এখনও আসে নাই। একটী স্ত্রীলোকের সন্ধানে তাহারা গিয়াছে। কল্যাণপুর গ্রামে অবস্থান কালীন একটী

সেবিকা ব্রহ্মচারিণী—কিন্তু বিবাহিতা, আমাদিগকে সংবাদ দেয় যে, একটী স্ত্রীলোক নিকটেই মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছে। সংবাদ পাইবামাত্র আমরা তাহাকে লইয়া আসি। সেবা শুশ্রূষায় সে কথঞ্চিৎ আরোগ্য হয় এবং অন্ন পথ্য করার পর সেই সেবিকা সে স্থান হইতে চলিয়া যান। সেই স্ত্রীলোকটীও আমাদিগকে সংবাদ না দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু সে অবস্থায় তাহার যাওয়া ভাল হয় নাই; এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় পুনরায় বিপদ আশঙ্কায় ঐ দুইজনকে প্রেরণ করি। কিন্তু তাহারা এখনও ফিরিল না। আমার আর কোন কার্য্য অবশিষ্ট না থাকায় চলিয়া আসিলাম।

উমাপদ। সেবিকাটী কে, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর নাই?

কালীপদ। জিজ্ঞাসা করি নাই এমন নয়, তবে বিশেষ সদুত্তর পাই নাই।

কালীপদ। এই সেবাকার্য্যে গিয়া যে কি আনন্দ পাইলাম, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। দাদা যখন এই কার্য্যে যাইলাম, তখন প্রথমে বড় ভয় হয়েছিল। প্লেগের সংক্রামকতা স্মরণ করিয়া মনে মনে কি এক শঙ্কা উপস্থিত হ'ত। মনে হ'ত, পরের জন্য বুঝি প্রাণটা যায়, কিন্তু কি বলব, শেষে দেখলেম্ যে সকলেই আমার আপন—ভাই ভগ্নী। তখন কিসের শঙ্কা—কিসের ভয়! থাক্ দাদা—যে জ্ঞান ভিতরে ফুটেছে, বোধ হয় শত জন্ম তপস্যা দ্বারা তাহা হয় কি না জানি না।

উমাপদ। আচ্ছা সেই স্ত্রীলোকটী ঐরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় একাকী গেল কেন?

কালীপদ। একাকী গেল কেন? তার একটু কারণ আছে। তার স্বামী কাশীতে আছে; তাহার স্বামীর কাছে যাবার জন্য সে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল। আমরা তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব বলেছিলাম; তবুও শুনলে না। এতটা দূর এসে নিশ্চয়ই ব্যারাম হ'য়ে পড়্‌বে।

নবকুমার এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল;—এই ঘটনাটী শুনিয়া সে বলিল—"ঠাকুর! তাহার নাম জানেন কি?"

কালীপদ। "তাহার নাম বিনোদিনী"

নবকুমার। "সেই বটে ঠাকুর।—সেই বটে"; বলিয়া নবকুমার কাঁদিয়া ফেলিল।

কালীপদ। আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? সে কাশী থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আনিয়া দিব।

নবকুমার। কি বলিব ঠাকুর। এতদিন আমি কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করিয়াছি —আমার...

উমাপদ। দেখ ভাই, ভগবানের সংঘটন। উতলা হইও না—মায়ের ইচ্ছায় সে সতীর সহিত তোমার পুনরায় দেখা হইবে। ব্যস্ত হইও না।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সুখ-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণার ঘাত প্রতিঘাতে মানবের বিষয়াসক্ত চিত্ত কখন কখন এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, যে তখন চিত্ত আর ভোগ-বিয়োগ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রাণ আকুল হইয়া কি জানি কোন অনাস্বাদিত অব্যক্ত সুখের আশায় এতদিনের আকর্ষণীয় বস্তুকে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বীরেন্দ্র বাবুরও সেই অবস্থা; তিনি আজীবন বিষয়কে বরণ করিয়া তাহাকেই সার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। কাশীতে আসিয়াও বিষয় সেবা পরিত্যাগ করিয়াও কামনার হাত হইতে এড়াইতে পারেন নাই, তাহার প্রায়ই মনে হইত এত দিন তাহার কত সম্পত্তি বেদখল হইয়া গেল কত জমি কম হারে বিলি হইল, তিনি তথায় থাকিলে হয়ত' কত উন্নতি সাধিত হইত। বাস্তবিক বিষয় ছাড়িলেই কামনার হাত এড়ান যায় না। এমন মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়া বীরেন্দ্র বাবুর এ চিন্তা কেন? তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তনের কথা পাঠক অবগত আছেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি সেবাশ্রমের জন্য দান করিয়া এখন বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করিতেছেন। উমাপদ ব্রহ্মচারীর উপদেশে এবং ব্যবহার সন্দর্শনে মা কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার কথা তাহার হৃদয়ে ফুটিয়াছে। তা'ই তিনি তাহার পত্নীর সহিত অপরাহ্নে বসিয়া পরমার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"দেখ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই ব্রহ্মচারীর সহিত সম্বন্ধ। তাঁহার কৃপাতেই বুঝিলাম যে এতদিন ঠিক রাস্তাতে চলি নাই। যাঁহার স্তন্য পানে বর্দ্ধিত, যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমরা বর্ত্তমান, সেই জগজ্জননীর কথা ভুলিয়া গিয়া কি ভুলই করিতেছিলাম! এতদিন সেই মাকে ভুলিয়া গিয়া কেবল হাসিলাম কাঁদিলাম, খেলিলাম, বেড়াইলাম, মায়ায় মজিলাম; মহামায়ার দিকে তাকাইলাম না।

রাস্তা দিয়া কত জন কত রকম বেশ ধরিয়া—নানা সাজে সাজিয়া চলিয়া যাইতেছে; সেই সঙ্গে একটী লাবণ্যময়ী রমণীও পথ আলো করিয়া চলিয়া যাইতেছে। গৈরিক বসনপরিহিতা ত্রিশূলধারিণীর অপূর্ব্ব ছটা যেন বীরেন্দ্র

বাবুকে মুগ্ধ করিল। পূর্ব্বে হয়ত এরূপ রমণী চক্ষে পড়িলেও ভিক্ষুক ভিন্ন অন্য ভাব মনে আসিত না; কিন্তু চিত্তের গতি যখন এইরূপ, মন যখন ভগবদ্ অভিমুখী, বিষয়-বাসনা যখন অন্তর্হিত, বৈরাগ্য যখন হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তখন সেই সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, যেন কৈলাসবাসিনীর কোন সহচরী জীবের কল্যাণ কল্পে আজ কাশীর পথে প্রকট মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা! সেই দিব্যরূপ ভস্মে কথঞ্চিৎ আবৃত হইলেও তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে যেন স্বর্গীয় তান ধ্বনিত হইতেছে। সন্ন্যাসিনী গাহিতেছেন—

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তে পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ, তথাপি নমুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।
অগ্রে বহ্নি পৃষ্ঠে ভানু, রাত্রৌ চুবুকসমর্পিত জানুঃ।
করতল ভিক্ষা তরুতল বাস, তদপি নমুঞ্চত্যাশাপাশঃ।

গান শুনিয়া বীরেন্দ্র বাবুর মনে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। "বাস্তবিক দিনের পর দিন চলিয়া গেল, কিন্তু আশার নিবৃত্তি কোথায়! হায়! হায়! কি লইয়া এতদিন সময় নষ্ট করিলাম! আশার চাদরে মুখ ঢাকা দিয়া, কামনা স্বরূপা কামিনীকে বাহু পাশে বেষ্টন করিয়া কি নিদ্রাই গিয়াছিলাম! আপনাকে ভুলিয়া কি ভ্রান্তিই করিয়াছি! সময় ত' একেবারে চলিয়া গেল, এ ঘুম ত' কেহই ভাঙ্গাইতে পারে নাই!" বীরেন্দ্র বাবু এই ভাব-নিবহের মধ্যে যেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গানর ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন। যেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গানর জন্য মহামায়া আজ তাঁহার সহচরীকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ছাদের উপর হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—

'মা! তোমার সুমধুর গীতে বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি! বল মা, একটু স্থির হইয়া দাঁড়া মা! তোমার বীণা নিন্দিত কণ্ঠে এই সুমধুর শঙ্কর বাণী আমার প্রাণে যে কি অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তোকে আর কি বলিব! সন্ন্যাসিনী গাহিতে লাগিলেন,—

যাবৎ বিত্তোপার্জ্জন সক্তঃ, তাবন্নিজ পরিবারোরক্তঃ।
তদনু জরয়া জর্জ্জিত দেহে, বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোপিনগেহে॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশন বিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং, তথাপি নমুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং॥

বীরেন্দ্র। "ঠিক কথা মা! আশা এমনই কুহকিনী বটে! আমি এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রহারা! বংশহীন অবস্থায় বহু সম্পত্তির বন্দোবস্তে এবং চিন্তায় কাল

কাটাইলাম! কাহার জন্য—কাহার জন্য! জীবনের অমূল্য সময় ভগবানের দিকে না চাহিয়া কি করিলাম! আশা—কুহকিনী আশা! বল্ মা, আবার বল—তোর সুমধুর কণ্ঠে আবার বল! সন্ন্যাসিনী গাহিলেন,—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্ত।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন, পরমে ব্রহ্মণি কোপিন লগ্ন।
কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা তে জননী কো বা তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্ব সংসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্ন বিচারং॥

বীরেন্দ্র বাবু মনে মনে বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসিনীর কথায় কি অদ্ভুত ভাবের বিকাশ! আজ কি এক দৈবী শক্তির সমাবেশ! নতুবা এই কথা অনেক দিন শুনিয়াছি, কৈ প্রাণে ত' একদিনও ইহার আভাস জাগে নাই! কৈ এক দিনও ত' মনে হয় নাই—'আমি কে?' 'কোথা হইতে আসিলাম—আবার কোথায় যাইব?' আজ যেন সহসা মনে আঘাত লাগিল, যেন মুদ্রিত চক্ষু কে বলপ্রয়োগে খুলিয়া দিল— বীরেন্দ্র বাবু আজ সংসার যেন নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলেন, আর সর্ব্বদাই কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

"পরমে ব্রহ্মণি কোপিন লগ্ন"

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলেন! বীরেন্দ্র বাবু কিছু ভিক্ষা প্রদান করিলেন এবং পুনরায় এই পথে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী ভিক্ষায় যাহা সংগ্রহ করেন, অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গ দেখিলেই তাহা বিতরণ করেন। সন্ন্যাসিনী ক্রমে কাশীতে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, যেদিন যেখানে ঘটনাচক্রে অবস্থিতি ঘটিয়া উঠে, সেদিন সেইখানেই অতিবাহিত করেন। মাতৃভাবের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেই তাহাকে "মাতাজী" আখ্যা প্রদান করিয়াছে। তিনি ক্রমে ঐ নামে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কার্য্য ভদ্রগৃহের অন্তঃপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া তরুতলাশ্রয়ী রুগ্নদেহের পরিচর্য্যা পর্য্যন্ত প্রসারিত। তাঁহার সেবাধাম কাশীর আদর্শ হইয়া পড়িল। এতদ্ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম জীবনের শিক্ষা বিষয়েও তিনি ক্রমে অনেক গৃহে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন। যে তাঁহার সহিত ক্ষণিক আলাপ করিয়াছে, সেই তাঁহার কথায় মুগ্ধ ও ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য দর্শনে আশ্চর্য্য! বীরেন্দ্র যেদিনই তাহার দর্শন পাইতেন, সেইদিন তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে সেই গীত শুনিতেন,—"পরমে ব্রহ্মণি কোপিন লগ্নঃ।" (ক্রমশঃ)

জানা।

আমার এ মর্ম্মব্যথা বাজে কি
তোমার প্রাণে,
হে মোর বন্ধু হে!
আমার করুণ গাথা, লাগে কি
নয়নে তব,
হে কৃপাসিন্ধু হে।
পশে কি তোমার শ্রবণে হে নাথ।
আমার কাতর বাণী।
আমায় শ্রবণে, পশে না তো তব
অভয় অমর বাণী॥
সারা দিনমান তব এ ভবনে
খেলাতে মত্ত তোমাকে চাহিনে
নমিনি কখন যুগল চরণে—
ভাবিনি তোমাকে কভু,
কবে যে হঠাৎ নিকটে আসিলে,
কবে যে হৃদয় পরশিয়া গেলে,
কখন গোপনে আমায় জাগালে,—
মনে ত' পড়ে না প্রভু।
নবীন আলোক ফুটিল উষার,
সচকিত আঁখি চাহে পানে কার,
কারে নাহি হেরি বহে অশ্রুধার,—
যুগল নয়ন-কোণে।
রাত্রি তখনো প্রভাত হয়নি,
তখন সকল বিহগ জাগেনি;
কুসুম তখন সবটি ফোটেনি—
নিবিড় কুঞ্জবনে॥
হেরিয়া কাহারে হইনু মুগ্ধ,
চিনিলাম না তো তারে।
কে আমার প্রাণ, করিল চেতন,
মধুর বাঁশরী সুরে!
হে মোর বন্ধু তুমি।
তোমার পরশ জাগাল কি মোর
ঘুমের ঘোরে।—
বুঝিনি তখনো আমি॥
তোমার পরশে আছিল এ প্রাণ,
কবে হাহাকার নিশা দিনমান;
কে কোথায় আছ, করুণানিদান,—
টানিয়া লহগো তারে।
অযোগ্যতা হতে মূর্খতা হ'তে,
শোক, ভয়, দুঃখ, দৈন্য, হইতে;
তোমার অশোক অভয় জ্ঞানেতে,—
ডুবায়ে লওগো মোরে।
তুমি যে আমার নিকটেই আছ—
অন্তর মাঝে।
হে মোর বন্ধু হে।
তোমার বাহুর বাঁধন-বেদন;
হৃদয়ে বাজে—
জানাও তা মোরে হে!

হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীব ও ব্রহ্মের অভেদ।

অতঃপর আমরা জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদ আলোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদের উপসংহার করিব। শ্রুতির পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। ব্রহ্ম যেমন সৎ, চিৎ, আনন্দ-স্বরূপ এবং নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, জীবও তেমনি সৎ, চিৎ আনন্দময় এবং নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও মাহেশ্বরী মায়ার প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া থাকে; এবং নিজে অনন্ত আনন্দের আকর হইয়াও সামান্য সাংসারিক আনন্দ-বিন্দু লাভ-লালসায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। স্বয়ং নিত্য নির্ম্মুক্ত থাকিয়াও অজ্ঞানবশে আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তির প্রত্যাশায় পরের দ্বারস্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবের বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই বন্ধ-মোক্ষ ব্যবহার কাল্পনিক মাত্র। অবিদ্যা-বশবর্ত্তী জীব অন্নময় প্রাণময়, মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চবিধ কোষ দ্বারা আবৃত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধিতে বঞ্চিত থাকে অধিকন্তু সেই পঞ্চবিধ কোষকেই আপনার স্বরূপ বা অভিন্ন পদার্থ মনে করিয়া তাহাদেরই অবস্থা বিশেষ দ্বারা আপনাকে সুখী দুঃখী ও বদ্ধ বিবেচনা করিয়া কাতর হইয়া থাকে। বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন—

'মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহনশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥
ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥" (গৌড়পাদ)

অদ্বৈত মতে বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের নাম জীব কিন্তু জীব আভাস হইলেও অণু নহে—মহান্। দর্পণের কম্পনে যেমন তৎ প্রতিফলিত মুখাদিরও কম্পন অনুভূত হয়, তেমনি বুদ্ধিনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মগুলিও জীবে আরোপিত হয়। দর্পণাপসারণে যেমন প্রতিবিম্বিত মুখখানির আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না,—প্রকৃত মুখাকারে পরিণত হয়, তেমনি বুদ্ধি-দর্পণের অপগমেও জীবের আর জীবত্ব থাকে না, মায়া-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মভাব পরিস্ফুরিত হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদের অভিমত প্রকৃত মুক্তি। এইরূপ মুক্তি লাভ

করিতে হইলে, অগ্রে ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের আবশ্যক হয়। রজ্জুর রজ্জুত্ব প্রত্যক্ষ না হইলে, যেমন শত চেষ্টায়ও সম্মুখস্থ ভ্রান্ত সর্প পলায়ন করেনা, তেমনি জীবের যতদিন অজ্ঞানাধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার না হইবে, ততদিন কিছুতেই অজ্ঞান-কল্পিত জীবভাব অপনীত হইবে না। এইজন্য শঙ্কর বলিয়াছেন— জ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, কর্ম্মাদি উপায়গুলি কেবল তাহার সাহায্য করে মাত্র।

জ্ঞান লাভের প্রধান উপায় তিনটী,—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শ্রবণ, তদ্বিষয়ে মনন এবং তদর্থ নিদিধ্যাসন। আত্মতত্ত্ব শ্রবণের জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিকে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, মনন বা উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা গুরূপদিষ্ট বিষয়ে সমুৎপন্ন সংসার-জাল ছিন্ন করিতে হয়। উপদিষ্ট বিষয় নিঃসন্দিগ্ধ ও মনঃপ্রিয় হইলে সহজে তদ্বিষয়ে অনুধ্যানের প্রবৃত্তি হয়। নিরন্তর নিদিধ্যাসনের ফলে বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই করামলকবৎ প্রতিভাত হয়। সুবর্ণ সহযোগে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শীসক যেমন সুবর্ণ মল বিধ্বস্ত করিয়া, সুবর্ণকে বিমল বিশুদ্ধ করিয়া আপনি বিনষ্ট হইয়া যায় তেমনি উপরোক্ত নিদিধ্যাসনরূপ বুদ্ধিবৃত্তিও জীবের অজ্ঞানাবরণ অপনীত করিয়া ব্রহ্মভাব উন্মেষিত করিয়া দেয়, জীব তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যার্থ প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। পূজ্যপাদ গোড়পাদ বলিয়াছেন,—

'অনাদিমায়য়াসুপ্তো যদা জীবং প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥"

অনাদিকাল হইতে মায়ানিদ্রায় অভিভূত জীব একবার প্রবোধিত হইলে, আপনি আপনার অদ্বৈত স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে থাকে। তখন আর ঔপাধিক দুঃখে অভিভূত হয় না। সুবর্ণ সহযোগে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত শীসক যেমন সুবর্ণ মল বিনষ্ট করিয়া, সুবর্ণকে প্রকৃত সুবর্ণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনি বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মাকারাকারির বুদ্ধিবৃত্তিও তখন আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া জীবের অব্রহ্ম ভাব অপনীত করিয়া নিজে বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন ঘটভঙ্গে ঘটাকাশের ন্যায় বুদ্ধিরূপ উপাধিনাশে জীবও ব্রহ্মাকাশে মিশিয়া যায়। স্বভাব-বিমুক্ত জীবও বিমুক্তি লাভ করে; অশেষ শোক-তাপ সঙ্কুল অনর্থময় সংসারে আর ফিরিয়া আইসে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ন স পুনরাবর্ত্ততে, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।" ইহাই শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত।

অতঃপর আচার্য্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ।

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানময় কর্কশ কশাঘাতে বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধবিপ্লব বিদূরিত হইল সত্য, কিন্তু তাহাতেও ভক্ত ভাবুকের প্রাণ শীতল হইল না; তখনও ভক্তের হৃদয়-রত্ন, ভাবুকের কণ্ঠহার, প্রেমিকের প্রীতি-নিকেতন বিমল ভক্তিমার্গ অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিহিত ছিল। তখনও বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক-মালা ভক্ত ভাবুকের হৃদয়-কন্দর সমুদ্ভাসিত করিতে পারে নাই। এমন সময়ে ভক্তের বাঞ্ছা কল্পতরু ভগবানের অমোঘ প্রেরণাবশেই চির-পিপাসু জীবগণকে বিমল ভক্তিরস বিতরণের নিমিত্ত, ভক্ত শ্রেষ্ঠ ভাবুক চূড়ামণি আচার্য্য রামানুজ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি সাক্ষাৎ অনন্তদেবের অবতার। সম্ভবতঃ ৯৩০ শকাব্দে কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাতে রামানুজাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন, শঙ্করের ন্যায় রামানুজের বাল্যজীবনও অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক—বৈচিত্র্যময়। তিনি যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন; কিন্তু তিনি নামতঃ যাদবপ্রকাশ পণ্ডিতের শিষ্য হইলেও কার্য্যতঃ কাঞ্চীপূর্ণ নামক অপর একজন ভক্তের অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন, কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের শৈশব-সুলভ কোমলতাময় হৃদয় ক্ষেত্রে যে পবিত্র ভক্তি-বীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে তাহাই মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়া শত শত নরনারীর সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির শীতল ছায়া বিতরণ করিয়াছিল।

রামানুজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, জ্ঞানগুরু শঙ্কর বিশুদ্ধ 'অদ্বৈতবাদ' প্রচার দেশে বৈদিক ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেও তাহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে না। বিশেষতঃ যাহারা ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ, তাহাদের পক্ষে ত' এ পথ অতীব দুর্গম এবং নিতান্ত অনুপাদেয়। তাই তিনি আলো ও অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী উষারুণের ন্যায় দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী একটি বিচিত্র পথ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই পথের নাম 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'।

অনেকের ধারণা যে, আচার্য্য রামানুজই এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক ও ব্যবস্থাপক; বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের সে ধারণা ভিত্তিহীন। রামানুজের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে ঐ মতের পরিপোষক বহুতর কথা রহিয়াছে। ভগবান্ বোধায়ন ঋষি বহু পূর্ব্বে এই

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের উপর এক বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ কথা স্বয়ং রামানুজও স্বকৃত 'শ্রীভাষ্যের' প্রারম্ভে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সেই ব্যাখ্যাবলম্বনেই 'শ্রীভাষ্য' রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সে কথা বলিতেও কিঞ্চিন্মাত্র সংঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাহার পর, টঙ্ক, গুহদেব ও দ্রবিড় প্রভৃতি আচার্য্যগণও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপর অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামানুজ স্বীয় ভাষ্য মধ্যে তাহাদের কথা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া আপনার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন অধিকন্তু কি রামানুজের পরম গুরু, (গুরুর গুরু); যামুন মুনিও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূলে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তৎকৃত 'সিদ্ধিত্রয়' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এখনও প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে যে, রামানুজ সেই যামুন মুনির ইঙ্গিতানুসারেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, আচার্য্য শঙ্কর প্রধানতঃ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সমালোচনা পূর্ব্বক তাহাদের সিদ্ধান্ত সমূহ একে একে খণ্ডন করিয়াছিলেন কিন্তু রামানুজকে সেরূপ কোনও বাহ্যশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তিনি আপনাদের মধ্যেই বিচার-মল্লতার প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ খণ্ডনেই অধিকাংশ শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন। এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

শঙ্কর বলিয়াছেন ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ এক অদ্বিতীয় ও নির্ব্বিশেষ। রামানুজ বলিলেন,—ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় সত্য, কিন্তু নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র স্বরূপ নহে। ব্রহ্ম সবিশেষ; আনন্দ ও চৈতন্যাদিই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্গুণ; রামানুজ বলিলেন—ব্রহ্ম নির্গুণ নহে—সগুণ; তিনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি উৎকৃষ্ট গুণনিচয়ের আকর। শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব মাত্র; রামানুজ বলিলেন—জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মেরই অংশ মাত্র। শঙ্কর বলিয়াছেন—জ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। রামানুজ বলিলেন,—না, এ কথা সত্য নহে; ভক্তিলব্ধ ভগবৎ-প্রসাদার্থ মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়; জ্ঞান তাহার সহায় মাত্র। শঙ্কর বলিয়াছেন—জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই মুক্তি। রামানুজ বলিলেন,—না, ক্ষুদ্র অণুস্বরূপ জীব কখনই বিভু

ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ-লাভের চিন্তাও করিতে পারে না ; তাহাতে তাহার অপরাধ হয়। শঙ্কর বলিয়াছেন,—এই জগৎ রজ্জুসর্পবৎ ব্রহ্ম বিবর্ত্তমাত্র ; রামানুজ বলিলেন,—না এই জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং জগৎ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। ইত্যাদি কতিপয় বিষয় লইয়া রামানুচার্য্য শঙ্করের মত খণ্ডনে যত্নপর হইয়াছেন।

'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নাম হইতেই আমরা রামানুজের অভিমত সিদ্ধান্তের কতকটা আভাস পাইতে পারি। 'বিশিষ্টদ্বৈতবাদ' কথাটি তিনটি শব্দের সমবায়ে রচিত হইয়াছে (১) 'বিশিষ্ট', (২) 'অদ্বৈত' (৩) বাদ। বিশিষ্ট অর্থ—স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বিশিষ্ট। 'অদ্বৈত' অর্থ—দ্বৈতের (ভেদের) অভাব—একত্ব। 'বাদ' অর্থ 'তত্ত্ব' নির্ণয়ানুকূল বিচার বা সিদ্ধান্ত। সুতরাং ইহার সম্মিলিত অর্থ—স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন সমন্বিত ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব বা একত্বনির্ণায়ক সিদ্ধান্ত।

অভিপ্রায় এই যে, পরব্রহ্ম পরম পুরুষ নারায়ণ, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, কোন কালেই চেতনাচেতনময় নিখিল পদার্থ বিরহিত হন না ; পরন্তু তদ্বিশিষ্টই থাকেন, অথচ তাহা দ্বারাও তাঁহার অদ্বিতীয় ভাব বিনষ্ট হয় না। বিবিধ শাখা-প্রশাখাদি সমন্বিত বৃক্ষ ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ও ফল পত্রাদি অবয়ব সমূহ আকৃতি প্রকৃতিতে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও যেমন তাহাদের সমষ্টিভূত অবয়বী বৃক্ষ কখনও ভিন্ন হয় না—একই থাকে, তেমনি ব্রহ্মের চেতনাচেতন অংশগুলি পরস্পর পৃথক্ হইলেও তৎসমষ্টিভূত অংশী ব্রহ্ম কখনও ভিন্ন বা দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হন না, তিনি এক অদ্বিতীয়ই থাকেন। চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগৎই তাঁহার শরীর, তিনি সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা শরীরী—'আত্মা'। শরীর দ্বারা যেমন শরীরীর ভেদ সিদ্ধ হয় না, তেমনি শরীর স্থানীয় চেতনাচেতনাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ দ্বারাও তাঁহার অদ্বৈত তত্ত্বের হানি হয় না। রামানুজ বলিয়াছেন—"তদানীং সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বেন বিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্।" এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে বলিয়াই রামানুজের মতকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিৎ, ও ঈশ্বর।

"ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥

অর্থাৎ পদার্থ তিনপ্রকার— (১) চিৎ, (২) অচিৎ, (৩) ঈশ্বর। এতদতিরিক্ত

কোন পদার্থ বা তত্ত্ব নাই, সমস্তই এই তিনের অন্তর্ভূত। জীবসমূহ চিৎ, দৃশ্য জড়বর্গ অচিৎ, আর পুরুষোত্তম নারায়ণ ঈশ্বর। এক হরিই এই চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে চিৎ জীবসমূহ ভোক্তা, অচিৎ জড় পদার্থ-সমূহ জীবের ভোগ্য, ঈশ্বর সকলের নিয়ামক এবং অন্তর্যামী। উক্ত তত্ত্বত্রয়ের মধ্যে ঈশ্বরই প্রধান তত্ত্ব; পরপুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তমই সেই ঈশ্বর পদবাচ্য ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ নহে, সবিশেষ সগুণ, সচ্চিদানন্দময়; কখনই নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। আনন্দ ও চৈতন্যই তাঁহার সবিশেষ ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। তিনি এক ও অসীম এবং কল্যাণময়, নিখিল গুণগণের আকর ও প্রাকৃত সত্ত্বাদি হেয়গুণ বিবর্জ্জিত পরম কল্যাণময়। মুনিগণও তাঁহার গুণের পরিগণনা করিয়া অন্ত পান না। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কল্যাণময় গুণগণেরও প্রতিষেধ করেন নাই। পুরাণ শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতাগুণাঃ।
সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যোহ্যসৌ স্মৃতঃ।
নহি তস্য গুণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈর্মুনিগণৈরপি।
বক্তুং শক্যা বিযুক্তস্য সত্ত্বাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ॥

অন্যত্র কথিত আছে যে—বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥

নিখিল কল্যাণগুণময় ভগবান্ বাসুদেবই পরব্রহ্ম তিনিই জীব নিবহের নিয়ামক, অন্তর্য্যামী ও মুক্তিদাতা; এবং এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিও সেই ভগবান্ বাসুদেবকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মের দুইটি অবস্থা—(১) কার্য্যাবস্থা ও (২) কারণাবস্থা। যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্ম চেতনাচেতনময় জগৎ তাঁহা হইতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন নামরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাতেই অবস্থান করে, তাহা তাঁহার কার্য্যাবস্থা; তখনই তাঁহার দ্বৈতভাব সংঘটিত হয়। আর যখন কল্পান্তকালে স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎ সংহার পূর্ব্বক আপনাতে রক্ষা করেন, তাহাই তাঁহার কারণাবস্থা। এই কারণাবস্থ ব্রহ্মকেই শ্রুতিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ

ব্রহ্মকে জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ এবং নির্গুণ নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্বীকার করেন, রামানুজ সেরূপ স্বীকারে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, গুণমাত্র। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানবান্ ও আনন্দবান্ বলিয়া ব্রহ্মের উল্লেখ রহিয়াছে; আর "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কাম কর্ম্মাদির ন্যায় তাঁহার গন্ধরসাদি গুণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মের নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ভাব অনুমোদন যোগ্য নহে।

রামানুজের মতে জীব সমূহ চেতন, কর্ম্মফলভোক্তা এবং অনন্ত অর্থাৎ প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্। দীপ্যমান অগ্নি হইতে যেরূপ শত সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে অনন্ত জীব নির্গত হইয়াছে। উহারা ব্রহ্মেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। জীব ব্রহ্মাংশ হইলে ও ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইলেও, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অত্যন্ত হীন। তাহার এই ন্যূনতা ও বিভাগ কস্মিন্ কালেও অপনীত হইবে না; চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি ও পরিমাণ সমস্তই তাহার অল্প। জীব মাত্রেই কর্ম্ম-পরবশ, কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করে, আবার কর্ম্মশেষে চলিয়া যায়। কর্ম্মের মধ্যে ভগবদুপাসনাই তাহার প্রধান কর্ম্ম; উপাসনা অর্থে শুষ্ক জ্ঞান নহে,—ভগবানে দৃঢ় ভক্তি। তৈল-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবর্ত্তিত ভগবানের অনুধ্যানই ভক্তির চরমাবস্থা। তাদৃশ ভক্তিযোগ দ্বারা লব্ধ ভগবৎ প্রসন্নতাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়; কিন্তু ক্ষুদ্র ও ভৃত্য ভাবাপন্ন জীব কখনও জগৎপ্রভু পরমেশ্বরকে অহংভাবে অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' ভাবে চিন্তা করিতে পারে না; করিলে অত্যন্ত অপরাধী হয়। তাহার ফল পরমানন্দময় মুক্তি নহে,—দুঃসহ দুঃখ যাতনা ভোগ। অতএব জীব কখনও নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে না। জীব মুক্তাবস্থায় যতই সমুন্নত হউক না কেন, কিছুতেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইবে না। তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকিয়া নানা ভাবে পরমানন্দ উপভোগ করিবে মাত্র। ইহাই জীবের প্রকৃত শান্তির অবস্থা। উপাসনা পরিতুষ্ট ভগবান্ই জীবে সেই পরমানন্দ প্রদান করেন; তাহা পাইলে জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না,

"বাসুদেবোঽপি স্বংভক্তং সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি॥

অর্থাৎ বাসুদেবও আপনার ভক্তকে পাইয়া পুনরাবৃত্তিরহিত অক্ষয় আনন্দময়

নিজের স্থান প্রদান করেন। জীব তখন সংসারের সমস্ত শোক তাপ অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ উপভোগে কৃতার্থ হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন; তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

অর্থ]

বসন্তে কাতরা।

১।— ঘুচিল শীতের ক্লেশ, বসন্তের সমাবেশ,
শুকা'ল শিশির জল, রাঙ্গা মুকুতার ফল;
আর না হেরিগো সখি? তুষারে আঁধার ধরা,—
আর নাই "টুব্ টাব্, থেমেছে "নেহার, পড়া॥

২।- রাঙ্গা অশোকের গুচ্ছ, হাসিছে দোলায়ে পুচ্ছ,
বকুল আকুল হ'য়ে, ঝরিছে প্রভাতি বা'য়ে;
উষার লোহিত বাগে, পাতার আড়াল থেকে,—
না জানি পঞ্চমে পিক্, কি সুখে উঠিল ডেকে॥

৩।— 'শলিমুখ গুঞ্জরিছে, কি সুখে ময়রী নাচে
নগ্ন শুষ্ক তরুগণ, মুঞ্জরিল অগণন;
ধিক্ তোরে হে বসন্ত! এখন পড়েনি বাজ্।
বন হ'ল বৃন্দাবন আর কেন হেন সাজ?

৪।— 'কাল" কালিন্দির কুলে পোড়া অশোকের মুলে
সন্ধ্যেবেশে জল-আনা, ফুরায়েছে আনাগোণা;
কি সুখে বলনা সখি হাসিছে বসন্তে ধরা —
কি সুখে হাসিছে বিশ্ব, করিয়ে পাগল পারা॥

৫।— পথ চাওয়া সার হ'ল, সে ত' ফি'র নাহি এল,
সখি! তোর কথা শুনি, হারায়েছি গুণমণি;
যদি নাহি করিতাম, সেই "পোড়া" অভিমান?
বারেক মনেতে হ'লে, দুঃখেতে ফাটয়ে প্রাণ!

৬।— পুনঃ এল' হোবি খেলা, মধুর বাসন্তী লীলা,
এল পুনঃ বাসন্তীর, গন্ধবহ সুসমীর,
সব ফিরে এল শুধু, পিয়া ত' এলনা সখি।
বলনা বলনা মো'রে, কেমনে বাঁচিয়ে থাকি॥

৭।— সে যে সব ভুলে গেছে, আর কিলো মনে আছে,
ফাগুণে ফাগুর খেলা, সে মধুর "দোললীলা"
আবির "লইয়া কালা" শুদ্ধ হ'ত কামবারি।
সব ফিরে এল শুধু! নাই সেই বংশীধারী॥

৮।— হায় সখি! ছার এ প্রাণে, ধৈরয আর নহি মানে,
আর কেন মিছে আশে, তাঁর জন্য থাকি বসে;
যদি আসে, পীতবাসে, হেরিব না চক্ষু মেলি।
বাবং না মুছাইবে সে পীত নিচোল খুলি॥

শ্রীসারদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্থ]

জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি।

বেদাদি শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাদির কাল নিরূপণ করাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন। এজন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বেদের অঙ্গ বলে। "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত উদিতে জুহোতি" ইত্যাদি বিধিবাক্যস্থ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সূর্য্যোদয় প্রভৃতি কাল জ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্র সাপেক্ষ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণের মধ্যে (প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি ভবন্তি) শব্দ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা যাগাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায় না। এজন্য যাগাদি কর্ম্ম বিধি বোধিত, (অজ্ঞাতার্থ জ্ঞাপকত্বে ভাগোবিধিঃ) কিন্তু দর্শাদি কাল প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে; এজন্য উহা যজ্ঞের অঙ্গ। স্মৃতি নিবন্ধকার মহামতি রঘুনন্দন 'তিথিতত্ত্বে' লিখিয়াছেন,--

কর্ম্ম সন্নিহিতং নৈব বুদ্ধৌ বিপরিবর্ত্ততে।
শব্দাত্তু তদুপস্থানমুপাদেয়ে গুণো ভবেৎ॥

প্রমাণান্তরা সন্নিহিতং কর্ম্ম বুদ্ধৌ প্রথমং ন বিষয়া ভবতি। প্রাথমিক শব্দা দেবতার্থ কর্ম্মণ উপস্থিতিরিতি উপাদেয়ে বিধেয়ে কর্ম্মণি পূজাদৌ চন্দ্রাদি ক্রিয়াত্বেন তদবচ্ছিন্ন কালত্বেন বা শুচি তৎকাল জীবিনঃ কর্ম্মাধিকারাৎ তস্মিন্ প্রমাণান্তর লভ্যত্বে না বিধেয়ত্বাৎ তিথ্যাদিগুণ ইতি।

এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের (যুক্তির) উপরেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। বেধাদি (অবজারভেসন্) দ্বারা গ্রহগণের গতি প্রভৃতি নির্ণয় জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ নলিকাদি নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতেন এবং এইজন্যই কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে মান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও যুক্তির

উপরে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি পতিষ্ঠিত জন্যই পুরাণাদি শাস্ত্র বর্ণিত গ্রহগণের বিবরণ। যেগুলি যুক্তি ও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকারগণ নিঃসঙ্কোচে যুক্তি প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋষিতুল্য ভক্তি-ভাজন মহাত্মা লল্লাচার্য্য স্বপ্রণীত শিষ্যধী-বৃদ্ধি নামক সিদ্ধান্ত গ্রন্থে মিথ্যা-জ্ঞানাধ্যায় নামক অধ্যায়ে পুরাণাদি বর্ণিত বহু মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থ হইতে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

সংস্থানমশেষমীরিতং ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তিনামিদং।
প্রতিবাদি বচাংসি শৃণ্বতো মনসি ভ্রান্তিরিবাবতিষ্ঠতে॥
যত এব মতঃ কুহেতুমদ্ বচনানি প্রথমং ব্রবীম্যহম্।
উপপত্তি সদাগমং ততো মনসঃ স্থৈর্য্য করং পরিস্ফুটম্॥
অসুরামর বাসরং ক্রমাদয়নং দক্ষিণমুত্তরং জগুঃ।
হিমদীধিতি তগ্মতেজসোর্গ্রহণং রাহুকৃতং তথাপরে॥
উপরীন্দুমধো দিবাকরং তমসা মেরু ভুবো বিভাবরীং।
প্রতিবাসরমিন্দু মণ্ডলং বিবুধৈঃ পীয়ত ইত্যতঃ কৃশম্।
ককুভশ্চ সুমেরু ভূভতো যগলং চন্দ্রমসোস্তথার্কয়োঃ।
পিতৃ বাসরমাদিতোঽসিতং সিতপক্ষঞ্চ বদন্তি শর্ব্বরীম॥
অমৃতামবনীং প্রচক্ষতে সুষমাং কেচন দর্পণোপমাং।
অপরে বহু যোজনামিমাং সলিলস্থামথ যান পাত্রবৎ॥
কমঠাহি বরাহ দিগ্গজৈঃ কুলশৈলৈর্বিধৃতামথাপরে।
জগুরদ্রিমুপৈতি যাত্যধো রথচক্র ভ্রমবদ্ ভ্রমত্যপি॥

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডোদর বর্ত্তি গ্রহ পৃথিবী প্রভৃতির সংস্থান বিষয়ে পুরাণাদিতে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে মনে ভ্রান্তি জন্মে। অতএব সেই সকল যুক্তি বিরুদ্ধ বাক্যও কি প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডনাদির জন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। উত্তরায়ণ দেবতাগণের দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি, রাহু নামক অসুর চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে। সূর্য্য মণ্ডলের বহু উপরে চন্দ্র মণ্ডল অবস্থিত, মেরু পর্ব্বত অন্তরালে সূর্য্য গমন করিলে রাত্রি হয়, কৃষ্ণপক্ষে প্রতি-দিন দেবতাগণ চন্দ্রের এক এক কলা পান করেন; এজন্য চন্দ্র ক্রমশঃ কৃশ হইয়া থাকে এবং শুক্ল পক্ষে দেবতাগণ পীত চন্দ্রকলা উদ্গীরণ করেন; এজন্য চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়। দুই চন্দ্র ও দুই সূর্য্য; কারণ বিপুলায়তন পৃথিবীকে একটী একটী চন্দ্র ও সূর্য্য একদিনে পরিভ্রমণ করিতে পারে না।

কৃষ্ণপক্ষ পিতৃলোকদিগের দিন ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। কেহ বলেন পৃথিবী অপরিমেয়া, কেহ বলেন দর্পণের ন্যায় সমতল, কেহ বলেন সলিলস্থ যান পাত্রবৎ জলের উপর ভাসমান। কচ্ছপ সর্প, বরাহ ও দিগ্‌গজ সকল পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে; কেহ বলেন পৃথিবী সর্ব্বদাই উর্দ্ধে অথবা নীচে পড়িয়া যাইতেছে। নল্লাচার্য্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত-গৌরব মহামতি ভাস্করাচার্য্য ও সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এই সকল যুক্তি-বিরুদ্ধ পৌরাণিক বাক্যগুলি খণ্ডন করিয়াছেন; তাহার কতিপয়মাত্র যুক্তি উল্লিখিত হইতেছে। পৃথিবীর যদি আধার কল্পনা করা যায়, তাহারও অন্য আধার কল্পনা করিতে হইবে। তাহার ও অন্য আধার এইরূপ করিলে অনবস্থা দোষ হইয়া থাকে এবং এইরূপ করিলে নক্ষত্রপুঞ্জের ভ্রমণ হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, শেষের আধার নিজ শক্তিতেই শূন্যে অবস্থান করিতেছে; তবে পৃথিবীরই সেই শক্তি স্বীকার করা উচিত। বিশেষতঃ আকাশস্থ গুরু বস্তু পৃথিবীতে পতিত হওয়ায় পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে জানা যাইতেছে। এইজন্যই পৃথিবী চতুর্দ্দিকস্থ গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতিকে সমান বেগে আকর্ষণ করিয়া শূন্যে অবস্থান করিতে পারে। ভাস্করের উক্তি এই ;—

মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ ধরিত্র্যাস্ততোঽন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽপ্যেবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিং নো ভূমেঃ সাষ্ট মূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ
আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যঃ খস্থং গুরুস্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং মে॥

চন্দ্র গ্রহণে চন্দ্রের পূর্ব্বদিক হইতে স্পর্শ ও সূর্য্য গ্রহণে সূর্য্যের পশ্চিম দিক্ হইতে স্পর্শারম্ভ হয়। দেশান্তর কাল তুল্য পূর্ব্বে বা পরে চন্দ্র গ্রহণ সর্ব্ব দেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু সূর্য্যগ্রহণ সর্ব্বদেশে দৃষ্ট হয় না। অর্দ্ধ গ্রস্থ সূর্য্যের শৃঙ্গদ্বয় তীক্ষ্ণ হয় ও সূর্য্য গ্রহণ অল্পকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। এই দিক্, দেশ, কাল ও আবরণ প্রভৃতির ভেদ হওয়ায়, চন্দ্র ও সূর্য্যের ছাদক এক নহে; ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন ছাদক আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

ছাদকঃ পৃথুতরস্ততো বিধোরদ্ধ খণ্ডিত তনোর্বিষাণয়োঃ।
কুণ্ঠতা চ মহতী স্থিতির্যতো লক্ষ্যতে হরিণ লক্ষ্মণ গ্রহে॥
অর্দ্ধ খণ্ডিত তনোর্বিষাণয়োস্তীক্ষ্ণতা ভবতি তীক্ষ্ণদীধিতেঃ।
স্যাৎ স্থিতি লঘুরতো লঘুঃ পৃথক্ ছাদকো দিন কৃতোঽবগম্যতে॥
দিগ্‌দেশকালাবরণাদি ভেদান্নচ্ছাদকো রাহুরিতি ব্রুবন্তি। (জ্যোতির্ব্বিদঃ)

গ্রহণের কারণ সূর্য্য সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায় চন্দ্র গ্রহণ এবং পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র আসিলে চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য আচ্ছন্ন হওয়ায় সূর্য্য গ্রহণ হইয়া থাকে।

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থাদ্ ঘনবদ্ ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশত্যস্য ভবেদসৌ॥

এইরূপ জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকারগণ পুরাণাদি বর্ণিত জ্যোতিষিক বিবরণ যুক্তি-বিরুদ্ধ হইলে, তাহা নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সবগুলি উল্লিখিত হইল না। প্রত্যক্ষ ও যুক্তির উপর জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন যেরূপ গণনায় গ্রহগণ প্রত্যক্ষীভূত হন, সেইরূপ ভাবেই গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন। প্রত্যক্ষের সহিত গণনার মিল হইলে তাহাকে দৃক্ তুল্য গ্রহ বা দৃগ্ গণিতৈক্য বলিতেন। সূর্য্য সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে,—

তদ্দগতি বশান্নিত্যং যথা দৃক্‌তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রযান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ।

ভাস্করাচার্য্য ও সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এইরূপই বলিয়াছেন। যথা :—

যাত্রা বিবাহোৎসব জাতকাদৌ খেটৈঃ স্ফুটৈরেব ফলস্ফুটত্বম্।
স্যাৎ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাং স্ফুটক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্য কৃদ্ যা॥

যে গ্রন্থানুসারে গণনা করিলে গ্রহগণ প্রত্যক্ষ হন না, সে গ্রন্থ অগ্রাহ্য। এই জন্যই শাকল্য মুনি বলিয়াছেন,—

কিং তেনাপি সুবর্ণেন কর্ণঘাতং করোতি যৎ।
তথা কিং তেন শাস্ত্রেন যন্ন প্রত্যক্ষতঃ স্ফুটং॥

বরাহ-মিহির পঞ্চ সিদ্ধান্তকার লিখিয়াছেন—পৌলিশকৃত সিদ্ধান্তের তিথি স্ফুট, অর্থাৎ বিশুদ্ধ (Accurate); রোমক সিদ্ধান্তের তিথি স্ফুটাসন্ন (প্রায় বিশুদ্ধ) সূর্য্য সিদ্ধান্তের তিথি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তের তিথি অতি অশুদ্ধ।

পৌলিশতিথিঃ স্ফুটোঽসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকঃ প্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরং সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূর বিভ্রষ্টৌ॥

ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের গণনার সহিত বেধের অনৈক্য হওয়ায় ব্রহ্মগুপ্ত তাহার সংস্কার দ্বারা এক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মোক্তং গ্রহ গণিতং মহতা কালেন যৎ খিলীভূতং।
অভিধীয়তে স্ফুটং তজ্ জিষ্ণুসুত ব্রহ্মগুপ্তেন॥

এইরূপে পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত গ্রন্থানুসারে গণনায় গ্রহগণ প্রত্যক্ষীভূত না হইলে, জ্যোতির্ব্বিদগণ নূতন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেন। অথবা বীজ সংস্কার দ্বারা সেই গ্রন্থকেই শুদ্ধ করিয়া লইতেন। নৃসিংহ দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন ;—"অতএব আর্য্যভট ব্রহ্মগুপ্তাদিভিঃ স্ব স্ব কালে অন্তরম্ উপলভ্য মুনিকৃত গ্রন্থেষু নিক্ষিপ্য গ্রন্থা রচিতাঃ"। সিদ্ধান্ত শিরোমণির মরীচি নামক প্রসিদ্ধ টীকাকার মুনীশ্বর দৈবজ্ঞ

লিখিয়াছেন.—"স্ব কালে যৎ সংস্কারেণ গণিতাগতো গ্রহ আকাশে প্রমাণী স্বতোভবতি তদ্ বীজম্।"

বীজ সংস্কার দ্বারা যে গ্রন্থ শুদ্ধ করা হইয়াছে, সেই গ্রন্থানুসারে তিথ্যাদি নির্ণয় করিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে ; —সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি যন্ত্রেভ্যঃ।

তৎ সংস্কৃত গ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ॥

বশিষ্টও বলিয়াছেন —যস্মিন্ পক্ষে যত্রকালে যেন দৃক্‌গণিতৈক্যকম্।

দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাৎ তিথ্যাদি নির্ণয়ম্॥

এই বচনে পক্ষ শব্দের অর্থ গ্রন্থ। শাব্দ প্রমাণস্থলে মনুর সহিত অন্য সংহিতাকারগণের মতভেদ হইলে মনুর প্রমাণই গ্রাহ্য হয়।

বেদার্থোপ নিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং।

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রকাশ্যতে।

কিন্তু যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থলে সেরূপ নহে। সে স্থলে যাহা যুক্তিযুক্ত তাহাই গ্রাহ্য। এইজন্যই বিষ্ণু বলিয়াছেন ;—

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।

যুক্তিহীনং ন গৃহ্ণীয়াদপ্যুক্তং পদ্মযোনিনা।

প্রত্যক্ষ ও যুক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল ভিত্তি জন্যই প্রাচীন সিদ্ধান্তকারগণ যবনাদি প্রণীত গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া তদনুসারে ধর্ম্ম কার্য্যোপযোগী তিথ্যাদি গণনা করিতেন। মহারাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ জগন্নাথ আরবীভাষার 'মজাস্তী' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ সিদ্ধান্ত সম্রাজ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; ঐ গ্রন্থানুসারে বহুকাল রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে পঞ্জিকার গণনা হইত। জগন্নাথ বলিয়াছেন,—

গ্রন্থং সিদ্ধান্ত সম্রাজং সম্রাট্ রচয়তি স্ফুটম্।

তুষ্টৈ শ্রীজয়সিংহস্য জগন্নাথাহ্বয়ঃ কৃতী॥

অরবী ভাষয়াগ্রন্থো মিজাস্তী নামকঃ স্থিতঃ।

গণকানাং সুবোধায় গীর্ব্বাণ্যা প্রকটীকৃতঃ॥

এই সম্রাট সিদ্ধান্তেরই সার গ্রহণ করিয়া উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ৺মহামাহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সামন্ত সিদ্ধান্ত-দর্পণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হইতে গণিত পঞ্জিকাই উড়িষ্যার সর্ব্বত্র প্রচলিত। এইজন্যই মহামহোপাধ্যায় বাপুদেবশাস্ত্রী সি, আই, ই প্রমুখ মহোদয়গণ বর্ত্তমান কালীন ইউরোপীয় গণিতশাস্ত্রের সারগ্রহণ করিয়া পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, প্রত্যক্ষ ও যুক্তির উপরই গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ।

BENGAL LIBRARY

পাত্র—



পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২১। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মোক্ষ]

অভিসারিকা।

শ্যাম'ক প্রেম যাবক-রসে,
রঞ্জিত লহু চরণ পরশে,
কুসুমায় বন-বীথিকা,
নিন্দি' মরাল-গমন রুচির,
মুখরয়ি' মৃদু মণি মঞ্জীর,
ডারি' স্বপন দীরঘ দিঠির—
চল অব অভিসারিকা।
শুনহ সজনি! শ্রুতি-রঞ্জন,
গাওত তুয়া বঁধু-বন্দন,
শিখি পিক শুক সারিকা।
শুন গরবিনি! কুঞ্জ-পবন,
মুরলী-সন করয়ি বহন,
কীরত তুয়া নাম-কীর্ত্তন
কলিত মধুর গীতিকা।

পেখ——তুঝকি গমন-লাগ',
পল্লব-করে করি' সোহাগ,
ঠারই তরু-বল্লরী ;
চললো সজনি ! না কর ব্যাজ,
তোড় মান, ছোড় লাজ,
নাহ-পিরিতি সিন্ধু মাঝ—
গাহন কর সুন্দরি !
দুরু দুরু গুরু হৃদ-কম্পন,
স্বেদ, পুলক, অশ্রু-পতন,
শ্রুতি-কুণ্ডল-দোলরি,
থর থর উর লোল হার,
কান্তু-দরশ-পরশ সার,
সূচই ভাবি সুখ তুহার,—
ভুজঙ্গধর বোলরি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়-চৌধুরী।

শ্যামক...শ্যামের। যাবক...অলক্ত। লহু...লঘু। কুসুমরি...কুসুমিত করিয়া। ভারি'...ভরিয়া। অব...এক্ষণে। গাওত...গাহিতেছে। তুয়া...তোমার। সন...স্বন। করয়ি...করিয়া। কীরত...বিকীর্ণ করিতেছে। পেখ...দেখ। তুঝকি...তোমার। লাগ'...লাগিয়া। ঠারই...ঠারিতেছে অর্থাৎ ইসারা করিতেছে। নাহ...নাথ। দোলরি...দোল্। সূচই...সূচিত করিতেছে। ভাবি...ভবিষ্যতের। বোলরি...বলিতেছে।

মোক্ষ]

হিন্দোল লীলা।

হৃদয় নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝারে,
(আজ) প্রাণের দুলাল দুলিছে।
পরাণ কিশোরী লইয়া শ্রীহরি,
(মন) কদম্বেরি ডালে ঝুলিছে॥

দুঁহু মুখ শশী   প্রেমানন্দে ভাসি,
মৃদু মন্দ হাসি হাসিছে।
বসি একাসনে   দুঁহু দোঁহা পানে,
তৃষিত নয়নে চাহিছে॥
হেরি সে মাধুরি   আপনা পাশরি,
সখীগণ সুখে ভাসিছে।
বিমোহিত প্রাণে   সুমধুর তানে,
হিন্দোল রাগিণী গাহিছে।
তালে তালে তারা   নাচে মাতোয়ারা,
মাঝে মাঝে বাঁশী বাজিছে।
বংশীধ্বনি শুনি   সকলে অমনি,
শ্রীরাধাগোবিন্দ বলিছে॥

শ্রীগোবিনলাল—

মোক্ষ]   স্বামিজীর সংবাদ।

আজ জন্মাষ্টমী। গতরাত্রে মনে মনে স্বামিজীকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যদি এবারেও স্বামিজী দেখা দিয়া কিছু বলিয়া যা'ন। গভীর রাত্রে একটী স্বপ্ন দেখিলাম! পাঠক স্বপ্ন বলিয়া যেন উপেক্ষা করিও না। আমাদিগের সবই ত' স্বপ্ন --ঘুমাইয়া স্বপ্ন, জাগিয়া স্বপ্ন, যোগে স্বপ্ন, যাগে স্বপ্ন—চারিদিকেই স্বপ্ন। স্বপ্ন তাহার উপর একটু ফাউ—এই মাত্র. যদি বল চারিদিকেই স্বপ্ন কিসে? স্বপ্ন কি, তবে তাই দেখা যা'ক! স্বপ্নের প্রধান লক্ষণ এই যে স্বপ্ন "প্রবিবিক্ত ভুক্।" স্বপ্নে প্রকৃষ্টরূপে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ভোগ হয় মাত্র। স্বপ্নের কথা সকলেই ত' জান; যখন যে রকম বাসনা, তখন বস্তুর সেই অংশটুকু মাত্র ভোগ হয়। স্বপ্নে কাম-ভাবে দৃষ্ট স্ত্রীলোকে কেবল কামেরই পরিসমাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীমূর্ত্তিতে যে অনন্ত ভাব আছে, তাহার মাতৃভাব, তাহার দেবীভাব, তাহার প্রকৃতির স্বরূপত্ব—এই সব হারাইয়া বাসনানুযায়ী একটী ভাব মাত্র ভুক্ত হয়। বস্তুর সর্ব্বভাব হারাইয়া বিশেষ ভাবে অবস্থিতি হয় বলিয়া, স্বপ্ন প্রকৃত সত্যের আভাস দিতে পারে না। কামুক

জাগ্রত অবস্থায় সুন্দরী রমণী দর্শন করিলে, সমাজের ভয়ে—ধর্ম্মের ভয়ে বা আইনের ভয়ে বস্তুর অন্যান্য ভাবগুলি স্মরণ করিয়া কামের বেগ রোধ করিতে পারে। কাম বা ক্রোধের বেগ রোধ করা অর্থে শুধু 'কুস্তি' করা নহে; উহা সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি বিকাশের চিহ্ন। এইজন্যই শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—

" সক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর বিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ গীতা ৫।২৩।

শরীর-ভাব ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কামের স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, পরে উহার রোধ সাধিত হয় না। আমরা জাগ্রতাবস্থায়ও প্রায়ই ঐ প্রকার আপন আপন খেয়ালের বশে উন্মত্ত হইয়া আছি। পরিপূর্ণ ভগবান কত আকার ধারণ করিয়া আমাদিগের সম্মুখীন হইতেছেন, আর আমরা কেবল কামনার বশে স্ব স্ব ক্ষুদ্রান্তর ঘট পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। নিত্যানন্দ ধাম হইতে ভগবানের মধুর মুরলী নিঃস্বন তরঙ্গায়িত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে; তাঁহারই চৈতন্য দ্রব হইয়া 'দবা'রূপে পরিণত। কিন্তু আমরা যে "গরগর বাজে বাঁশী নন্দের ভবনে" তাহাকে "যার মনে যা হৈছে সে তৈছে" শ্রবণ করিতেছি।

তাই বলি, আমাদের সবই স্বপ্ন। তবে আরও এক প্রকার স্বপ্ন আছে, উহা অপ্রাকৃত। উহাতে আর 'বহু' নাই, প্রকাশ নাই, বস্তু নাই; আছে কেবল পরমাদ্বিতীয়, মায়া ও জগদ্ভাবের নির্লেপ শূন্য; সুতরাং প্রবিবিক্ত ঘন আত্মস্বরূপ ও আত্মভাবে ভাবিত শ্রীভগবান। মহাপ্রভু এই প্রেমের কথাই বলিয়াছেন। তিনি কামনার ভাষায় উপদেশ দেন নাই। এই অপ্রাকৃত স্বপ্ন ক্ষেত্রে ভগবানই "প্রবিবিক্ত ভুক্।" প্রকৃষ্ট শাস্ত্রানুগত ভাবে পরিশুদ্ধবিবেকের সাহায্যে যিনি ভগবানকেই সত্য ও সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি প্রবিবিক্ত; সেই প্রবিবিক্ত ভক্তকে ভোগ করেন বলিয়াই শ্রীভগবান প্রবিবিক্ত-ভুক্। ভোগ অর্থে শরীরও বুঝায়। তাই এস, আজ সেই প্রবিবিক্ত মহাপুরুষের পদানুসরণ করতঃ তাঁহাদের মত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" মন্ত্র জপ করি।

কথায় বলে "স্বপ্নের গরু গাছে উঠে।" তাই বোধ হয় আমার 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি কি এক রকম আশ্চর্য্য ভাবে খেলিল। হঠাৎ দেখি যেন স্বামীজি অনন্তরাম সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বড়ই আহ্লাদ হইল; তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিলাম যে "এক বৎসর পরে আবার দেখা"।

স্বামি। তো'য়া সব কেবল দেখা দেখা করেই পাগল হয়েছিস। ওরে ও দেখা যে দেখা নয় রে! দৃশ্য-ভাবে দেখার নামই ত' ভোগ; "দৃশ্যস্য যা উপলব্ধি

সা ভোগঃ।" বাহিরে সাপ ব্যাঙ দেখে কি লাভ ? এমন কি টপ্পাওয়ালা নিধু বাবুও ত' বলে গেছেন ;—

"মনেরে না বুঝাইয়া নয়নেরে দোষ কেন ?
আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মনোমিলন।"

ওরে যাদের মন জন্মেছে—যাদের ভিতর ব্রহ্ম প্রকাশ হয়েছেন ; তাঁরা আগে মনে দেখে ; পরে হয় ত' চ'খে একবার মিলিয়ে নেয়। আর তোদের মনে নাই কিছু—কেবল ফাঁকা ; তাই 'দেখা দেখি' নিয়েই অস্থির , দিনরাত কেবল খ্যাখা ! খ্যাখা !! খ্যাখা !!! (Vision)। তেমনি যাদের ভিতর বুদ্ধিরূপা দেবীর প্রকাশ হয়েছেন, তারা সৃষ্টি ছাড়া হয়ে যায়. তাঁ'রা আর ব্রহ্মার ক্ষেত্রে মনে দেখে না ; তাঁরা অর্জ্জুনের মত সবই শ্রীভগবানের শরীরে দেখেন। আবার যাদের ভিতর চৈতন্যময়ী দেবী পরিতৃপ্তা হয়ে উপরতা হ'ন ও বুদ্ধির খেলাটী বন্ধ করেন, তারাই সেই পূর্ণ ভগবানে একেবারে ডুবে যায়। তখন আর দেখাদেখি থাকে না। যখন সবটাই এক, তখন আর কে কাকে দেখেরে বাপু !! সে যা হউক ; তোর মতলবটা কি ?

আমি। এঁা——ভগবানের সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন—যদি কিছু হৃদয়ে ফুটিয়ে দেন——

স্বামি। তোর দেখছি হোঁৎকামিটা কিছু কমেছে। 'বলেন' বলেই সামলে নিলি। হিন্দুরা 'বলাবলির' ধার ধারেনা। কারণ বলা ও শোনা দেহাত্মক বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। হিন্দুর আদর্শ শ্রোতব্য ও শ্রুতের উপরে যাওয়া। তাঁহারা জানেন যে শ্রুতিগুলি যাহাকে গ্রীকেরা memphian harp বলেছেন ও যাহা 'উদ্যন্তং জাতবেদসং" "বৃশে বহন্তি কেতবঃ" জগতের আত্মা-সূর্য্য উদয় হ'লে, আপনা আপনি বেজে উঠে। এই শ্রুতিগুলিও ভাগবৎ বলেছেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানকে দেখাইতে পারে না ; কেবল তটস্থ বৃত্তি বা ইঙ্গিতের সাহায্যে দেখায়।

যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ গীতা।

দেখা শুনা বন্ধ না হ'লে কিছুই হয় না। শাম্ভবী বিদ্যা শিখা চাই।

আমি। এ আবার কি বল্লেন। হচ্ছে এক কথা, আবার আপনি যোগের কি ক্রিয়া ট্রিয়ার কথা বল্লেন ?

স্বামী। ওরে তুই যোগা ! এখনও যোগ শিখ্‌তে পারিস্ নি। সাধারণ

যোগীরা ও ভক্তেরা যাহা বার থেকে অনেক কুস্তি কসরৎ কোরে যাহা একটু একটু লাভ করে ; সেটা যখন ভেতর থেকে একটু একটু ফুটে উঠে, তখনই প্রকৃত অবস্থা ঘটে। যেমন মেয়েদের পুতুল খেলা। পরে সত্যিকার যেটা করতে হবে, সেটা পুতুলের উপর দিয়ে শিখিয়ে লওয়ার নামই পুতুল খেলা। তাতে পুরো দুধের স্বাদ পাওয়া যায় না ; তবে ঘোলের শাদাটে রং টুকুর মত একটু রং আছে মাত্র। শাম্ভবী বিদ্যা কাকে বলে জানিস্? এ সুধু জিব উল্টে ত্রাটক করা নয়। "দৃষ্টি স্থিরা যস্য বিনাবলোকনং মনঃস্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং।" কথাটা বুঝ্‌লি?

আমি। কিছুই ত' বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আমার ত' মনে হয় কট্‌কটিয়ে Crystal gazingএর মত বা নখে এক ফোঁটা কালি রেখে তার দিকে দেখার মত একটা কিছু হবে। ঐ রকম ক'রে চাইতে চাইতে চক্ষের স্নায়ু (Optic nerve) বিকল (Parlized) হয়ে গেলে, যা' একটা কিছু হয়—তাই।

স্বামী। ওরে মুখ্‌খু তা' নয়। তোদের কাছে কোনও কথা বল্‌বার যো নাই। বল্লেই স্থূল ভাবে—কামনার ভাবে নাবিয়ে এনে বস্‌বি। ওরে বল্‌তে পারিস্, যখন—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" যখন জন্ম জন্ম ধরে চখের সামনে কত কি পড়েছে বটে, কিন্তু জানি না কোন শক্তিবলে ঐ সকল রূপ দেখে আর তৃপ্তি হয় না। যখন ঐ সকল বস্তু ও রূপের ভিতর দিয়ে যেন ড'ফাঁক করে দৃষ্টি কোথায় চলে যায়—যখন হাসি, খেলি, নাচি, কাঁদি, যাই করি না কেন, তারি মধ্য দিয়া দৃষ্টি কাহার দরশন পিয়াসে স্থির হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে থাকে, তখনই ত' বাস্তবিক দৃষ্টি স্থির হয়েছে। "পুরুষস্য যা উপলব্ধি সা অপবর্গ।"

আমি। আর মনের অবলম্বন শূণ্যতাটা কি? মনকে Vacant করা বুঝি?

স্বামী। তুই আর বুদ্ধির পরিচয় দিস্‌নে। সব জিনিসই বাহ্য ভাবে চিন্তা করবি আর বল্‌বি দেখ্‌তে পাচ্ছিনা—শুনতে পাচ্ছিনা। ওরে নিধুবাবুর গানটাই মনে করে দেখ্‌না—

"আঁখি যত জন হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
মন যারে মনে করে সে হয় মনোরঞ্জন।"

তোরা ভারি বোকা! এমন গানটাকে একটা মাংসপিণ্ড শরীরের কাছে হাত মুখ নেড়ে গেয়েই ভাব্‌লি বড্ড কাজ করা হ'ল!! বল্‌তে পারিস্ মন কি চায়? মন

যদি বাস্তবিকই বাহ্যিক কিছু চাইতো, তাহ'লে তা পেয়েই মানুষ তৃপ্ত হ'ত; তা'তো হয় না; একটা পেয়ে আরও একটা চায়'! তা'তেও কি সন্দেহ হয় না যে বাস্তবিক মন কি চায়? মনকে চালায় কে? মনের পিয়াসা কিসের?

"যন্মসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদম্ যদিদমুপাসতে॥" কেনোপনিষৎ ১।৫।

ওরে মনকে প্রগ্রহ বলে। "বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।" প্রগ্রহ মানে কি জানিস্?

আমি। কেন লাগাম!

স্বামী। তা বই কি! আর সঙ্গের চাবুক গাছটী ফেলে দিলে চল্‌বে কেন? রামচন্দ্র! কেবল ভেদ ভাবেই সব মনে কর্‌বি? কাজেকাজেই রস পাস্ না। তোরা ভাবিস্ মন বুঝি কেবল ইন্দ্রিয়গুলিকে ধরেই আছে। "ইন্দ্রিয়তে (যারা ইঙ্গিত করে) ইতি ইন্দ্রিয়ম্।" ভুলোর দলের বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর মত ইসারা করেই পরম সুন্দর পর পুরুষের ইঙ্গিত বিদ্যাতত্ত্বের কাছে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু এই দেখানটা সামান্য ভাবে হয়। এই ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান গুলিকে যে তত্ত্ব আশ্চর্য্য কৌশলে মিশাইয়া তাহা হইতে প্রকৃষ্ট বিশেষ ভাব ইঙ্গিত করে, তাহাকে মন প্রগ্রহ (প্র+গ্রহ) বলে। চোখ রূপ, কান মধুর ধ্বনি আনিল; কিন্তু মন না থাকলে ঐ সামান্য রূপ ও ধ্বনি প্রভৃতি একত্রিত করিয়া প্রণয়িনীর মনোরম মূর্ত্তি আঁকতে পার্ত্তনা! অন্য নারীতেও যাহা আছে, প্রণয়িনীতেও তাহা আছে বটে, কিন্তু কি একটা বিশেষ আছে যে তার জন্য মন এত আকুল হয়! ঐ প্রগ্রহ "গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং" বলিয়া শ্রীভগবানকে অভিহিত করা হয়। গোপীদিগের নয়নে যে ভাব আছে. সেই ভাব রাশির সাহায্যেই যেন ভগবানের তনু (অর্চ্চিত, অর্চ্চি=দ্যুতি যুত) গঠিত হয়। সেই জন্যই বুঝি যাই তাঁকে চ'খে দেখ্‌লে, তাই চ'খের সকল কাজ বন্ধ হয়ে—কোথায় কিরূপে মিশিয়ে গিয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অপ্রাকৃতের তনু প্রকট করে। রাধা যদি আকাশের নীল রঙ্গে কেবল রং দেখিয়াই আকাশকে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তাঁর আকাশ বুদ্ধিই জন্মাত। ঐ দেখ নীল রংও রইল না, আকাশও রইল না, বা নীল রঙ্গের মানুষ বুদ্ধিও ফুটলো না, কোথা হইতে হঠাৎ সেই পরপুরুষের ভাষা হৃদয়ে জেগে উঠে তাকে ব্যাকুল করে দিলে। মানুষ যদি ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয় জেনে মনকে প্রগ্রহ বলে বুঝ্‌তে পারে, তা হ'লে আর এত দুঃখ থাকে না; তখন সবই ভরপুর হয়ে উঠে। বল্‌তে পারিস্,

অস্যূর্য্যম্পশ্যা লাবণ্যময়ী পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে বাবুরা সোনাগাছির কালপেঁচিতে কি দেখ্‌তে পান্ যে একেবারে ডুবে যান। ওরে! যে যেখানটাতে তাঁর আভাস দেখ্‌তে পায়, সে সেখানটাতেই মনে করে বুঝি তার পরিপূর্ণতা বিরাজমান—সে সেইখানটাই ভরপুর দেখে।

ইংরাজ প্রেমিক প্রণয়িনীর চখের ভিতর কি এক অগাধ গভীরতা (Unfathomable depth) দেখিয়া একেবারে মস্‌গুল হয়ে যায়। রসলোলুপ ব্যক্তিগণ এইরূপ আভাস লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু যাঁহারা রস-জ্ঞ, তাঁরা জানেন "নেদম্ যদিদমুপাসতে" ঘটিটা বাটীটার মত ছোট করে তাঁকে ধরা যায় না তারা দেবকী চৈতন্যের শরণ গ্রহণ করেন। সর্ব্বত্র সর্ব্ব স্বরূপে দেদীপ্যমানকে খুঁজিতে যান

আমি। আপনি কি বল্‌ছেন আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

স্বামী। ওরে আমি তোকে বেদের ভাষা বল্‌ছি। যে বেদগুলি নিয়ে সেই ভগবান "বেদিয়ার" বেশে ঘুরে ঘুরে খেলে বেড়াতেন। মনে কর একজন লোক আছে, সে কেবল নীচের দিকেই চাইতে পারে, উপরদিকে দেখ্‌তে পারে না। সূর্য্য উদয় হইল সে কি দেখিল? সে দেখিল অকস্মাৎ কোথা হইতে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানাবর্ণের বস্তু সকল স্বতঃই উৎপন্ন হইল। এইরূপে যাঁহারা কেবল স্থূল বা নীচের বস্তুর দিকে আবিষ্ট, তাঁহারা গম্ভীর ভাবে জগতের আকস্মিক উৎপত্তি বাদ প্রচার করেন। কিছুদিন এই নানা বর্ণ ও বর্ণ সমন্বয় লইয়া খেলা করিতে করিতে মানব যখন বুঝিতে পারে যে বস্তুর রংটা তাহার চক্ষুর সহিত বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ,—আলোকের এক রকম স্পন্দন কোণে (Angle) দেখিলে যাহা লাল বলিয়া উপলব্ধ হয়, অন্য কোনে বা ভাবে দেখিলে তাহাই নীল হইয়া যায়। এইরূপে যখন মানব দেখে যে,—

"সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল॥"

তখন তাহার দৃষ্টি তাহার আপন প্রকৃতির উপর পড়ে; তখন সে বলে,

সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চন্দ্রমা সেবিনু; ভানুর কিরণ পেখি।"

তখন সে আপন অদৃষ্ট, কর্ম্ম, স্বভাব, প্রভৃতি খুঁজিতে আরম্ভ করে। ইহা দার্শনিকের ভাষায় Man know thyself অবস্থা। এখনও বেদ

আসে নাই। তাহার পর মানব দেখিতে পায় যে, বাহ্য বস্তুর সহিত আন্তর প্রকৃতির কি এক সম্বন্ধ আছে। বিকার-রোগে বিষ-প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। তখন সে বুঝিতে পারে যে ভিতরে আমি ও বাহিরে বস্তু উভয়ের মধ্যে একটা সাম্য আছে; ঐ সাম্য আনন্দ-ঘন ও বড় মধুর। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির নিকট জল যেরূপ মধুর, কামুকের নিকট কামিনী সঙ্গও যেইরূপ মধুর, আর ভক্তের নিকট ভজনও তদ্রূপ। তখন মানব বুঝিতে পারে যে কোথায় কি এক সাম্যরূপ অমিয়া-সাগর আছে; বাহিরের বস্তুগুলি সেই অচল-প্রতিষ্ঠ সাগরের উর্ম্মিমালার ন্যায়। উহা স্বভাবতঃই মধুময়, তবে ভেদজ্ঞানে বেশী করিয়া খাইয়া ফেলিলে, কখন কখন বুকজ্বালা করিলেও করিতে পারে। তখন সে বলিয়া উঠে,—

"মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধী, মধুনক্তমুতোষসি।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্ন বনস্পতি, মধুমাংহস্তুসূর্য্য, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ
ওঁ মধু ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ॥"

এই মধুবিদ্যার নামই সামবেদ। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই মধু-বিদ্যা বর্ণিত আছে।

তারপর জীব আপনার সহিত সাম্য সম্বন্ধ স্থির করিয়া জগদ্ভাব অতিক্রম করে। "ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গ যেষাং সাম্যে স্থিতো মনঃ" তারপর জীব যখন বুঝিতে পারে যে সূর্য্যরশ্মি যেমন বস্তুর উপরে যে (Angle of impingence) ভাবে প্রতিফলিত হয়, ঠিক সেই (Angle) ভাবেই আমাদিগের দৃষ্টির সহিত যোগ হয়। পক্ষান্তরে জগতের সর্ব্ব বস্তুর ভিতর দিয়া সাম্যের ভাবা (Angle) অবলম্বন করতঃ বিপরীত দিকে অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' এই বুদ্ধির বিপরীত সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি প্রয়োগ করে। তখন সেই বস্তুগুলি কেবল এক অবিশেষ আলোক তত্ত্বের—জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতি প্রকাশ ক্ষেত্র বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন সে সকল বস্তুতে কেবল সাম্য স্থির করিয়াই নিবৃত্ত হয় না; তখন বস্তুগুলি এক মহান্ জ্যোতির আধার বলিয়া তাহার প্রতীয়মান হয়। তুমি বলিবে নীল পীতাদি বর্ণ সকল গ্রহণ করতঃ রক্তবর্ণ ত্যাগ করে বলিয়াই বস্তু রক্তবর্ণ দেখায়। 'বস্তু' প্রকৃতির অন্তর্গত চৈতন্যময়, যাহা ত্যাগ করেন তাহাই ত' আমাদের ভোগ্য—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা ... ... ॥ ঈশোপনিষদ। ১।

বৃক্ষটী আম্র ফল দেয় বলিয়া যদি গাছ শুদ্ধ হজম কর, তবে আর সুখ পাইবে না। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করও বলেন,— 'জ্ঞানও বস্তুতন্ত্র", বস্তুর অধীন; আমাদের খেয়ালের অধীন নহে। সে যাহা হউক, যখন সেই পরম বস্তু কর্ত্তৃক প্রদত্ত কখনও দুঃখ, কখনও সুখ, কখনও জন্ম, কখনও মৃত্যু প্রভৃতি রূপে বিভিন্ন প্রায় ভাবগুলি সাম্যের ভাষায় ঘন করিয়া দেখিতে পারা যায়, তখনই ঋগ্বেদের ভাষা একটু একটু ফুটিয়া উঠে। কিন্তু এই ভাষা উন্মেষিত হইবার আগে ভগবানকে সদা স্বপ্রকাশ বা জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া উপলব্ধি হওয়া চাই, এবং সকল ভাবের প্রকাশের অন্তরালেই যে তাঁহারই খেলা হইতেছে, তাহা বুদ্ধিগত হওয়া চাই। তাহা হইলে জগতের যে কোনও বস্তু যে কোনও ভাবে তোমার নিকট প্রতিভাত হউক না কেন, ঐ (Angle of reflection) ভাব বা বিম্বভাবটী ধরিয়া সেইটিকে ঘুরাইয়া সর্ব্বাত্মিক ভাবে প্রয়োগ করিলেই জ্যোতির্ম্ময়ের অবস্থান জানিতে পারিবে। সমুদ্রে অবগাহন করিতে যাইয়া অজ্ঞ ও ভীত ব্যক্তিগণ যেমন সমুদ্রের সহিত যুঝিতে যায় বলিয়া তরঙ্গ কর্ত্তৃক বেলা ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বস্তু ও ব্যক্তিগত মোহের বশে ভগবানের সাম্য ও জ্যোতির ভাষা প্রত্যাখ্যান করিলে, সুখ দুঃখের তরঙ্গে বিধ্বস্ত হইয়া মানব জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে। পরন্তু রসিক যেমন আপনার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করতঃ সমুদ্রে গা ভাসাইয়া তরঙ্গের উপরে শুইয়া পড়িয়া তাহারই সাহায্যে তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তরে সু-সুখে নাচিতে নাচিতে ভাসিতে ভাসিতে গমন করে, সেইরূপ সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম না করিয়া তাহাতে গা ভাসাইয়া দিলে, এই চঞ্চল ভেদের মধ্যেও এক স্থির অভেদ সত্ত্বার আভাস পাওয়া যায়। রসিক এইরূপে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই বিপরীত বিহার করিতে শিখিয়া বা বৈরাগ্য (বিগতরাগ বা বিপরীত রাগ ভাব) অভ্যাস করিয়া ক্ষুদ্র সাময়িক ব্যক্তিগত ভাবের ভিতরেও প্রতিক্ষণ প্রেমানন্দ ঘন ভগবানের মহারসে (রস + ভাবে ঘঞ্) লীলায় স্পর্শন, নর্ত্তন, আলিঙ্গনাদি ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন। তোমরা ভাব যে আমিটীকে এমন করিয়া কঠোর করিতে হইবে যে সুখ দুঃখাদি কিছুরই আর অনুভূতি হইবে না। বাপু! 'অনু'ভূত হইয়া যাহা আছে, তাহা ছাড়াবে কি ক'রে? আর তা হ'লে উপল ও উদ্ভিদাবস্থা ত্যাগ করিয়া মানব জন্ম ধারণ করিলে কেন? এই অবস্থাগুলি ত' চৈতন্যেরই বিভিন্ন ভাষার খেলা।

আমি। আপনি কি বলিতেছেন? আর একটু বুঝাইয়া বলুন; স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামী। তুমি একটী প্রধান রাসভ। নিজের জীবনে কি দেখ্লি তাহা মনে রাখিস্ নাই; কেবল সাময়িক ভাবে উন্মত্ত হয়েই বেড়ালি। ভেবে দ্যাখ, যখন বালক ছিলি, তখন কত যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা তোকে বুকে করিয়া কত আদর করিয়াছিল, সেই আদর তুই তখন কি ভাষায় বুঝেছিলি? আর যখন একদিন যৌবনের ভাষা তোর হৃদয়ে ফুটে উঠ্ল তখনই বা কি দেখ্লি? তুই যা' ছিলি তাই আছিস্; তবে শৈশবে এক ভাষায় রমণী সঙ্গ করেছিস্, আর যৌবনে কি এক অভিনব ভাষা ফুটে উঠে তোকে মাতিয়ে ছিল; আর এখনই বা কি এক ভাষার বশে রমণী মাত্রেই মহামায়ার প্রতিচ্ছায়া দেখ্তে পাচ্ছিস্? ওরে বেদগুলি "আত্মার ভাষা।" সে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন ভাবে কথা কহে, বা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীতা ৪।১১।

সেই ভাষাই সামবেদ ঘন সমরূপা সর্ব্বভূতস্থ "সমোহহং সর্ব্বভূতেষু" ভাবের শিক্ষা দেয়। তাহাতে তাঁহাকে ভূতস্থ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে বলিয়াই ঋগ্বেদ আসিয়া উপদেশ দেন যে "ঐ সাম্য রূপই ভগবান।" তিনি বস্তুগত নহেন। বস্তু হইতে আলোকের ন্যায় উপরে ফুটিয়া উঠিতেছেন। তারপর যখন পরাভাব বিকাশিত হইয়া উঠে, যখন তাঁহার জ্যোতিঃরশ্মিকে ক্ষেত্রজ্ঞত্ব ভাবে (Angle of reflection) দেখিয়া বিপরীতক্রমে প্রকাশময় ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই বিপরীত অথচ জীবের ভিতর প্রকাশিত অনুরূপ পথ (Angle) ধরিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখিতে পাইবে যে, এই আলোক-রশ্মি বা কেতুগণ সেই জগতের অতীত নিষ্কল, আকাশস্থ সূর্য্যস্বরূপ, নির্লেপ আত্মাই জ্যোতি সকলের পরিসমাপ্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই 'পশ্যন্তিবাক্' বা যজুর্ব্বেদের ভাষা। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—তখন আর সমরূপ ভাব ধরিয়া জ্যোতি ভাবের সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে হয় না। তখন মানব 'উদ্ধ' বা 'পর' কথাটীর মানে বুঝিয়া একেবারেই 'পরাভাবে' পরপুরুষ শ্রীভগবানকে দেখিতে পারে। ঋষিগণ ইহাই শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

* * * * *

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞান যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম। গীতা ১৩।২।

* * * *

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥১৩।৪।

এইটুকু বোঝ; পরে দেখা হইলে আবার বল্‌ব। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

মোক্ষ]

আমার মা।

(১)

আমার এমন মাকে, কে পর কহিতে চাহে, তাই বল শুনি ?
(যেমা)
ধরে আছেন বুকের মাঝে, তার চেয়ে কে আপন আছে,
পরাৎপরা, পরমা যে তিনি !!

(২)

আছি মায়ের গর্ভে শুয়ে, তাঁরি স্পর্শে বেঁচে রই,
তাঁরি ভাষায় তাঁরি কথায়, তাঁর সাথেই কথা কই,
মা যে আমার সর্ব্ব-বিধায়িনী।
তাঁরি আদর তাঁরি স্নেহে, আছি তাঁরই গর্ভ-গেহে,
'সন্ত'ভাবে মা যে আমার হৃদি-বিহারিণী ॥

(৩)

ভেদের মূরতি তোরা কি জানিবি ভেদ বই,
সর্ব্বরূপে মা যে আমার দেখনা চাহিয়া ওই ;
মা যে আমার জগত রূপিণী !
নিশ্বাসে যে হাওয়ায় রহে, মেখে মধুর পরিমল
পিপাসায় যে শুষ্ক কণ্ঠে, ব'য়ে আসে শীতল জল ;
প্রিয়জনের স্পর্শে যে মা, আনন্দ হিল্লোলে বহে,
জগতের কণ্ঠে যে মা, সঙ্গীত রূপেতে রহে ;
আমার প্রাণের মাঝে তুলে মধুর গীতধ্বনি॥

(৪)

নয়ন কোণে বসে যে মা, গগন পটে দেখায় রবি,
বিশ্ব জুড়ে দেখায় ঘুরে, কত শত রঙ্গের ছবি ;
মা যে আমার সকল রঙ্গের খণি ;

মায়ের রূপের জ্যোতি দেখ, খেলে তারা তপনে,
তাঁরি আভা হাসায় চাঁদে, ভাসে তড়িৎ হুতাশনে ;
সাগর জলে বসে যে মা, শুক্তি গর্ব্ভে মুক্তা ফলায়,
বসিয়া কানন কোলে, তৃণের ফুলে ডালি সাজায় ;
নানা বর্ণের তুলি ধরে, বিশ্বে খেলার গৃহ সাজায়,
অঙ্গুলি হেলনে পুনঃ, সেই খেলাঘর ভেঙ্গে ফেলায় .
অনলে পতঙ্গ পোড়ায়, লুকায় মেঘে দামিনী ॥

(৫)

মায়ের বুকে স্তন্যে যে মা, পিতার বুকে স্নেহ-রাশি,
যাঁহার প্রীতির কণা তুলে, সংসারেতে মধুর হাসি ;
ইচ্ছাময়ি মা যে আমার প্রীতি-স্বরূপিণী।
পশু পাখী কীট পতঙ্গে, যা'র করুণা খেলে রঙ্গে,
স্থাবর জঙ্গমে যে মা, মিশে আছে অঙ্গে অঙ্গে ;
জগতে ঢালিয়া অঙ্গ, জগন্ময়ী সবার সনে,
সুখের হাসিতে হাসায়, কাঁদায় দুঃখের রোদনে ;
চিণ্ময়ি রূপেতে যে মা, চিত্ত-গুহা পরকাশে,
'প্রদ্যুম্ন' রূপেতে যাঁহার, লীলা-লহর খেলে মানসে ;
কাত্যায়ণী কামরূপা মা বাসনাতে খেলায় হাসি
ইন্দ্রিয়েতে হৃষিকেশ মা, কালীরূপে 'সর্ব্বনাশী' ;
অবয়বী চিণ্ময়ী তাই সেজেছে পাষাণী ॥

(৬)

বেদ, তন্ত্র, শাস্ত্র, পুরাণ, এক বাক্য বলে সবাই,
আমার মা যে আমারই মা, এর বেশী আর কথাটী নাই ;
সে যে আমার পরমা জননী।
দুখের রোদন শুনে যে মা, কোলে তুলে ছুটে আসি,
যাঁ'র শাসনে কাঁদি হাসি তা'রেই আমি ভালবাসি ;
কালরূপিণী জগদম্বা, বিশ্বরূপা মুক্তকেশী,
আমি বুঝি আমার মা সেই ভদ্রকালী কপালিনী ॥

আর কি আসিবে না

আজ আবার আনন্দধ্বনি শুনা যাইতেছে কেন? নর-নারী, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতীর আনন্দ কোলাহলে দেশ আবার মুখরিত হইয়া উঠিল কেন? কে আসিবে? ধনী-দরিদ্র, গৃহস্থ-ব্রহ্মচারী, সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত! আজ দেশে দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, 'মা আসিতেছেন, মা আসিতেছেন'; তাই আজ ঘরে ঘরে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি ঘোষিত হইতেছে। বাস্তবিকই কি মা আসিতেছেন? আমার তো বিশ্বাস হয় না! কৈ হৃদয় তো নাচিয়া উঠিতেছে না! শরীর কৈ ত পুলক ভরে শিহরিয়া উঠিতেছে না! জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী মা আমার আসিতেছেন, আর আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না.—এই কি সম্ভব! সত্য বল, অবিরাম বারিপাত নিবৃত্ত হইয়াছে, কামিনীর বিলম্বিত ঘনকৃষ্ণ চিকুর গুচ্ছের ন্যায় সে ঘন ঘোর ঘটা আর নাই; নিবিড় তিমির রাশি ভেদ করিয়া সৌদামিনীর ঘন ঘন চঞ্চল চমকিত ভাব আর নাই। পথ, মাঠ, ঘাট বিপর্য্যস্ত করিয়া বারি স্রোতের সে প্রবল বক্রগতি থামিয়া গিয়াছে বটে; মাঠে মাঠে সবুজ ধান্য নবীন মেঘের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে. বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সকলের মধ্যেই যেন একটা নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে তাহাও দেখিতেছি। পূর্ণ যৌবনের অবসান কাল আসন্ন হইলে যুবতীরা যেমন গতি, ভাব, ভঙ্গী সমস্তই চপলতা পরিহার করিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করে, এখন যেন প্রকৃতি রাণীও ঠিক সেইরূপ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন পল্বল, পুষ্করিণী কানায় কানায় জলে পূর্ণ: কিন্তু তা'র সে কূল-ভাঙ্গা খর বেগ যেন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। আকাশ মেঘশূন্য নির্ম্মল,—বাসনা-বিমুক্ত যোগীর চিত্তের মত শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ খণ্ড সরিয়া যাইতেছে, রৌদ্র ফুটিয়া উঠিতেছে, আশান্বিত হইয়া লোকে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ বিশ্বস্ত হৃদয়কে চমকিত করিয়া কোথা হইতে খণ্ড খণ্ড মেঘমালা এক জোট হইয়া বারিপাতের একটু খেলা খেলিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। ঠিক যেন কিশোরীর স্ফুটোন্মুখ যৌবনের চপল রসিকতা সে আর সম্বরণ করিতে পারিতেছে না যোগী সমাধিস্থ হইলেও ব্যুত্থান অবস্থায় যেমন আবার পূর্ব্ব সংস্কার তাহার চিত্তকে আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করে, তেমনি নবীন মেঘমালা আপনাকে রিক্ত করিয়া ঢালিয়া

দিলেও, আবার প্রকৃতির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের ব্যর্থ প্রয়াসে সচেষ্ট রহিয়াছে! নব মল্লিকা, মালতী, চম্পক, বক, সেফালিকা আবার কাহাকে দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, স্থল কমলের অপূর্ব্ব সুষমায় এ কার সুধা হাস্যময়ী মুখখানি মনে পড়িয়া যাইতেছে! গ্রামে গ্রামে জন সমাগম, গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব, আবার ধরাকে প্রাণময়ী করিয়া তুলিতেছে! তবে কি এ দুঃখের জগতে সুখের শরৎ আবার ফিরিয়া আসিল? ওই যে, শারদ-জ্যোৎস্নার বিমল কিরণে সমস্ত আকাশে আজ আর আনন্দ ধরিতেছে না;—আজ নক্ষত্র লোকে—চন্দ্র লোকে একি মহা মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে!! তবে কি জ্যোৎস্না প্লাবিত শারদ রাত্রে শত শশধর সুধা-বিডম্বিনী জগজ্জননী মা আমার শিব-সিমন্তিনী সাজে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন? নচেৎ এ শোক-রোগাচ্ছন্ন মৃত্যু-ত্রাসিত জগতে আবার এ সুখের লীলাভিনয় কেন? মা কি আসিয়াছেন! এ মৃত লোকে অমৃতের পরশ দিতে সত্যই আমার মা কি আবার আসিয়াছেন? হাঁ গো দীন দুঃখ হরা, এতদিনে কি তোর সন্তানের প্রতি করুণার উদয় হইল? কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে যে মা! "আসি" বলে চলিয়া গেলি, যুগ যুগান্তর বহিয়া গেল যে মা। হাঁ মা দীন-বৎসলে! আবার তোর পদস্পর্শে কি এ বিষাদিত মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে মা? হাঁ মা অভয়ে! আবার কি ভব ভয়হরা তোর হাঁসি-ভরা প্রসন্ন মুখখানি দেখিয়া এ জগৎবাসী অভয় পাইবে? বড় জ্বালায় এ জগৎ জ্বলিতেছে মা! তোর সুরাসুর বন্দিত রক্ত কমল চরণ দু'খানি এ ধরণীতলকে স্পর্শ করুক—উহার তাপিত বক্ষ শীতল হ'ক। দুঃখী দীন হীনের 'দরদ' বুঝিতে তোমার মত তো আর কেউ নাই মা! তাই কি কাঙ্গালের ঘরে আবার ফিরিয়া আসিলে? আমি এ কি প্রলাপ বকিতেছি! কোথায় মা, যাহাকে প্রাণের ব্যথা শুনাইতেছি! না না এ স্বপ্ন! মা কি কখন এদেশে আবার আসিতে পারেন? এ যে অভিশপ্ত, এ যে দগ্ধ দেশ, এখানে কি মা চরণ রাখিতে পারেন? এ যে নরক! সর্ব্বত্র নরকের আগুন দাউ দাউ জ্বলিতেছে এ যে সর্ব্বত্রই প্রলয়ের বিভীষিকা! এ যে রক্ত রাঙ্গা পদে, রক্তমাখা মুখে কোটি কোটি প্রেতিনী তাথেই-তাথেই করিয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। সকলেরই গলে নরমুণ্ড মালা, সকলেই নর হাড় ভূষণে ভূষিতা! তাহারা ক্রোধোন্মত্ত রক্ত আঁখি কটমট করিয়া যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, সেই দিক হইতে সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি ছাই হইয়া উড়িয়া যাইতেছে! একি উৎকট পূতিগন্ধে দিক সকল পরিপূর্ণ! একি

প্রলয়-বহ্নিধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন! তবু বলিতেছ মা আসিয়াছেন! আরে পাগল! মা আসিলে কি আর পৃথিবীর এ দুর্দ্দশা থাকে? না তাহার অঙ্কে নির্ভয়ে দানবকুল নৃত্য করিতে সাহস পায়? মার পদস্পর্শে এ নরকের দৃশ্য মুহূর্ত্ত কালও যে টিকিতে পারিত না! ঐ দেখ দলে দলে দানবকুল সৌভ্রাত্র বন্ধনকে —প্রীতি প্রেমকে পদদলিত করিয়া, এক ভাই আর এক ভাইকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত—মুষল হস্তে ধাবমান হইতেছে। কোটি কোটি নারী হৃদয়কে উন্মুলিত করিয়া মাতৃ হৃদয়ের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া পিশাচের দল অট্ট অট্ট হাস্যে হাস্য করিতেছে! না—না! মা আসিয়াছেন—এ কথনই নয়! দানব-দলনীর আবির্ভাব হইলে কি আর এই অসুর দল উৎপাত করিতে পারিত? সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন পলাইয়া যায়, তম-বিনাশিনী, শিব বিলাসিনী মার আগমনে এই অসুরকুলও তেমনি ত্রাসিত হইয়া কোন্ অদৃশ্য অন্ধকারের গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া পড়িত; আর তাহাদের অস্তিত্বও কেহ অনুভব করিতে পারিত না! তা'তো হয় নাই—মা তো আসেন নাই; তাইতো এখন ঘনঘোর অন্ধকার দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া রহিয়াছে,—চতুর্দ্দিকে দানব শক্তির বিকট আস্ফালন শ্রুত হইতেছে!! না, না—মা তবে তুমি আস নাই!

সত্যই তবে তুমি আস নাই,—হাঁ মা আর কি কখন তবে আসিবে না? তোমার চরণ ধূলায় এ ধরণী বক্ষ কি আর শোভিত হইবে না? তোমার চরণ স্পর্শের সে সৌভাগ্য আমরা কোথায় হারাইলাম! কোন্ দুষ্কৃত-রাহু আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে তোমার দিব্য চরণ-জ্যোতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল! জগতের প্রতি অণু যে অমৃতস্পর্শে অমৃতোপম ছিল, আজ সে শুধু ধূলি মুষ্টিমাত্র হইয়া চক্ষুর জ্যোতিকে ম্লান করিয়া তুলিতেছে! তুমি যে ঘটে ঘটে প্রাণরূপিণী—চৈতন্যময়ী! তবে এ প্রাণহীন অচেতন ভাব কোথা হইতে আসিল মা? এ যে জগৎ জুড়িয়া অজ্ঞানতা; অবিদ্যানাশিনী! তুমিই মা বলিয়া দাও, আমরা এ অজ্ঞান রাক্ষসের কবল হইতে কিরূপে ত্রাণ পাইব? জগজ্জ্যোতি-রূপিণী! তুমি ভিন্ন এ অজ্ঞান-ধ্বান্তের কে উপশান্ত করিবে? আমাদের এ দুর্ণিবার মোহ আসক্তি তোমার জ্ঞান খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হউক! একবার বরাভয় করে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' রবে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া হাঁসির বিকাশ সূর্য্য চন্দ্রকে প্রভাহীন করিয়া দাঁড়াও মা! সন্তানেরা তোমার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হ'ক!

মা শিবে! আজ শিবকে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা সকল সম্পদ সকল

শোভাকে হারাইয়াছি? আজ তোমাকে ভুলিয়াছি;—তা'ই ধনধান্য ভরা এ শোভার ভারতে দুর্ভিক্ষের রোষাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে? হাঁ মা কণকবরণী গৌরী! আমাদের কুকার্য্য-কলঙ্কে আজ সমস্ত দিক ভরিয়া উঠিয়াছে;—তা'ই কি সন্তানের অপরাধ স্মরণ করিয়া তোমার লজ্জা-পীড়িত মাতৃবক্ষে ও তোমার সমস্ত মুখখানিতে কালিমা মাখাইয়া দিয়াছে। তা'ই কি তোমার সে শোভন-শ্রী আর জগৎকে আনন্দ রসে পূর্ণ করিতেছে না। তা'ই কি মা আমাদের ত্যাগ করিলে? অথবা আমরা সর্ব্বপ্রকারে দরিদ্র ও দীনাত্মা বলিয়া আসিবে না! তোমার পূজার আয়োজন কি আমরা করিতে পারিব না? তা'ই কি তুমি বিমুখ হ'লে মা! আমার সম্পদ বিভব নাই সত্য; কিন্তু তো'র ঐ রাঙ্গা চরণ দুটিই যে জীবের পরম সম্পদ!—সমস্ত ভুক্তি মুক্তির আশ্রয়। তুমি দয়া করে আসিলেই যে মা সমস্ত দারিদ্র্য ঘুরিয়া যাইবে। সিদ্ধি ঋদ্ধি সমস্তই তোমার পাদপদ্মের মহিমা বৈ ত' নয়। তুমি আসিলেই সর্ব্ব বিদ্যা. সর্ব্ব জ্ঞান, সর্ব্ব সম্পদ, সর্ব্ব সিদ্ধি, সর্ব্ব শক্তি, সবই আমরা ফিরিয়া পাইব যে? তবে কেন তুমি আসিবে না মা! আমরা ভক্ত নই—তা'ই? আমরা শুভকে পদদলিত করিয়াছি,—তা'ই? আমাদের ঘরে ঘরে নিরানন্দ, শোক, রোগ, হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ—তাই? গৃহে গৃহে কলহ, ভাইয়ে ভাইয়ে বিসম্বাদ, গুরুজনের প্রতি ভক্তি নাই, স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা নাই;—তা'ই তুমি আসিবে না? তা'ই কি তুমি দিগ্‌বসনা, উলাঙ্গিনী বেশে জগতের সমক্ষে বিভীষিকাময়ী হইয়া ভয় দেখাইতেছ? মা! এ দুর্গতি আমাদের হইয়াছে তা ঠিক, কিন্তু তুই যে দুর্গতিহরা, তুইও চরণে ঠেলিবি মা? মা একটা কথা আমার শুন! তুমি যে শ্মশানবাসিনী;—শ্মশান তোমার বড় প্রিয়,—তা' যে শুনিয়াছি; তবে মা, আমার হৃদয়ে তোর বেশ বসিবার ঠাই হইবে। আমার হৃদয়ের মত এমন মহাশ্মশান আর পাবে না মা! একবার আমার হৃদয় পানে চাহিয়া দেখ, সেখানে দয়া নাই, শ্রদ্ধা নাই, কোমলতা নাই, পূজা-পূজা নাই—সব অবিশ্বাসের অগ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে; সেখানে কেবল জ্বালা—প্রাণের জ্বালা, কামের জ্বালা, ক্ষুধার জ্বালা, রূপের জ্বালা, ধনের জ্বালা,—'দাউ দাউ' করিয়া দিবারাত্র জ্বলিতেছে। সেখানে আর কিছু শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া ষড়রিপুর বিকট চীৎকার—শ্মশানে ফেরুপালের অভিনয় করিয়া ফিরিতেছে!! শ্মশানে যেমন দগ্ধাস্থিখণ্ড স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়া থাকে এবং শবদাহের গন্ধে পূর্ণ থাকিয়া পথিকের ভীতি উৎপাদন করে, তেমনি আমার হৃদয়-শ্মশানে আজ আর কিছু নাই। সব

পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে; কেবল পাপ-স্মৃতির কঙ্কালরাশি, বিকৃত অনুষ্ঠানের অস্থি-আবর্জ্জনা, আর অতীত গৌরবের অভিমান, স্পর্দ্ধার নরমুণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! লোকে শ্মশান দেখিলে যেমন ভয় পায়, আমিও আমার হৃদয় পানে তাকাইয়া তদ্রূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছি। মা! এমন ভয়ঙ্কর শ্মশান আর কোথায়? এখানে প্রতিদিন শত শত শুভ বাসনা শুষ্ক কাষ্ঠের মত প্রবৃত্তির আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে!

আয় মা! তবে একবার এই শ্মশান-হৃদয়েই তোমার আসন পরিগ্রহ কর! আমার হৃদয়ের করুণ বেদনা, রোগের ভয়াল আর্ত্তনাদ, মর্ম্ম ফাটা রোদনের অব্যক্ত ধ্বনি সেখানে সঙ্গীতের কাজ করিবে! পত্র, পুষ্প, নৈবেদ্য আর কি আহরণ করিব মা! আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র কোমল ভাবগুলি গন্ধহীন পুষ্পের কাজ করিবে। ভক্তেরা যে তোমার আকাশ-থালে সূর্য্য চন্দ্রের দীপ সাজাইয়া, মনকে অর্ঘ্য করিয়া, পঞ্চপ্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া, সহস্রার-কমল-চয়িত সুধা-ধারাকে আচমনীয় ও পানীয় জল রূপে নিবেদন করেন;—অভক্ত আমি, দীন কাঙাল আমি, সে কোথায় পাইব মা? আমার শ্রদ্ধা-বিহীন—ভক্তিবিহীন শুষ্ক ভাব-কুসুমগুলি, এবং অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের তপ্ত অশ্রুই আমার পূজার সম্বল। আমার প্রাণের অক্ষম শক্তির ব্যাকুলতা অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিব। মা গো! এ তো কৈলাস নয়, এ যে শ্মশানের পূজা; এখানে এই দীন পূজার দীন আয়োজনেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তারপর তোমার বলির কথা ভাব্‌ছি! কি আছে আমার, তোমার চরণে কি বলি দিব? ভক্তেরা যে আত্ম-বলি তোমার চরণে নিবেদন করেন, সে শক্তি তো আমার নাই! তুমি জোর করিয়া আমার মোহ-আসক্তিকে বলিরূপে গ্রহণ কর! আমি এত চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত আমাকে "আমার" করিয়া লইতে পারি নাই; তবে তোমার পাদপদ্মে আর কি বলি দিব মা? অসুর-নাশিনী! একবার হুহুঙ্কারে দিগন্ত সংক্ষুব্ধ করিয়া রিপুকুলকে স্তম্ভিত করিয়া দাও! তাহারা যেন স্বেচ্ছায় তোমার চরণে আপনাদিগকে বলি দেয়। একটা কথা তোমাকে বলিতে বড় ইচ্ছা হয় মা! এ সমস্ত জগদ্ব্যাপার সবই তো তোমারই মায়া! তুমি যেমন মুক্তিদাত্রী মাতৃমূর্ত্তি রূপে ভক্ত প্রাণকে সুশীতল কর, তেমনি তুমিই তো এই মহা-মোহ-রূপিনী অনাদ্যা অবিদ্যা! হাঁ গো অলজ্যবীর্য্যে! যদি মায়ার পরপারে না যাইলে মুক্তি দিবেই না স্থির করিয়া থাক, তবে একবার তোমার পরম অনুরক্ত ঋষি-বাক্যের সার্থকতা কর।

"সং মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ।"

এই তো তাঁরা বলেছেন, তুমি প্রসন্না হলেই জীবের মুক্তি হয়; তবে তোমার সেই ভক্তাভয়দায়িনী, প্রসন্না দক্ষিণা-মূর্ত্তিকে একবার প্রকটিত কর মা! আর কেন মা! যথেষ্ট হয়েছে; এইবার একবার আবরণ উন্মোচন কর, চক্ষের ধন্দ—মনের সন্দ মিটিয়া যাক। তোমার ত্রিতাপহারিণী, শোক-তাপ নাশিনী, গণেশজননী মূর্ত্তি হেরিয়া আমাদের ভীতি-কম্পিত বক্ষ নির্ব্যাকুল হ'ক। একবার শরণাগত-জন অভয়-দায়িনী হইয়া অভয় নেত্রে চাহ মা! সমস্ত ভয়, সমস্ত শোক, সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত বিভেদ তোমার দৃষ্টিপাতে অমৃত হইয়া যাক্। তুমিই তো "শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণা" তবে আর কোথায় শরণ চাহিব মা! সমস্ত জগতের আধারভূতা চৈতন্যরূপিনী যে মা তুমি! সমস্ত বিদ্যা যে তোমারই বিভূতি! একবার সেই বিদ্যার আলোক জ্বালাইয়া দাও মা! যেন আমরা বুঝিতে পারি "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—এ তুমিই! তোমার মাতৃ-মূর্ত্তির বরণীয় ভাবে যেন বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে পারি এবং এইরূপে হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। আমরা যে হরিণ-নয়নীদের চঞ্চল কটাক্ষে ও কামাগ্নিতে প্রতিদিন জীবনকে বলি দিতেছি, একবার তোমার অপরূপ 'অরূপ' সত্ত্বায় 'সব' রূপ মিশাইয়া 'সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গল্য' মাতৃমূর্ত্তিকে প্রকাশিত কর; আমরা তোমার বরাভয়প্রদ মূর্ত্তি দেখিয়া বাঁচিয়া যাই। স্বর্গ অপবর্গ তুমি সবই দিতে পার তা জানি, লোকে তোমারই কৃপা-কটাক্ষে ঐশ্বর্য্যশক্তি লাভ করিতে পারে সত্য; কিন্তু মা গো, আর মুগ্ধ করিওনা, আর ছেলেকে লইয়া ছেলেখেলা করিওনা। আমি, তুমি, পর, আপনার সহস্র ভেদ আছে; স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, মুর্খ-জ্ঞানী, ধনী-দরিদ্রের শত পার্থক্য বর্ত্তমান আছে, একবার তোমার অভেদ ভাবে সব ভাবকে মিশাইয়া স্ব স্বরূপে দাড়াও মা! রণরঙ্গিনী, কত যুগ ধরিয়া কত যুদ্ধ করিলে মা, এইবার তোমার অসি কোষবদ্ধ কর! অসির কি প্রয়োজন মা! তুমিই তো সমস্ত জনগণের হৃদয়স্থিত বুদ্ধিরূপিনী! একবার আমাদের বুদ্ধির মধ্যে তোমার আবির্ভাবকে সম্ভব কর মা! তোমার স্পর্শে আমাদের সত্ত্ব-সংশুদ্ধি হইলে, তখন তোমাকে আর বিরক্ত করিব না। আমরা ভুল করিয়াছি, তাহাতে যে অপরাধ হইয়াছে তাহা মানি; কিন্তু সে ভ্রান্তি কার? সে মোহে আবদ্ধ করিতেও তুমি, সে মোহ-পাশ ছিন্ন করিতেও তুমি! এই যে "আমি আমি" আর "আমার আমার" করিয়া কেবলই ঘুরপাক খাইতেছি; একবার সেই মোহের নিদারুণ আবর্ত্ত থামাও মা! সকল বিশ্বের আদি জননী! সমস্ত বিশ্ব তোমারই

সন্তান, তবে আর আমাদের কে পর—কে আপনার? সকলেই যে আমরা এক,—এই একত্বকে বুঝিয়া যেন আমরা অভিমানকে খর্ব্ব করিতে পারি! গভীর মোহান্ধকারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, সমস্ত জগৎ আজ কুলাল-চক্রের মত বিঘূর্ণিত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। জন্ম-মৃত্যুর ভ্রম, সুখ-দুঃখের ভ্রম, স্ত্রী-পুরুষের ভ্রম আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এই মহোপসর্গ হইতে তুমি ভিন্ন আর কে পরিত্রাণ করিতে সমর্থা হইবে মা!

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং, বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশ বন্দ্যা ভবতী ভবায়, বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রাঃ॥

একবার তোর চারু-চরণে আমাদিগকে লুটাইয়া দে মা, আমরা ইচ্ছা করিলেই আর তো তোমাকে প্রণাম করিতে পারি না। শত জন্মের কত জঞ্জাল যে এ মাথায় পূর্ণ হইয়া আছে, বোঝার মত ভার—সে ভার লইয়া কি নত হওয়া যায় মা!

সুদীর্ঘ পন্থা, বহু ভার স্কন্ধে এ ভব ভ্রমণ করিয়া বড় ক্লান্ত হয়েছি মা! একবার তোর শ্রান্তিহরা তৃপ্তিভরা মুখখানি লইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও মা! আমি তোমার অমল কমল মুখখানি দেখিতে দেখিতে যেন আমাকে ও জগৎকে ভুলিয়া যাইতে পারি! বোঝার ভারে মাথা ফাটিয়া গেল যে মা! সে ভার নামাইয়া লইবার ভার তুমি ছাড়া আর কে লইবে বল? তোমার স্তন্য-পীযূষ ধারায় এই বুভুক্ষিত তৃষ্ণা-পিড়ীত চিত্তকে ক্লেশ মুক্ত করিয়া তোমার পাদাভি-বন্দনের অধিকার দাও মা! আমরা তখন সকল ভেদ ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিতে পারিব,—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদাভব॥

অন্য বর নয় মা! শুধু এই বর দাও, যেন আমরা জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পাই।
"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ।

"ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেন যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

মোক্ষ]

কৃপাময়।

অসীম তোমার দয়া কে বুঝিতে পারে ওহে।
নানারূপে, নানা ছন্দে, অন্তরে বাহিরে বহে॥
কত ভাবে দয়াময় ঝরে পড়ে তব স্নেহ।
তোমারি ত' দেওয়া প্রভু এই প্রাণ মন দেহ॥
মঙ্গল আশীষ তুমি ঢালিতেছ অনিবার।
কভু বা সুখের মাঝে, কভু দিয়ে শোকভার॥
হে দয়াল ভাবি যত, দয়ার কাহিনী শত।
অবিরল আঁখিধার ঝ'রে প'ড়ে অগণিত॥
ভেসে যায় এক মোর ওঠে হৃদি উথলিয়া।
তোমার প্রেমেতে নাথ সব বাধা ভাঙ্গি দিয়া॥

শ্রীমতী লীলা দেবী।

মোক্ষ]

মোক্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা গতবারে 'পুরুষ'-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। চৈতন্যের যে প্রবণতা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে খেলিয়া ও বিশিষ্ট ভাবে বস্তু প্রভৃতি ভোগ করিয়াও উহা সেই খেলার অতিগ ভাবে অবস্থান করে সেই 'পরা'-গতিকেই 'পুরুষ'-তত্ত্ব বলে। 'পরা' শব্দের এই অর্থ না করিয়া অনেকেই পুরুষকে প্রাকৃতিক ভাষায় বুঝিয়া মোহে আবদ্ধ হন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে 'উৎকর্ষ' শব্দেও এই অতিগ অর্থ আছে। কিন্তু ভেদভাবে অবস্থিত জীব শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়াও ভেদভাব ত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য 'উৎ' 'উৎকর্ষ' প্রভৃতি শব্দে ভেদাত্মক 'শ্রেষ্ঠত্ব' বুঝিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্টত্ব আপেক্ষিক শব্দ। দুইটী বস্তু সমজাতীয় না হইলে, একটিকে অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। এই সমজাতীয়ত্ব বা সমানাধিকরণ-বুদ্ধি না থাকিলে, আমরা যোগ বিয়োগ প্রভৃতি কোন ক্রিয়াই করিতে পারি না। দুইটী ঘোড়া হইতে একটী গরুকে বাদ দেওয়া যায় না; কিম্বা পাঁচটী মহিষে তিনটী ছাগল যোগ করা যায় না। তবে স্থূল-শরীরের সমাধিকরণ জ্ঞান দ্বারা আমরা বিভিন্ন জীবের তুলনা ও পরস্পরে সম্পর্ক সিদ্ধ করিতে পারি।

এইরূপে শক্তি বা চৈতন্যাংশ অবলম্বন করতঃ গজ ও মানবের বুদ্ধির তারতম্য করিতে পারি। সুতরাং বুঝা গেল যে প্রত্যেক বিশেষ ভাবের অন্তরালেই সমানাধিকরণত্ব বা শক্তিমত্ত্বা বা অন্য কোনও প্রকার সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন 'আম্র বুদ্ধি';—ঐ বুদ্ধি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উহা 'সামান্য, এবং 'বিশেষ' উভয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থ বা বস্তু মাত্রেই 'সামান্য ও বিশেষাত্মক'। 'সামান্য বিশেষাত্মনোঽর্থস্য' (পাতঞ্জল ১। সূ ৭ ব্যাস ভাষ্য)। আম্রত্ব, ফলত্ব, বস্তুত্ব এইগুলি আম্রের অবিশেষ বা সামান্য ভাব। আর বিশিষ্ট-ফল বুদ্ধিটি উহার বিশেষভাব। উভয় ভাবই ঘনরূপে মিশিয়া আছে বলিয়াই ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এই বিশেষ ও সামান্য ভাব আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

'ফলত্ব' 'বস্তুত্ব' প্রভৃতি বুদ্ধি যদি কোনও কৌশলে বিশেষাবলম্বনে আমাদিগের বুদ্ধি হইতে অপসৃত করা হয়, তাহা হইলে একটী আম প্রত্যক্ষ করতঃ কি জ্ঞান হয়, পাঠক! বলিতে পার কি? উহাতে 'কি—একটা—কিছু' বুদ্ধি থাকিবে বটে; কিন্তু আর কিছু বলিবার সামর্থ্য থাকিবে না। ঐ 'টা' ভাব লইয়া দেখিলে ঘোড়াটা, গরুটা ও আম্রটা সকলই একভাবে থাকিয়া যাইবে, পার্থক্য থাকিবে না। আম্র দর্শনে যে বিশেষ বুদ্ধি জাগরিত হয়, একটী অশ্ব দর্শনেও সেই বুদ্ধিই জাগিবে। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুই কি এক অভিনব বিশেষত্বের ইঙ্গিত প্রদর্শনের জন্যই আমাদিগের সমক্ষে 'টা'এর পরিচ্ছদে ক্রিয়া করিতেছে। এই বিশেষত্বে বিশেষ আছে—ভেদ নাই। ঐ বিশেষ ভাবটী কি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাত্মক ভাব হইতে পৃথক? না, এই বিশেষ ভাব আঁকিবার জন্যই ত' সর্ব্বাত্মক বা সামান্য ভাবগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আম্রটি মিষ্ট, সুগন্ধি। ফলরূপ জাতি-জ্ঞান দ্বারা আম্রটী সমগ্র ফলের সহিত এক হইয়াছে। 'বস্তুত্ব' বোধের দ্বারা সমস্ত জগৎ-বস্তুর সহিত এক হইয়াছে। এমন কি যে যতটা একত্ব জ্ঞান দেখিতে পায়, তাহাকে আমরা ততটা বিদ্বান বলিয়া মনে করি। অজ্ঞলোক আম্রের মিষ্টত্বকে ভেদজ্ঞানে উহার বিশেষ ভাব বলিয়া মনে করে; কিন্তু বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক উহার ভিতরে Saccharine 'সর্করা' তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই তত্ত্বের জন্যই ত মিষ্টতা! 'অজ্ঞ' এই বিশেষ ভাবটীকে সর্ব্বদাই অন্য বিশেষ হইতে সাবধানে পৃথক করিয়া আগুলাইতে থাকে। 'তাহার' বোম্বাই আম গাছের ফল এত মিষ্ট, যে রাম, শ্যাম, ও হরির গাছের ফল তত মিষ্ট নহে। হরির ফলটী বোম্বাই বটে, কিন্তু একটু খোসা পুরু; রামের

ফলের আঁটি একটু বড়, নগেনের ফলে একটু আঁশ মোটা। এইরূপভাবে ভাবিয়া সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া চেষ্টা করে, যেন 'তাহার' আম্রবুদ্ধিটী অন্য আম্রের সহিত সমান না হইয়া যায়। তাহার মৌলিক প্রবৃত্তি এই যে সেই মিষ্ট-রসটীকে সর্ব্বাত্মক করিতে গেলে, তাহার ভয় হয় বুঝি 'বিশেষ' সুখ-স্বরূপত্ব হারাইয়া যাইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দেখেন যে মিষ্ট রসটী ভেদভাবের নহে, উহা সর্ব্বাত্মক (Saccharine) শর্করা তত্ত্বের অস্তিত্বেরই প্রমাণ। ইহা দেখিয়াই তিনি পাথর ও কয়লা হইতে,—বিটপালম্ হইতে, এমন কি মানবের মূত্রাদি হইতে সম-রস মিষ্টত্ব উদ্ধৃত করতঃ একত্ব বুদ্ধিতে পরিতৃপ্ত হন। তাঁহার বিশেষ-বুদ্ধি সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির সহিত ঘন হইয়া মিশিয়া আছে। আমরাও সেইরূপ নিজের সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে সর্ব্বদা ভেদভাবে স্থাপিত করিয়া আগুলিয়া রাখি। আমার পুত্রটি তোমার পুত্রের সহিত অনেকটা সমান হইলেও তবুও একটু বিশেষ আছে। আমার পুত্র-বিয়োগ তোমার পুত্র-বিয়োগের সমান হইলেও, আমার পুত্র-বিয়োগে তবুও একটু বিশেষ আছে। আমরা ভুলিয়া যাই যে সেই 'বিশেষ' ভাবটী বিগত শেষ অর্থাৎ যাহাতে শেষ বা অন্তভাবও মিশিয়া যায়,—যাহাতে 'আদি অন্ত মধ্য' অতলে মিশিয়া যায়, সেই পরম বিশেষ শ্রীভগবানেরই জন্য। তিনি যে সর্ব্বদাই 'উৎ' বা 'পুরুষ' ভাবে অবস্থিতরূপে অবস্থিত থাকেন! সুতরাং ভাই ভক্ত তোমার এই মোহ কেন? কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও মহাদেব-তত্ত্বকে এক করিয়া বলে যে উহা এক ঘন সমরসেরই ব্যঞ্জনা, তাহা হইলে ভাই বৈষ্ণব! তোমার ভয় হয় কেন, বুঝি ভগবানের বিশেষত্ব হারাইয়া গেল? কেন ব্যস্ত হইয়া শিব-তত্ত্ব হইতে কৃষ্ণ-তত্ত্বের পার্থক্য স্থাপনের জন্য বুদ্ধি ও শাস্ত্রের আত্মকৃত্যের আয়োজন কর? কেন ভুলিয়া যাও যে যতই সমরস বা একত্ব ভাব আসুক না কেন, পুরুষ যে সর্ব্বদা উৎ রূপে খেলিবেই খেলিবে। কেন ভ্রান্তি বশে ভাব যে পুরুষের এই উৎ বা 'পরা' ভাব আমাদের মানব-সুলভ ভেদ ভাব হইতে উৎপন্ন? তিনি মদন-মোহন ত' বটেনই; মদনের সর্ব্ব বিমোহন ও পরাভাবও তাঁহার পরাভাবে ডুবিয়া মিশিয়া যায়। কিন্তু তিনি যে অপ্রাকৃত মদন-মোহন; তাঁহার বিশেষত্ব ত' প্রাকৃত ভেদ-ভাবের দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। অপরপক্ষে সেই প্রাকৃতিক ভেদের ভিতর যে পরিমাণে সমতা বা একত্ব দেখিতে পাইবে—সর্ব্বজীবে তাহার সমরূপ অধিষ্ঠান যখনই দেখিতে পাইয়া তোমার ছিন্ন 'বহুজীব' জ্ঞানটী কৃষ্ণাধিষ্ঠান রূপ সমজ্ঞানে যখন মিশিয়া যাইবে, তখনই ত' বৈজ্ঞানিক শর্করাতত্ত্বের ন্যায় তাঁহার আনন্দময়ত্ব সপ্রমাণিত হইবে।

ভাই! তোমার ভগবানকে আগুলিবার আবশ্যক নাই। তিনি যে স্বপ্রকাশ ও স্বভাব-সিদ্ধ; তিনি সাধনায় প্রকাশিত হইলেও সাধনার জন্য-ফল নহেন। তোমার জন্য-জ্ঞান এখনও দূর হয় নাই বলিয়াই, তোমায় সম্প্রদায়িক ভাবের সংস্কারগুলি উঠে। জন্য-জ্ঞান দূর হইয়া গেলে, তখন তুমি 'সর্ব্ব' ও 'জ্ঞ' উভয় তত্ত্বেই একই রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তখন আর ভেদ ভাবে 'মহাপ্রভুর' বিশেষত্ব, 'খ্রীষ্টের' অমানুষত্ব, 'শঙ্করের' যোগ, প্রভৃতি স্থাপনা করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। প্রকৃতির 'বস্তু'গুলি এক না হইলেও 'রূপ' হয় না। ভাগবতে উক্ত 'ব্রহ্মার মোহ নাশ' অধ্যায়টী বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই তত্ত্বই দেখিতে পাইব।

ভাগবতে আছে যে, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, যাঁহাকে যোগবাশিষ্টে 'আকাশজ পুরুষ' বলে ও যিনি শুদ্ধ আকাশ-তত্ত্ব এবং তাহাতে অভিব্যক্ত 'অহং স'—'আমি সেই'—এই মহাভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন বলিয়া শাস্ত্রে হংস-বাহন রূপে অভিহিত হয়েন,—তিনি মায়াক্ষেত্রে অভিব্যক্ত ভগবানের মহিমা আর একটু বুঝিবার জন্য মায়ার বশে গোপ ও গো সকলকে অন্তর্হিত করিয়া লইলেন। এখানে ব্রহ্মার চৈতন্য এবং জ্ঞানী বা ভক্তের চৈতন্যের পার্থক্য একটু বুঝা আবশ্যক। ব্রহ্মার চৈতন্য শুদ্ধ স্বপ্রকাশ, ও সৃষ্ট বস্তু প্রভৃতির দ্বারা অবাধ্য 'অহং'-প্রত্যয় রূপ। সেই অহংটীকে অবস্থিত হইয়া তাহার পরাগতি রূপ 'স' ভাবের সহিত একীকরণ সমাধান করাই ব্রহ্মার প্রবৃত্তি। যেমন আজ কালের সম্রান্ত বংশোদ্ভব অথচ দুর্দ্দশাগ্রস্থ ভদ্র সন্তান, সর্ব্বদাই 'আমি অমুকের পৌত্র' ইত্যাদি স্মৃতির সাহায্যে নিজের 'আমিটীকে' বংশগত ভাবের সহিত এক করিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ ব্রহ্মাও আপনাকে শুদ্ধ ও বিশিষ্ট 'অহং' বলিয়া জানিয়া, সেই 'অহং'এর ভিতর ভগবানের 'পরা' ও 'সর্ব্বাত্মিকা' ভাবের ছায়া দেখিতে পান নাই। শুদ্ধ 'অহং' তত্ত্ব গীতার উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার প্রকটিত হয়। উহা বৃত্তি প্রভৃতির অতিগ, নিষ্কল ও স্বপ্রকাশ। কিন্তু উহাতে 'পরা' প্রবৃত্তি নাই বলিয়া উহাতে কোনরূপ ভাগবৎ-কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অনেকে এই 'আমি' লাভকেই 'মোক্ষ' বলিয়া ভাবেন। কিন্তু উহা সত্য নহে; স্থিত-প্রজ্ঞের 'আমির' দৃশ্য বা ক্ষেত্র থাকে, তখনও বাহিরের খেলা এবং 'আমিটী' সেই খেলার দ্রষ্টারূপে থাকে। সেইজন্য ভাগবত বলেন, যে এইরূপে শুদ্ধ 'আমি' ভাবে সিদ্ধ বা 'আত্মারাম' এবং নির্ব্বিকারীও দ্রষ্টারূপে অবস্থিত,—সুতরাং 'মুনি'গণ অহঙ্কারের গ্রন্থি-শূন্য হইলেও এবং বাহ্যভাবে বস্তু ক্রিয়া প্রভৃতিরূপে প্রকাশিত খেলার

দ্রষ্টা হইয়া অবস্থিত হইলেও, তাঁহারা ভগবৎ-তত্ত্বে অসিদ্ধ। কারণ তাঁহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে 'আমি'রূপে 'পরা'গতিটী শ্রীভগবানেই পরিসমাপ্ত, 'সর্ব্ব'রূপে অবস্থিত বহিরের খেলাটীও ভগবানের 'সর্ব্বাত্মিকা' ভাব প্রকট করিবার জন্যই আছে। এইজন্য 'পুরুষ'-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ অববোধ হইলেও, শ্রীভগবানই যে একমাত্র পুরুষ, এই বোধ না হওয়াতে সেই নির্গ্রন্থ মুনিগণও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাপি উরুক্রমেঃ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকী ভক্তিম্ ইত্থ্যম্ভূত গুণঃ হরেঃ॥"

ব্রহ্মার 'আমি'টীও ঐরূপ। তাঁহার 'অহং' ভাব সিদ্ধ হইয়াছে; সেই জন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহারই 'অহং' প্রকাশ-ক্ষেত্রে প্রথম ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু 'অহং'এ ভগবৎ-বোধ হয় নাই বলিয়া, ও 'সর্ব্ব'ভাব যে ভগবানেরই মায়া ইহারও অববোধ না হওয়াতে, সেই নির্ম্মল ব্রহ্মার 'আমি'টীও প্রকাশিত হইয়া 'আমি কে ও কেন সৃষ্ট হইয়াছি'; ইহা বুঝিতে পারিলেন না; এবং অবশেষে "তপস্যা কর" এই অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বাহ্য সৃষ্টির অভিমুখী প্রবৃত্তিগুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্দ, নবম অধ্যায়ে এই বিষয়টী উক্ত হইয়াছে। ভগবান তখন ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন,—

"জ্ঞানং পরম গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহানগদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যাহম॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥৩০।৩১।৩২।৩৩॥

ভগবান কহিলেন,—'ব্রহ্মন্! মদ্বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তি অতি গুহ্য। তথাপি সাধনের সহিত সেই সমুদায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার যেরূপ স্বরূপ, স্বত্ব, রূপ, গুণ এবং কর্ম্ম,—তুমি আমার অনুগ্রহে সে সমুদায়ই উত্তমরূপে জানিতে পারিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। যাহা বাস্তব অর্থ বা বস্তু না হইলেও বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, এবং যাহা বাস্তব

হইলেও প্রতীত হয় না; তাহাও আমার আত্মারূপ অধিষ্ঠানেই হইয়া থাকে; উহাই আমার মায়া বলিয়া জানিবে! তাহাতে আভাস ও তমঃ এই দুই ভাবই আছে।'

ব্রহ্মার উপদেশে ভগবান দুইটী কথা বলিলেন;—একটী 'যাবানহম্' বা আমি যেরূপ যেরূপ বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হই; "যথাভাব" অর্থাৎ যেরূপ যেরূপ সত্ত্বাবান এবং "যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ" অর্থাৎ যেরূপ রূপ, গুণ, কর্ম্ম লইয়া প্রকাশিত হই;—এইটীকে প্রকাশ-ভাব বলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন গুণ কর্ম্মে, ভগবান বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন। সমস্ত জগদ্বস্তুর ভিতর ভগবানের 'যাবান্' বা 'মাত্রা' অংশ ও তাঁহার গুণকর্ম্ম প্রভৃতি না বুঝিলে, ভগবৎ-অধিষ্ঠানেস্থিত হইয়া, ব্রহ্মা পুনরায় নাম রূপাত্মক জগতে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। তারপর এই প্রকাশের মূলে যে একমাত্র স্বরূপ-তত্ত্বের প্রকাশ আছে ও তাঁহারই সেই শুদ্ধ 'অহম্' যে সকল বস্তু 'অগ্রে' বা কারণ রূপে, 'পশ্চাতে' বা কার্য্য রূপে এবং 'অবশেষে' বা শুদ্ধ স্বরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া আছেন, এই দ্বিতীয় তত্ত্বটী বুঝিতে বলিলেন। এই দুইটী তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই যেন দশম অধ্যায়ে গো ও গোপবালকগণের হরণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। (ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ ভট্টাচার্য্যস্য

মোক্ষ]

মহাপূজা।

ওঁ নমো শ্রীগুরবে। আমরা গত দুই বৎসরে মহামায়া দেবীর তিনটী লীলা সামান্য ভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এইবারে সেই লীলা আর একটু বিশেষ ভাবে বুঝিতে ইচ্ছা আছে। যে ভাবে বুঝিলে, তাঁহার কৃপা মানব-জীবনে প্রতিভাত হয়, এইবার আমরা সেই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করিব। ওঁ তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

অনেকেই মহিষাসুর-বধ চরিত্রটী জগতের ইতিহাসের একটী বহু পুরাতন ঘটনা বলিয়া জানেন। শাস্ত্রোক্ত ঘটনাগুলি যে কেবল শুষ্ক ইতিহাস নহে, শাস্ত্রও যে ঐ সকলের মধ্য দিয়া মানবের জীবনে নিত্য সংঘটিত, ঘটনা, শক্তি ও তত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা ভুলিয়া আমাদের জীবনে মহাপূজার নিত্য আবশ্যকতাটী বিস্মৃত হই। ঐ ইতিহাস কথা বলিবার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যকতা

নাই। শাস্ত্র কেবল স্থূল লইয়া খেলা করেন না, পরন্তু প্রতি-ছত্রে, যে সকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষের অতিগ ও যাহা না বুঝিলে মানবের পরমার্থ তত্ত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

মহিষাসুর-বধে যে নিত্য সত্য তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, ঐ তত্ত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে মহিষাসুর-বিনাশিনী দেবীর আবাহন কেন? "শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে বাঁকা, থাকুন্ তিনি পটেই আঁকা" সেই রকম অতীতের একটী-চিত্রাঙ্কনের জন্যই কি বঙ্গদেশ আজ এত আনন্দের স্রোতে নিমজ্জিত? সকলের প্রাণের অন্তরা'ল আশার অস্ফুটবাণী জাগিতেছে যে, যাহা একদিন কল্পারম্ভে সৃষ্টির প্রাক্কালে হইয়াছিল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে হইতে পারে। সুধু স্মৃতি-বলে বলীয়ান্ হইয়াই সাধক এ পূজায় অগ্রসর হয় কি? না, তাহার প্রাণে মহাপূজার অন্তরালস্থ চির-পুরাতন অথচ নিত্য-নূতন তত্ত্বের স্ফূরণ হয় বলিয়াই আজ তাহার এত আনন্দ!! ইতিহাসের ছবি লইয়াই কি হিন্দু-গৃহস্থ আজ মহামায়ার আবাহনে সচেষ্ট হইতেছে? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিতে ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু উহা ব্যাখ্যা মাত্র; উহা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মহামায়া নিত্যা, তাহার লীলাও নিত্য—শাশ্বত।

পাঠক! তোমার ভিতরে নিত্য প্রতিষ্ঠিত মহিষাসুরকে কি দেখিতে পাইয়াছ? এমন কি তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি কখনও সন্দিহান হইয়াছ? যদি কখনও অনুসন্ধান করিয়া থাক, তবেই দ্বিতীয় চরিত্রের রহস্য সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে আমরা বলিয়াছি যে, সুষুম্না-ক্ষেত্রে বা পথে তিনটী গ্রন্থি আছে। ঐ তিনটী গ্রন্থি ভগবৎ-চৈতন্যের প্রকাশের তিনটী মূল ভাবের সহিত সম্বন্ধ। ব্রহ্মার ভিতর দিয়া প্রকাশিত 'ব্রাহ্মী' চৈতন্যের, বিষ্ণু ভাবে প্রকাশিত 'বৈষ্ণবী' চৈতন্যের ও শিবভাবে প্রকাশিত 'শাম্ভবী' চৈতন্যের প্রকাশ, অহংকারের ক্ষেত্রে তিনটী গ্রন্থিযুক্ত হইয়া যায়। উহা ভেদাত্মক অহঙ্কারের আসুরী মায়ার ফল। ঐ গ্রন্থিগুলি ময়দানব নির্ম্মিত লৌহ, রৌপ্য ও সুবর্ণময় তিনটী পুর বলিয়া শাস্ত্রে অন্যত্র অভিহিত হয়। ব্রাহ্মী-ভাবের যে মোহ-গ্রন্থি আছে, তাহা মহাকালী ও বৈষ্ণব ভাবের মোহ, মহালক্ষ্মীর কৃপায় ছিন্ন করা যায়, ও তৃতীয় গ্রন্থিটী মহা-সরস্বতীর কৃপায় ধ্বংস হয়।

মোহ-গ্রন্থিগুলি কেন? সে অনেক দূরের কথা। তবে আজ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উপনিষদে উক্ত আছে যে অসুরেরা একে একে প্রাণ

মন আদি সমস্ত দুষ্ট করিল ; কেবল মুখ্য প্রাণকে দুষ্ট করিতে পারিল না। বিশিষ্টতামূলক অহঙ্কারের প্রকৃত গতি না বুঝিতে পারিলে, এই মোহ-গ্রন্থিগুলি উৎপন্ন হইবেই হইবে।

মহিষাসুর বৈষ্ণব-গ্রন্থির মোহ। বিষ্ণু-শক্তিকে ভেদাত্মক বিশিষ্টতা বশে প্রয়োগ করিলে,—সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তিকে কামনার বশ করিলে,—সেই ভেদাত্মক কামনার ফলে প্রতিনিয়ত মহিষাসুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তত্ত্বটি বুঝিতে গেলে, বৈষ্ণবী শক্তির প্রধান ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তারপর সেই ভাবকে বিশিষ্টতা দ্বারা কবলিত করিলে কি মোহের উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত আছে যে, লোক সৃজনেচ্ছায় সৃষ্ট তত্ত্বগুলি পরস্পর মিশিতে পারিল না, অবশেষে তাহারা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল,—

> তৎ তে বয়ং লোক সিসৃক্ষয়াদ্য ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম।
> সর্ব্বে বিযুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং ন শক্নুমস্তৎ প্রতিহর্ত্তবে তে॥
> যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে, যথাবয়ঞ্চান্নমদাম যত্র।
> যথোভয়েষাং ত ইমেহি লোকা বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ॥৩।৫।৪৮।৪৯।

'হে আত্ম' আমরা তোমারই, আমাদিগে তোমার 'আমি'ই প্রকাশিত হইবার কথা ; কিন্তু সত্ত্বাদি তিন স্বভাবে, তোমার ব্রহ্মা-মূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায়, আমরা প্রত্যেকে ছোট ছোট 'আমির' অভিব্যক্তির স্থান হইয়াছি। আকাশের 'আমিটী' বায়ুর 'আমির' সহিত মিশে না। চক্ষুর 'আমিটী' কর্ণের সহিত মিশে না। এই পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব নিবন্ধন আমরা কোনও প্রকারেই একীভূত হইতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে উৎপাদিত হইয়াছি বলিয়াই মিশিতে পারি নাই ; "ক্রমেণোৎপাদিতাঃ ত্রিভিরাত্মভিঃ সত্ত্বাদিভিঃ স্বভাবৈঃ।" শ্রীধর। সুতরাং তোমার বিহারোপযোগী,—তোমার 'আমি'টী যাহাতে ফুটিয়া উঠে, এমন দেহটী গড়িতে পারিলাম না। অতএব "ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা"—তুমি তোমার স্বীয় জ্ঞান শক্তিসহ আমাদিগকে দেও। হে অজ! তাহা হইলে যাহাতে আমরা তোমাকে সমস্ত ভোগ্য সমর্পণ করিতে পারি ও তাহার সঙ্গে আমাদিগেরও অন্ন-ভোজনের সামর্থ্য হয় ; এবং যেখানে থাকিয়া জীব তোমার ও আমাদের ভোগ্যবস্তু আহরণ করতঃ আপন আপন অন্নে সিদ্ধ করিতে পারে, এমন জ্ঞান দেও।"

সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের শক্তি ও চক্ষুর আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে এই

বলা যাইতে পারে যে, এই বিশ্ব কেবল তাঁহাকেই দেখাইবার জন্য ; এবং তিনিই ইহার একমাত্র ভোক্তা, দ্রষ্টা, গতি ও সাক্ষী। সুতরাং তাঁহার ভাবে ভাবিত না হইলে, এই বিশ্ব দ্বারা তাঁহার লক্ষণারূপ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। যাহার দেহ বা অভিব্যক্তি আবশ্যক, তদনুগত ভাবেই কার্য্য-ভূত তত্ত্বগুলি এক না করিলে, তত্ত্বগুলি মিশিতে পারে না। এইজন্য প্রেতাদির আবেশ-তত্ত্বে দেখা যায় যে, আবিষ্ট ব্যক্তির শরীরাদিও ক্ষুব্ধ করিয়া, তত্ত্বগুলিকে আবেশ-কর্ত্তার সহিত সমভাবে আনিতে না পারিলে, সেই দেহের সাহায্যে আবেশ-কর্ত্তার প্রকাশ হইতে পারে না। তত্ত্বগুলিকে এই প্রকারে অনুপ্রাণিত করাকে 'অনুগ্রহ' বলে। 'যদনুগ্রহতো যস্যানুপ্রবেশেন লব্ধ সামর্থ্যা সন্তঃ' ইতি শ্রীধরঃ। দ্বিতীয় কথা এই যে, তত্ত্বগুলি ক্রমে ক্রমে ও বিভিন্ন ভাবের বশে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। ব্রহ্মা সৃষ্ট হইয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তৎপরে তপস্যা দ্বারা পূর্ব্ব-স্মৃতি লাভ করতঃ "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" পূর্ব্বের ন্যায় সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে দুইটী দোষ উৎপন্ন হইল। তাঁহার জ্ঞানে 'অবশেষামৃতম্' ঘন, এক-রস ভগবদ্ভাব পরিস্ফুট ছিল না। কারণ তিনি বিশিষ্ট কর্ত্তা-বোধে ভাবিত হইয়া সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন। সৃষ্টি ও লয়ের মূলে তত্ত্ব সমূহের ভিতরে যে এক পরম আনন্দ-ঘন তত্ত্ব বিরাজমান আছে, তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হয়েন নাই। তাহার অভ্যন্তরে পূর্ব্ব-কল্পের পূর্ব্ব ভাবে পুনরায় প্রবুদ্ধ আকাশতত্ত্বের জ্ঞান ও স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইল ; এই স্মৃতি ইচ্ছা শক্তির সহিত মিলিত হইয়া বাহিরে আকাশ সৃষ্টি করিল। তাঁহার ভিতর বাহ্য বোধ আছে বলিয়াই, বাহিরে সৃষ্টি হইল। এই প্রকারে অগ্নি, বায়ু আদি তত্ত্বগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইল। কারণ ব্রহ্মা তত্ত্ব সকলের মূলভূত এক-ভাবে দিলেন না ও কালের ক্রমানুসারে সৃষ্টি করিলেন. এই ব্রহ্মাই বাইবেল শাস্ত্রের পুরাতন-ভাগের পাশ্চাত্য ঈশ্বর। God said "let there be light" there was light ; God said "let there be water" and there was water. এই জন্য পুরাণ শাস্ত্রেও ব্রহ্মার সৃষ্টিকে অবিদ্যাসৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাঁহার সৃষ্ট তত্ত্বগুলির মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট অহং-জ্ঞানের রস থাকিয়া যায় ; তত্ত্বনিচয় কেবলই তাহার পূর্ব্ব কল্পানুভূত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ; নূতন কল্পের, নূতন জীবের, নূতন ভাবের উপযোগিতা, এইরূপে সৃষ্ট তত্ত্বে আসিতে পারে না। ব্রহ্মার বিশিষ্ট 'আমির' রস-প্রবণতাকে 'মধু' বলে ; এবং পূর্ব্ব কল্পের বিশিষ্ট ভাবের সৃষ্টি-ক্রমের প্রতিষ্ঠাকে 'কৈটভ' বা 'কৈতব' বলে। সেই জন্য

এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া দূরীভূত করিবার জন্য প্রথমে মহাকালীরূপা ভগবচ্চৈতন্যের অনুপ্রবেশ আবশ্যক।

কালসংজ্ঞাং তদা দেবীম্ বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।

ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥ ভাগ ৩।৬।২।

মহাকালীর কৃপা না হইলে কি ব্রহ্মাণ্ডে,—কি জীবে তত্ত্ব-সমূহ পরস্পর মিশিতে পারে না। এই কথা আগামী বারে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কালশক্তির অনুপ্রবেশ হইলেই, উপাধি প্রস্তুত হয় না। কারণ মহাকালীর 'কলন ঘন একরূপ! সেই জন্য পুনরায় ভগবান বিষ্ণুরূপে অনু-প্রবেশ না করিলে, তত্ত্বগণের সুপ্ত কর্ম্ম সকল না জাগাইয়া দিলে, তদ্দ্বারা দেহ ও উপাধি প্রস্তুত হইতে পারে না। কালশক্তি বশে স্মৃতিগুলি আমাদিগের ভিতর জাগিয়া উঠিলে, ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। জীব শুদ্ধ দ্রষ্টা হইয়া স্মৃতিগুলিকে দেখিতে থাকেন। কালের ক্রমানুসারে আমরা বাল্যকালের ঘটনা-সমূহ দেখিতে পারি; কিন্তু তাহাতে কর্ম্ম-প্রবণতা জাগে না। ঘটনা-গুলিকে পরস্পর সংহত করিলে, তাহারা মিশিয়া উপাধির সৃষ্টি করিতে পারে। স্মৃতি নিচয়ের মধ্যে কর্ম্মের প্রবণতা Co-ordination উদ্বুদ্ধ না হইলে, তদ্দ্বারা কর্ম্মের অধিষ্ঠান-ভূত দেহ প্রস্তুত হয় না। সে জন্য মহাকালী ও তাঁহার তনয় গণপতির অনুপ্রবেশ দ্বারা কথঞ্চিত একীকৃত গণনিচয়ে ভগবানের বৈষ্ণবী-শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইল। গণসমূহ স্ব স্ব ক্রিয়াশীলতা ও সংযোজন-শীলতা লাভ করিল! 'অংশ' বা মাত্রার সাহায্যে পরম পুরুষ পরাভাবে প্রবেশ করিবার পর, তত্ত্বগুলি কর্ম্মাংশেও পরস্পরের সহিত পরস্পরে মিলিয়া অণ্ড-সৃজনে সামর্থ্য লাভ করিল। তা'ই ভাগবৎ বলিলেন—

সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টা রূপেণ তং গণম।

ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্॥ ৩।

প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ।

প্রেরিতোঽজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপুরুষম্॥ ৪।

পরেণ বিশতা স্বস্মিণ মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্‌গণঃ।

চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিল্লোকাশ্চরাচরাং॥ ৫। ভাগবৎ ৩।৬

ভগবান চেষ্টারূপে সেই গণসমূহে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন বা অংশ বলে ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট-তত্ত্বগুলি সংযুক্ত করিলেন ও তাহাদের সুপ্ত কর্ম্মগুলি অর্থাৎ পরস্পরে মিশিবার শক্তি সমূহ জাগরিত করিলেন। গণসমূহ এইরূপে প্রবুদ্ধ-কর্ম্মা হইয়া

দৈব বা সদা স্বপ্রকাশ ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্ব স্ব মাত্রা সাহায্যে অধিপুরুষ বা বিরাট দেহ নির্ম্মাণ করিল। অগ্রে অকৃতকার্য্য হওয়ার কারণ এই যে, তাহারা ভিন্ন বা আংশিক অহং-ভাবে সমুৎপন্ন। এক্ষণে তাহারা সেই 'পর' (transcendent বিশ্বাতিগ অথচ বিশ্বাত্ম ও বিশ্ববীজ শ্রীভগবানের যোগিণী-শক্তি দ্বারা আবিষ্ট হওয়াতে প্রত্যেকেরই অভ্যন্তরে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার জ্ঞানের অতীত পরাভাবের বীজ সমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল ও তাহাতে তত্ত্বসমূহ ক্ষুব্ধ হইল। যেমন বিভিন্ন গাভীর বিভিন্ন স্বাদযুক্ত দুগ্ধ ক্ষোভিত হইয়া যে নবনীত উৎপাদিত হয়, উহা পরস্পরে অনায়াসে মিশ্রিত হইতে পারে,—তদ্রূপ ভিন্ন তত্ত্ব সমূহের অভ্যন্তরে পরাভাবের বীজ জাগ্রত হইয়া উঠিলে সেই তত্ত্বসমূহ মিশ্রিত হইবার সমর্থ লাভ করিল।

কথাটা আর একটু অনুধারণ পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে, কারণ ইহার উপরে শ্রীভগবানের মহালক্ষ্মী ভাববিলাস পরিস্থাপিত। অনেকেই মনে করেন যে দুইটী চক্ষু, দুটী কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র সমূহকে কোনও ক্রমে একত্রিত করিয়া,— 'এলোপ্যাথিক ডাক্তারের মত' Mft. Mix. Shake the bottle বলিলেই দেহ গঠিত হইল। এই ভ্রান্তি চিকিৎসা-শাস্ত্রেও রহিয়াছে। চক্ষুতে রোগ হইলে ঔষধ প্রলেপ করিলেই আরোগ্য হইবে, ইহা চিকিৎসকেরও বিশ্বাস। তাহা হইলে ত' মৃতদেহের চক্ষে প্রলেপ দিলেও, চক্ষু দৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারে। আধুনিক যোগী সম্প্রদায়ের শিক্ষাও এই ভ্রান্তি দ্বারা কলুষিত হইতেছে। তাঁহারাও খানিকটা প্রণায়াম, কতকটা ভূতশুদ্ধি, সামান্ত জপ, বাকীটা আসনাদি ছিন্ন ভাবে সাধন করিয়াই, সেই পরম একের আভাস পাইতে চাহেন। সে যাহা হউক তত্ত্ব সমূহের দুইটী ভাব আছে। উহারা অঙ্কশাস্ত্রোল্লিখিত ভগ্নাংশের ন্যায় 'বাচ্য' ও 'বাচক' (Numerator ও Dinominotor) লইয়া থাকে। আকাশ-তত্ত্ব শব্দের ইঙ্গিত করে; ইহা উহার বাচ্য বা numerator। আবার আকাশ-তত্ত্বে ভগবানের সর্ব্বাধিকরণ রূপ মহাভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; ইহা তাহার Dinominator বা 'বাচক'। প্রত্যেক মানবও এইরূপ একটী ভগ্নাংশ;—বাস্তবিকই "মমৈবাংশ"। তাহার প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তার ভিতর দিয়া যে ক্ষুদ্র অহং ভাবটী জাগিয়া উঠে, তাহার বাচ্য বা (numerator) ভাব। এই 'বাচ্য'ভাব ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি সামান্ত সর্ব্বাত্মক (universal) ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব গুলি বিশিষ্টকে দেখায় না। উহার সর্ব্বদা অন্তরালাবস্থিত, সর্ব্বাত্মিকা মহাভাবে থেলে। রাম, শ্যাম, ও হরি তিনজনেই একটী সুন্দরী রমণীকে দর্শন করিল। রাম কামুক; সুতরাং এই দর্শনে তাহার ভিতরে তাহার বিশিষ্ট 'আমির' বিশিষ্ট ভোগলিপ্সা প্রবুদ্ধ হইয়া

উঠিল। হরি শিক্ষিত কবি ও ভাবুক ; হরি সেই রমণীর ভিতর দিয়া প্রতিভাত সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করতঃ সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া দেখিতে পাইল যে, চন্দ্রমা, মলয়ানিল প্রভৃতিতে পূর্ব্বে সে যে সৌন্দর্য্যের ভাব উপলব্ধি করিয়াছে, এই রমণী মূর্ত্তিতেও সেই সৌন্দর্য্যই বিকাশ হইতেছে। সে দেখিতে পাইল, যেন চন্দ্রমার কান্তি ছিন্ন হইয়া ঐ রমণী-মূর্ত্তির নখরাজির কিরণে প্রতিভাত হইতেছে ; উহার নিশ্বাসে মধুময় পরিমলবাহী মলয় পবন প্রবাহিত হইতেছে। উহার প্রত্যেক অঙ্গের সৌন্দর্য্য এই বিশাল বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থের সহিত সমন্বিত। যে বিশিষ্ট আধারে বিশ্বকে সমন্বিত করিয়া দেখিতে পারে, সেই ত' কবি !! কবির লেখনী-প্রসূত বিদ্যাসুন্দরের অতুলনীয় বিদ্যার চিত্রটী দর্শন করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ছিন্নে ও সর্ব্বে একই সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি না হইলে, তাহা লইয়া কবি সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি গঠিত করিতে পারেন না। কোথায় ফণী আর কোথায় বেণী,—কোথায় ঢল ঢল সুধায় অংশুমালার আধার চন্দ্রমা, আর কোথায় পদ-প্রান্তাবলম্বী নখ-নিকর! কোথায় মৃগমদ আর কোথায় অপাঙ্গ প্রান্তে প্রতিভাসিত অমৃতের ইঙ্গিত ! অথচ কবি সেই বিশ্লিষ্ট-প্রায় বস্তুতে কি একরূপ সৌন্দর্য্য তত্ত্ব বুঝিয়া বলিলেন,—

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ॥
কেড়ে নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কি চাঁদ মৃগ নিয়ে কোলে ॥

প্রকৃতই ভারতচন্দ্র ত' সেই চির-সুন্দরের প্রতি সদানুরক্তা মহাবিদ্যার চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

তারপর শ্যাম, মহামায়ার ভক্ত। তিনি রমণীরূপের প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবে কেবল সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তৃপ্ত নহেন তাঁহার চক্ষে সমস্ত ঘনীভূত হইয়া সেই মহামায়ার ভাবাই ইঙ্গিত করিতেছে। এই ভাবেই মহামায়ার রূপ বর্ণিত। তাহা না হইলে কোন্ ভক্ত মহামায়ার ধ্যান করিতে যাইয়া তাঁহাকে "পীনোন্নত পয়োধরাং" 'নিতম্বসদৃশো ভূবি' ইত্যাদি ভাবিতে সাহস করিতে পারে ? জননীর যৌবন-বিভূষিত নগ্ন মূর্ত্তির সম্মুখীন হইবার স্পর্দ্ধা রাখে, আর কেই বা কাম ও কামনার পরিসমাপ্তিরূপ ভগবানকে চিন্তা করিতে যাইয়া

"গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং" বলিয়া ভাবিতে সক্ষম হয়। পরন্তু প্রত্যেক তত্ত্ব, প্রত্যেক বস্তুই পরাভাবে আমাদিগের চিত্তকে শ্রীভগবানের সম্মুখীন করিতে সক্ষম। $\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৫}+\frac{১}{৬}$ এই কয়টী ভগ্নাংশকে যোগ করিতে হইলে, গায়ের জোরে "মিশে যা" বলিলেই উহা মিশিয়া যাইবে না। প্রত্যেকের সমান-অধিকরণ স্বরূপ (greatest common measure) গরিষ্ঠ, সাধারণ, গুণনীয়ককে জানিতে হইবে। সে যে বাস্তবিকই গরিষ্ঠ, বাস্তবিকই সাধারণ, বাস্তবিকই গুণ সমূহের নিয়ামক ও গুণ সমূহের অতীত। এই ভাবে দেখিলে $\frac{১}{২}$টী সেই সামান্যরূপী গুণনীয় ৬০এর ত্রিংশাংশ মাত্র ; সে আর আপনার বিশিষ্ট একককে দেখাইতে চাহেনা। সে তখন বাস্তবিকই "মমৈবাংশ" হইয়া গেল। এইরূপে সামান্য ও পর ষষ্ঠী (৬০) সংখ্যা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সংখ্যা-সমূহ রূপান্তরিত হইয়া $\frac{৩০}{৬০}+\frac{২০}{৬০}+\frac{১৫}{৬০}+\frac{১২}{৬০}+\frac{১০}{৬০}$ হইল। তখন তাহারা পরস্পরে মিশিতে সমর্থ হয়। তজ্জন্যই শ্রীভগবান, জীবের ভিতর মহাযোগিনী শক্তির আবির্ভাবকল্পে বলিলেন 'যে বিশিষ্ট আমির জন্য আর চেষ্টা করিও না। যাহাই কেন কর না, তাহাই আমার পরাভাবে অর্পিত হইয়া কর।' ইহাই গীতায়—"যৎকরোসি যদশ্নাসি' মন্ত্র। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল,—

মধ্যেব মন আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়ঃ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।

ইহাই শিব-প্রমুখ দেবতাগণের তেজ ও তদ্দ্বারা মহামায়ার মূর্ত্তি গঠন।

ইহাই ভূতশুদ্ধির মন্ত্র। ইংরাজীতে বলে Take care of the small things in life, the greater things will take care of themselves. জীবনের ছোট ব্যাপার গুলি মহাভাবে সংসাধিত হইলে, সমগ্র জীবনই সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যায়। তা'ই সাধক 'সোহং ইতি বিচিন্ত্য' আপনাকে ভগবানের ভগ্নাংশরূপে বুঝিতে পারিয়া, জীবনের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত তত্ত্ব-সমূহের ভিতরে ভগবানের ভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। তখন কামে কাম-পতি, প্রাণে প্রাণেশ্বর, ইন্দ্রিয়ে হৃষীকেশকে প্রত্যক্ষ করতঃ তত্ত্বনিচয় যে তাঁহারই ব্যঞ্জন (Denominator) তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের অভ্যন্তরে তদীয় বিশিষ্ট 'আমি'র অংশ ন্যাস করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার ক্ষুদ্রতম এক 'আমিটি' শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতায় অসীম হইয়া যায়। কারণ $\frac{১}{০}=\infty$ বা অসীমতা = ইহা অঙ্কশাস্ত্রের উপদেশ।

তারপর সাধক স্বীয় ছিন্ন অহঙ্কারের অধিকার হইতে পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় ও

তত্ত্বসমূহকে পরাভাবে—"এই চক্ষু তোমার চক্ষু," "এই কর্ণ, তোমার কর্ণ," 'এই কর, তোমার কর,' 'এই চরণ, তোমার চরণ' ও সর্ব্বশেষে "এই হৃদয় তোমার হৃদয়' স্বরূপে উপলব্ধি করতঃ যখন প্রতিমার হৃদয়-দেশ স্পর্শ করে, তখনই মহাযোগিনী মহামায়া অভিব্যক্তা হয়েন। তা'ই—শাস্ত্র বলিলেন,—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং।
একস্থং তদভুন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং ত্বিষা। চণ্ডী

এজন্যই বুঝি সর্ব্বতীর্থের জলে, সর্ব্বভাবের পৃথী এমন কি বেশ্যা-দ্বারের মৃত্তিকা, সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদ ও ফলের সারাংশ, মহামায়ার পূজায় আবশ্যক হয়। এই সলিল-রস সংগ্রহই ত' আবার সন্ধ্যার মন্ত্রে 'শন্ন আপঃ ধন্বন্যা, সমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ'—উপদিষ্ট হইতেছে। ব্যক্ত 'সর্ব্ব' হইতে একরস, ঘন, মধু-স্বরূপ ভগবৎ-ভাব সংগ্রহ করাই বিষ্ণু-শক্তির কার্য্য, ইহা বুঝা গেল। ঐ কার্য্য সাধিত হইতে হইলে, সর্ব্বের ভিতরে প্রসুপ্ত পরাভাব জাগ্রত হওয়া চাই। তৎপরে সেই মহাভাবের বিশেষ ভাব গুলি এবং আপন আপন বিশিষ্ট অহং-বুদ্ধি পরাভাবের সদৃশ-প্রবাহে ত্যাগ করিয়া পরিসমাপ্ত হইয়া যাওয়াই যে অবস্থার ধর্ম্ম। এই জন্যই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাব ত্যাগ করতঃ, আমাদিগের দেহে কেবল আমাদিগকেই দেখাইতে চেষ্টিত্। সাধক পাঠক, ধ্যানের সময় যে সদৃশ-প্রবাহতা উপলব্ধি করিতে পান,—যেমন বাহ্যবস্তু ও ভাবসমূহ তখন একরস হইয়া ধ্যেয়ের মূর্ত্তি গঠন করে; এবং তখন আর ভেদ থাকে না—বিলাস থাকে; মহালক্ষ্মী শক্তির 'খেলাটীও' সেই ভাবে বুঝিবে। সমাধিতে আর খেলাও থাকে, না। শৈবী-ভাবে দেবী চৈতন্যময়ী 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' ভাবে 'ব্রাহ্মী' প্রভৃতি বিলাস-সমূহকে বিভূতি বা 'ভস্ম' করিয়া আপনাতে ন্যাস করেন। ইহাই বৈষ্ণবী ও শৈবী ভাবের পার্থক্য। ধ্যানে বৈষ্ণবী, সমাধিতে শৈবী;—এই দুইটী কথা স্মরণ রাখিলে দেবী-মাহাত্ম্য বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

ভেদাত্মক জীব এই সদৃশ প্রবাহতা-স্বরূপা চৈতন্যময়ীর দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া মনে করে যে, এই সংযোগিনী শক্তির কেন্দ্রই বুঝি তা'র বিশিষ্ট 'আমি'-কেন্দ্র। ইহাই কামের বন্ধন শক্তি;—অহঙ্কারের বা শুম্ভের আত্মজ মহিষাসুরের ভাব। দৈবী ভাবের সহিত এই আসুরিক ভাবের যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিয়া দেখ। 'দিব্' অর্থে প্রকাশ, ব্যঞ্জনা ও 'আড়-নয়নের ইঙ্গিত'। এই দেবময়ী চৈতন্য যখন খেলেন, তখন আমরা ভাবুক প্রেমিকের ন্যায় বা ভাবময়ী রাধার ন্যায় দেখিয়া ফেলি যে—

জলে স্থলে, রূপ উছলে, অতিক্রমি বিশেষের ভান।
সমরূপে যায় মিশি, অনন্ত 'বহুর' রাশি, একবোধে সান্ত হয় 'প্রাণ' ॥

'অসু' অর্থ প্রাণ। প্রাণনের ধর্ম্মই,—স্পন্দন। বিশেষ আধার লইয়াই স্পন্দন। সে জন্যই যতক্ষণ আমরা প্রাণে অবস্থিত থাকি, ততক্ষণই বাহ্য ভাবের আবশ্যকতা দেখা যায়। প্রবাসী প্রেমিক যখন প্রিয়তমার প্রতি অভিনিবিষ্ট-চিত্তে 'সুখরূপ' বোধে লীন হইয়া যান, তখন প্রেমের প্রাণন ভাবরাশি,—আলিঙ্গন ও অঙ্গ সঙ্গের প্রযত্ন, আর থাকে না। ইহাই 'প্রাণ' ও 'দেব' ভাবের প্রভেদ। অসুরেরা মহাভাবে ভাবিত হইয়াও বোধরূপে বিশিষ্ট আমিকে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ক্রিয়া চাই, স্পন্দন চাই, বাহ্য বিকাশ চাই; অথবা ভেদভাবেও চাই। ভাবরূপী ভগবান বহিলেন, "ময়ি ইদং সর্ব্বং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব," এবং দৈবী ভাবের সাধক তাহার হৃদয়ে সর্ব্ব-প্রবিলাপনকারী এক মহান্ সত্বার আভাস পান। উহা ঘন ও এক ; উহাতে বিলাস আছে, বাহ্য স্পন্দন নাই ; বোধ আছে, প্রাণ নাই। ঐ ভাবে সূর্য্যকে দেখিলে সবিতাভাব কেয়ুর কুণ্ডলবাস শ্রীনারায়ণে পরিসমাপ্ত হইয়া যায় ; অগ্নিকে দেখিল উহা মহাদেবের তৃতীয় বা জ্ঞান-নেত্রের ঈঙ্গিত করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যায়, ভিন্ন থাকে না ; চন্দ্রকে দেখিলে উহা অমৃতে ডুবিয়া যায়। যেমন প্রিয়তমা প্রণয়িণীর সর্ব্ব অঙ্গের স্পর্শই ভাবুক প্রেমিকের নিকট মহাপ্রেম-ভাবে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ইহাই মহালক্ষ্মী দেবীর বিকাশ। মহিষাসুর বা বিশিষ্ট অবয়বী-বুদ্ধি সর্ব্বকে এরূপ ভাবে দেখে না। সে সূর্য্য, ইন্দু, অগ্নি, অনিল প্রভৃতি দেবগণের অধিকার বা বাহ্যভাবের ক্রিয়া ধর্ম্মটী স্বয়ং কবলিত করিয়াই সন্তুষ্ট। ইন্দ্রাদি দেবগণের ভগবৎরূপে পরিসমাপ্তি ও তাহাদের সমগ্র কর্ম্ম পরা-জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিতে পারে না। "সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" এ বোধ তাহার নাই। সে ঘন একত্বকে বড় ভয় করে এবং দেবতা সমূহকে ও আপনাকে ঘন এক রূপে মিশিতে দেয় না! মানব যেমন অশ্বাদির স্বাতন্ত্র্য-ভাব 'গায়ের জোরে' স্ববশে আনিয়া আপনার বাহ্য কর্ম্ম সাধন করে, মহিষাসুরও তদ্রূপ দেবতাদিগকে স্ববশে আনয়ন করতঃ তাহাদিগকে তাহার 'আমির' দাসত্বে পরিচালিত করিয়া সন্তুষ্ট হয়। কারণ প্রাণনই তাহার স্বধর্ম্ম ; তাহার যে স্পন্দন চাই ; তরঙ্গায়িত বহুর খেলা চাই ; সে 'আমার' (মমেদং) ভাবে বহুগুলিকে বশ করিয়াই তৃপ্ত, সে গুলিকে 'আমি' হইতে দেয় না। কারণ তাহা হইলে যে আর তা'র খেলা থাকিবে না ;

ভাই সাধক ! তোমার ভিতরে একবার মহিষাসুরকে দেখিয়া লও। এই তত্ত্বের

বশে শ্রীমতি এ্যানি-বেশান্ত ও তাহার সঙ্ঘ নূতন অবতার লইয়া এত ব্যস্ত। বাপুহে! 'অবতার আসিবে সে, উত্তম কথা; ভগবান ত' আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত। তবে তিনি ভগবান; তিনি আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্টান করিয়াই আপনি জন্ম গ্রহণ করেন। "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"। তদীয় প্রকাশে রাম শ্যাম প্রভৃতির সমষ্টিও ব্যষ্টিভাবে কোনও 'হাত' নাই; কারণ তিনি স্বপ্রকাশ।" কিন্তু এই পরম ভাব বুঝিতে না পারিয়া 'পরম ভাবমজানন্ত মম ভূতমহেশ্বরং।" রাম শ্যাম মনে করে বুঝি ভগবানের প্রকাশ বিষয়ে আমাদের চেষ্টায় কৃষ্ণমূর্ত্তিকে উপাধি ভাবে প্রস্তুত না করিলে, তিনি প্রকট হইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ হইতে গেলে, বিশেষগুলি denominator বা 'বাচক' হইয়া যাওয়া চাই; জীব আপনাকে তৃণাদপি সুনীচ করিয়া ফেলা চাই। কিন্তু অবয়বী ভাবের এমনই প্রবল মোহ যে, রাম শ্রীভগবানের বিলাসক্ষেত্রেও স্বকীয় বিশিষ্ট অধিকারী ও কম্ম রাখিবার নিমিত্ত প্রযত্ন-পরায়ণ হয়, ও অভিসন্ধি-পূর্ণ কুটীল লোকের ক্রীড়নক-রূপে আপনাকে বিক্রীত করে। ভক্তগণকে চুপি চুপি বলিয়া দেওয়া হইল, 'দেখ রাম, এই অবতারে, তুমি অবতারীর শিক্ষক হইবে; "দেখ শ্যাম, তুমি প্রধান সেনানী হইবে"; "দেখ কিশোরী। তুমি ইহার পৌরিহিত্য ব্যাপারে সহায়তা করিবে," অমনি সকলেই সেই অধিকারের মোহে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহারা ভুলিয়া গেল যে, শ্রীভগবানের প্রকাশ চক্ষুর ভিতর দিয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করে, মনের ভিতর দিয়া স্বকীয় ভাব-প্রকাশ করে বটে; সে চক্ষু ও সে মনে আর স্ব স্ব অধিকার-বুদ্ধি থাকে না। যদি থাকে ত' সেই চক্ষু ও মন শ্রীভগবানে পঁহুছিতে ও তাঁহার অবয়ব নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না।

যন্মনসা নমনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদম যদিদমুপাসতে॥ কেনোপনিষৎ।

এই মহিষাসুরের অবয়বী-মোহের বশে, বৈষ্ণব ভায়া স্বরূপা-শক্তির মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারূপে আপনাকে না মিশাইয়া, শ্রীযুগলের লীলাবিলাসের নিমিত্ত না হইয়া, নিজেই রাধা-সাজে সাজিয়া ভগবানকে পায়ে ধরাইতে চাহেন। একবারে নিষ্ক্রিয় হইতে বড় ভয় হয়, একেবারে শ্রীভগবানের নিমিত্ত-মাত্র হইতে বড় আতঙ্ক হয়; তা'ই শাক্ত ভ্রাতারাও আপনাকে 'শবরূপে' সিদ্ধ না করিয়া, চণ্ডাল-পুত্রের দেহটি লইয়া শব সাধন করিতে ব্যাকুল হয়েন। তাহাকে ভুলিয়া যান যে মহামায়া কেবল মহেশ্বরেরই অনুগতা ও তাঁহারই লীলাবিলাস দেখাইবার জন্য

থেলেন। তোমার আমার ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বড় একটা ধার ধারেন না। নিজে শব না হইয়া,অহঙ্কার রাখিয়া শব-সাধন করিতে গেলে, বাহ্য দানবায় শক্তির উৎপাতে ভ্রান্ত সাধক মনে করে 'আমি বড় বীর, এ সকল বিভীষিকা অনায়াসে বিধ্বস্ত করতঃ বৈষ্ণবী-শক্তিকে বশে আনয়ন করিতেপারিয়াছি।" আর অধিক কি বলিব, অবয়বী ভাবে আপনাকে রাখিবার মোহে সেই মহামিলন-লগ্নে ভগবান যীশুদেবও আতঙ্কে চমকিত হইয়া নাকি বলিয়াছিলেন,—"Father ! Father ! hast thou for saken me" 'পিতঃ ! ভগবন্, তুমি কি আমায় ত্যাগ করিলে!' ইহাই পূর্ব্বোক্ত Life in form সে অবয়বী-বুদ্ধি মোহ বা মহিষাসুর তত্ত্ব। পরে যখন তিনি ভগবৎ প্রেমে অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন নাকি বলিয়াছিলেন,—'Father ! how thou glorifiest me' পিতঃ! আমার এই 'আমি'টাকে তুমি আজ কি পরিপূর্ণ—ভরপূর করিয়া! ইহাতে যে আর অবকাশ বা ছেদ নাই !!!

সর্ব্বঘটে ভগবানই একমাত্র স্বপ্রকাশমান, কাজে কাজেই বিশিষ্ট ঘট সংরক্ষণের ত' কোনও আবশ্যকতা নাই। যখন বাস্তবিকই 'কানু ভিন্ন গতি নাই',—তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ নাই, যখন 'তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশিত হইতেছেন, তখন অবয়বী ভাবটি ধরিয়া রাখিবার এত প্রবল পিপাসা কেন ? জন্ম-জন্মান্তরে এই বিশিষ্ট 'আমির' হিসাব রাখিয়া, জন্মান্তরের স্মৃতির উদ্ধার করিয়া এত 'বগল বাজান' কেন ? একবার একটী ভেদ-বিবক্ষার বশে সহস্র রূপে কল্পিত করিয়া মত্ত হইয়াছিল ; কিন্তু যখন সে দেখিল যে তাহার পশ্চাতে 'আধার' 'গতি' ও 'সাক্ষী'রূপে সেই নিষ্কল নাম-রূপের অতীত শ্রীভগবানই আপাতঃ প্রতীয়মান 'শূন্য'রূপে তাহার অনুসঙ্গী আছেন বলিয়াই তাহার এত মান। তখনই একটী তাহার অহঙ্কার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবানকে বলিতে পারিল, "মৎপ্রাণনাথস্তু সঃ এব নাপরঃ," "তিনিই আমার প্রাণনের বা বাহ্য বিকাশের নাথ ও কর্ত্তা।"

এই মহিষাসুর-বধের দিন আজ উপস্থিত। "সর্ব্ব-স্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি ধরেহনঘে" মহাবিদ্যা আমাদের ভেদ-মোহের ভিতর দিয়া আবার প্রকাশিত হইবেন। যাহা স্বয়ং 'উছলিয়া' বা ফুটিয়া উঠে, তাহাকেই রূপ বলে। এত জীবের নহে ; এ যে শ্রীভগবানের বিলাস ! এই রূপসাগরে যদি ডুবিতে চাও, তবে তোমার বিশিষ্ট রূপের মোহ বা মহিষাসুরকে রূপময়ের মহাভাবের নিকট বলি প্রদান করিতে হইবে। তিনি যে সদা স্বপ্রকাশরূপ, সকল হইতেই সমভাবে ফুটিয়া উঠিতেছেন। আর আমাদের রূপ-মোহ বাস্তবিকই মহিষের ন্যায় বিবেক-শূন্য, অবুদ্ধি-প্রণোদিত। 'করইতে কোরে ধনি মোড়সি অঙ্গ" তাহার গায়ে হাত

দিতে গেলে,—সে শিং ঘুরাইয়া ল্যাজ উঠাইয়া মারিতে আসে। সে আপনাকে হারাইতে পারে না; অথচ তাহার সবই চাই। সে কেমন গম্ভীরভাবে কাম ভোগ করে, অথচ ভাবে সবই ভগবানের জন্য। তা'র মান চাই, যশ চাই, ধন চাই, বল চাই। সে চক্ষুর ভিতর প্রকাশিত ভগবান দেখিতে পায় না, অথচ চক্ষু-শক্তিকে Clairvoyance বা সূক্ষ্ম-দৃষ্টিরূপে নিজস্ব করিতে চাহে। "দৃশ্যস্য উপলব্ধি সা ভোগঃ।" দৃশ্য ভাবটী রাখিয়া তাহার গ্রহণ করাকে ভোগ বলে। ভোগই অবয়ব ও অবয়বী ভাব। কিন্তু যখন আর অন্য দৃশ্য থাকে না, একমাত্র শ্রীভগবানই দর্শনীয় হন, তখনই এই শক্তি শ্রীভগবানের রূপ ফুটাইয়া দেয়। ইহাই মহিষাসুরের পরিণাম। ইহাই দোললীলায় মেঢ্রাসুর বধ। ভোগেচ্ছাগুলিকে একত্র সংগ্রহ করতঃ যদি তাহাতে 'এক ভগবানই সত্য' এই জ্ঞানাগ্নি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হও, তবেই সেই অসুরের বিনাশ হইবে। 'অসু' বা 'প্রাণের' মোহ ত্যাগ করিতে পারিয়া 'বোধে' আসিতে পারিবে ও নিত্য-বোধস্বরূপকে 'আমির' ভিতরে দেখিতে পাইবে।

অবয়বী বুদ্ধির অন্তরালে শ্রীভগবানের যে ভাব আছে, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। ইহা পাতঞ্জল-ভাষ্যে ব্যাসদেবের উক্তি। এই "ধর্ম্মায় ধর্ম্মপতয়ে" শ্রীভগবানে যদি সর্ব্বের বিশিষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেই মহাযোগিনী জ্ঞানরূপা মহামায়া তোমার ভিতরে প্রকাশিত হইয়া তোমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বপ্ন-মায়ার দুর্গ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া নিজে উপরতা হইয়া তোমাকে শ্রীভগবানে মিলিত করিবেন।

যত্রেয়োপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্ম্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥ ভাগ—১।৩।৩৪।

যখন মহামায়া তোমার 'আমিটীকে' লইয়া শ্রীভগবানে উপরতা হইবেন, তখনই 'আমিটী' তদীয় মহীমায় মহীয়ান্ হইবে। অবয়বী ভাবের মোহ লইয়া আজ জগতে কি না অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, তাহা জানিয়া,—আইস সেই মহাযোগিনী মহামায়াকে স্মরণ করিয়া বলি,—

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে,
নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে।
নমস্তে চিদানন্দনন্দস্বরূপে,—
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

ওঁ নমো দুর্গায়ৈঃ; তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওম্। সম্পাদকয়োঃ।

আবাহন।

(১)

অবগাহি ঘন নীরে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করে ।
সাজিছে প্রকৃতি সতী আহ্বানিতে শারদারে ॥
প্রেম ভরে ফুলে ফুলে, নেচে নেচে তালে তালে ;
তটিনী চলেছে ধেয়ে, পীযূষ পসরা নিয়ে ;
নির্ম্মল অম্বর তলে, বিহগ বিহগী খেলে,
পঞ্চমে তুলিয়া তান, মধুরে গাহিছে গান ;
তৃণ গুল্ম তরুদল——, লাবণ্যেতে ঢল ঢল,
মৃদুল মারুতে তা'য়, মরি কি স্পন্দন হায় ;
অবগাহি ঘন নীরে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করে,—
সাজিছে প্রকৃতি সতী আহ্বানিতে শারদারে।

(২)

আয়্ মা শারদে, শুভদে, বরদে,
ব্রহ্ম-বাদিনী দেবী বরেণ্যে !
সিন্ধু-মেখলা, সুজলা শ্যামলা,
উজলি হিন্দু-ধরণী, ধন্যে !
বরষ অন্তে, নীলিম প্রান্তে,
মাতায়ে জগৎ শারদ ইন্দু।
কনক কিরণে, মা, তোর চরণে,
ঢালে অজস্র অমিয় বিন্দু।
অনাদি ওঙ্কার, ব্যোম ঝঙ্কার,
ধাইছে অনন্তে প্লাবিয়া বিশ্ব।
নব তরঙ্গে, ফুটিছে অঙ্গে,
সঙ্গীত তানে বিমল হাস্য।
অসীম বীর্য্যে, হে মহৈশ্বর্য্যে !
চমকি পৃথ্বি নভোমণ্ডল,
সিংহ-বাহিনী, আয় মা ঈশানী,
শ্রবণে দৃপ্ত মণি-কুণ্ডল।

উরে চঞ্চল, বসনাঞ্চল,
ঝলসি গগন দিক্-দিগন্ত।
দলমল গলে, মরকত দোলে,
ভাতিছে বক্ষে সূর্য্যকান্ত।
সুরভি সিন্ধু, মথিত ইন্দু,
সিন্দুর শোভে ললাট চুম্বি।
জিনি শশধর, শ্রীপদ নখর,
কণ্ঠে মুকুতা-হার বিলম্বি।
ঊর্দ্ধে রাজিছে, অম্বর মাঝে,
রত্ন মুকুট ভেদিয়া অভ্র।
মধু সমীরণ, করে বরিষণ,
পদে চম্পক শেফালী শুভ্র।
জীব কোলাহল, বাসনা প্রবল,
ক্ষণিকের লাগি থাকুক বন্ধ,
মায়া-সংসার, বৃথা অহঙ্কার
মা, তোর জ্যোতিতে রহুক অন্ধ।
বীরাঙ্গনা সাজে, নাশ, দশভুজে!
মোহান্ধ জীবের 'আমিত্ব' ম'হষ।
স্বরগ কান্তি, সোঽহং শান্তি,
পরমানন্দ পণ্য আশীষ।
দাও মা ভবানী, দে অভয় বাণী,
টুটুক বন্ধ জনম মরণ।
স্রক্ চন্দনে, হৃদি নন্দনে,
বন্দিবে তোমা নিখিল ভুবন।

———

ধর্ম্ম]

বিদ্যাবিলাস।

কৈশোরলীলা।

যিনি রামাবতারে শাস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, তিনি এই গৌরাবতারেও শাস্ত্র বিদ্যা শিখিতেছেন। উদ্দেশ্য কিন্তু সেই একই,—ধর্ম্ম সংস্থাপন। সেবার

রাক্ষসকুল নিধন করিয়া শাস্ত্র ও সাধুরক্ষা করিতে হইয়াছিল, এবার পণ্ডিত-কুলকে শোধন করিয়া সেই শাস্ত্র-রক্ষা ও সাধু-রক্ষা করিতে হইবে। গৌর-কিশোরের কৈশোর লীলায় তাহারই আয়োজন হইতেছে। পাঠক, ঐ দেখ পুঁথি হাতে করিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভু গঙ্গাদাসের টোল আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মাঝে করি বীরাসন॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুভাতি
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতিঃ॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদনমোহন।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম॥ চৈঃ ভাঃ

চারিদিকে পড়ুয়ার দল ঘিরিয়া আছে, মধ্যখানে তারকা বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গৌরচন্দ্র শোভা পাইতেছেন। নিমাইয়ের এখন আর অন্য কর্ম্ম নাই; দিবানিশি পুঁথি লইয়াই আছেন।

"রাত্রি দিন বিদ্যারসে নাহি অবসর।" চৈঃ ভাঃ

নিমাই যখন যাহা ধরেন, তাহাতেই একেবারে আবিষ্ট হইয়া পড়েন; ইহা নিমাই চরিত্রের বিশিষ্টতা। বাল্যকাল হইতে আমরা তাহাই দেখিয়া আসিতেছি। এখন বিদ্যারসেই ভরপূর হইয়া আছেন।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি নবদ্বীপে টোলের অভাব নাই—ছাত্রেরও অভাব নাই। নবদ্বীপের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে গঙ্গাদাস অদ্বিতীয় পণ্ডিত; তাই তাঁহার টোলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভিড়। বেদ-বেদান্ত ন্যায়-দর্শন যিনি যাহাই অনুশীলন করুন না কেন, প্রথমে সকলকেই ত' ব্যাকরণ পড়িতে হইবে। তাই তাঁহার টোল সব চেয়ে জমকাল। বিশেষ এই সময়ে গঙ্গাদাসের টোলে যেন নবরত্নের সভা হইয়াছিল। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, (দীধিতিকার) নৈয়ায়িক রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ, কমলাকান্ত বাচস্পতি, শ্রীমুরারি গুপ্ত, প্রভৃতি নবদ্বীপের উজ্জ্বল রত্ন সকলেই এইখানে মিলিয়াছিলেন। আমাদের শচীনন্দন নিমাই ছিলেন তাঁহাদের মধ্যমণি। নিমাই যেখানে যাইবেন, সেইখানেই প্রভু হইয়া বসিবেন। দুই দিনে তিনি টোলের ছোট বড় সব ছাত্রের দলপতি হইয়া উঠিলেন। সকলকেই তিনি পাঠ-ব্যাখ্যা করিয়া দেন, সূত্র-বৃত্তি, পঞ্জীটীকা সমস্তই নিমায়ের কণ্ঠস্থ। নিমাই যে শ্রুতিধর; একবার শুনিলেই সব শাস্ত্রই নিমাইয়ের অধিগত হয়। সুতরাং কোন শাস্ত্রে কেহ

তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। একদিন নিমাই অধ্যাপক শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের অভ্রান্ত ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। নিমাই যে সমস্ত দোষ দেখাইলেন, বৃদ্ধ গঙ্গাদাসকে তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইল। ছাত্রেরাও অবাক্। সকলেই নিমাইয়ের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরক্ষণেই নিমাই নিজকৃত ব্যাখ্যা খণ্ড খণ্ড করিয়া গুরুদেবের ব্যাখ্যাই অভ্রান্ত বলিয়া স্থাপনা করিলেন; গুরুর মর্য্যাদা রক্ষিত হইল। গঙ্গাদাস চমৎকৃত হইলেন,—টোলের সকলেই মন্ত্র-মুগ্ধ। শাস্ত্রবিদ্যা লইয়া নিমাই যেন ভোজবাজির খেলা করিতেছেন;—

'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকলই স্থাপয়॥

এরূপ অপূর্ব্ব শিষ্যের গুরু হইয়া গঙ্গাদাস আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥

বিদ্যারসে মজিলে কি হইবে; নিমাইয়ের কিন্তু সে পূর্ব্ব স্বভাব যায় নাই; বরং চঞ্চলতার সহিত দাম্ভিকতা মিশিয়া উদ্ধত নিমাই পরমোদ্ধত হইয়াছেন।

"তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে"।

নিমাইয়ের ছোট বড় জ্ঞান নাই. "সবারে চালায় প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া'। যে কেহ নিমাইয়ের অধীনতা সহজে স্বীকার না করেন, নিমাই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। মুরারি গুপ্ত নিমাইয়ের অপেক্ষা যথেষ্ট বয়সে বড়। তিনি বালক নিমাইয়ের কাছে পাঠ বুঝিয়া লয়েন না. এই অপরাধে পাঠক, ঐ দেখ আজ তাঁহার সহিত নিমাইয়ের বিষম কলহ বাঁধিয়া গিয়াছে। মুরারিকে দেখিয়া নিমাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, 'সন্ধিমাত্র জ্ঞান নাই, অথচ অহঙ্কার আছে; কাহারও কাছে পুঁথি বুঝিতে যাওয়া হইবে না"। মুরারি সে কথা কাণে লইলেন না; বালক বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। নিমাই কিন্তু ছাড়িলেন না, তিনি তখন স্পষ্টাস্পষ্টি আরম্ভ করিলেন। 'বলি ও বৈদ্যরাজ, তুমি পড়িতে এসেছ কেন; ব্যাকরণ বড় সোজা জিনিস নয়। ইহাতে বায়ু-পিত্ত-কফের বিচার নাই বা অজীর্ণের ব্যবস্থা নাই; তোমায় এ বুদ্ধি কে দিয়াছে? তুমি হাতুড়ে কবিরাজ; বরং বাড়ী যাও, লতা পাতা নিয়ে গিয়ে জাত-ব্যবসা করগে।"

"প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড়॥" চৈঃ ভাঃ

একদিন এই নিমাইয়ের হাতে মুরারির উত্তম শিক্ষা হইয়াছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ বুঝিয়া মুরারি এই নিমায়ের পদতলে লুঠাইয়াছিলেন; কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তাহাতে এখন নিমাইয়ের প্রাকৃত বালক-সুলভ চপলতা ও ধৃষ্টতা দেখিয়া মুরারির সে ধারণা উল্‌টিয়া গিয়াছে। প্রচ্ছন্ন প্রভু, তা'ই আজ কৌশলে ভৃত্যকে আবার চম্‌কাইতেছেন। বামুনের ছেলে বলিয়া মুরারি অনেক খাতির করিয়াছেন, অনেক ব্যঙ্গোক্তি, সহিয়াছেন; কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে, আর চুপ্‌ করিয়া থাকা পোষাইল না, মুরারি মুখ ধরিলেন।

"কেন হে ঠাকুর! এত গর্ব্ব কিসের? কোন্ দিন্ আমায় কি জিজ্ঞাসা করেছ যে উত্তর পাও নি।

তখন কলহ বেশ আঁটিয়া গেল। বিদ্যারস লইয়া প্রভু ভৃত্যে উত্তম ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল।

"গুপ্ত বলে এক অর্থ, প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার॥" চৈঃ ভাঃ

বিস্তর বাদ-বিতণ্ডা চলিল, উভয়ের বিচার শক্তিতে উভয়েই স্তম্ভিত। নিমাই খুশী হইয়া মুরারির পিঠে রহস্যে এক চড় মারিলেন, "তাই ত' বৈদ্য ত' কেবল বৈদ্য নহে, পণ্ডিতও বটে। মুরারি চমকিত হইলেন; হস্তস্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ-প্রবাহ ছুটিল।

"এমন পাণ্ডিত্য কভু মনুষ্যের নয়।
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরমানন্দময়॥"

নিমাই পণ্ডিতের অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া মুরারি গুপ্ত পরম বিস্মিত হইলেন; নিমাই ত' পড়েন ব্যাকরণ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি! এরূপ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি নবদ্বীপে আর নাই; সুতরাং ইহাঁকে গুরু স্বীকার করিতে কোন লজ্জা নাই। বলিলেন—"চিন্তিব তোমায় স্থানে শুন বিশ্বম্ভর।" প্রভু ভৃত্যের আপোষ হইয়া গেল।

নবদ্বীপের অধ্যাপক ও নিমাই পণ্ডিত।

তখনকার বিদ্যা-মদগর্বিত নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের সহিত রাজা-মহারাজারও তুলনা হয় না। তাঁহারা দম্ভের মূর্ত্তিমন্ত অবতার; 'ধরা সরা জ্ঞান' করেন। ভগবানের সহিতও কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা, তাঁহারা আদৌ প্রয়োজন মনে করেন না। ভগবদ্ভক্ত পাইলে তাঁহাদের আমোদ বাড়িয়া যায়; হিংসাবৃত্তি পূর্ণমাত্রায়

জাগিয়া উঠে; নির্ম্মমভাবে ভক্তপ্রাণে আঘাত করিতেই তাঁহাদের আনন্দ। পড়ুয়াদলের হাতে পড়া, আর ডাকাইতের হাতে পড়া একই কথা। সাধু বৈষ্ণব দেখিলেই তাহারা তাড়াইয়া ধরে এবং তাঁহাদিগকে নানা প্রকার নির্য্যাতন করে।

"দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে।
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে কত মত কটু ভাষে॥

সেই অমিত বিক্রম পণ্ডিতগণের এখন বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহাদের দম্ভস্ফীত উদ্ধশির অবনত হইয়া পড়িয়াছে। অপ্রতিহত গর্ব্ব বুঝি আর বজায় থাকে না। গ্রহ বিপর্য্যয় হইয়াছে; তাই তাঁহাদের ঘরের মধ্যেই ভীষণ শত্রু উদয় হইয়াছে। মিশ্র-নন্দন নিমাই নিজে পণ্ডিত হইয়া, পণ্ডিতকুলের 'মূষল' হইয়া উঠিয়াছেন। পণ্ডিতদের সমগ্র ভারতব্যাপী মান-মর্য্যাদা আর থাকিল না, নিমাই হ'তে সবই নষ্ট হইবার পথে উঠিয়াছে।

ভাগ্যবান্ মুকুন্দ সঞ্জয়ের সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই টোল খুলিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্যের সৌরভ দেশ-দেশান্তে ছুটিয়াছে। চারিদিক হইতে অগণন ছাত্র আসিয়া জুটিয়াছে।

"কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায় করে নমস্কার॥" চৈঃ ভাঃ

নবদ্বীপের গর্ব্ব-স্ফীত অধ্যাপকের উদ্ধশির এতদিন কাহারও নিকট অবনমিত হয় নাই। নিমাই অধ্যাপক হইয়াই সেই গর্ব্ব চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আটোপটঙ্কারে পণ্ডিত মহলে বিষম 'চৈ চৈ' পড়িয়া গেল। তিনি সগর্ব্বে বলিতেছেন,—

"প্রভুবলে তাঁ'রে আমি বলি যে পণ্ডিত।
একবার বিচার করে আমার সহিত॥" চৈঃ ভাঃ

প্রথমে বালক বলিয়া অনেকেই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু টিট্‌কারির মাত্রা ক্রমে খুব বাড়িল। তার্কিক পণ্ডিতদের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। একে একে অনেকেই গাত্র-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির জন্য নিমাইয়ের সঙ্গে লড়িতে আসিলেন। প্রাণপণে বুঝিলেন; কিন্তু কেহই বালককে আঁটিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের হাতে যেন শাস্ত্র-বিচারের মরণ-কাঠি জীবন-কাঠি রহিয়াছে। নিমাই কখন

'রামকে' খণ্ডন করিয়া 'শ্যাম' করিতেছেন; আবার অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে 'শ্যামকে' খণ্ডন করিয়া 'রাম'কে স্থাপন করিতেছেন। অথচ নিমাইয়ের সকল বিচারই অকাট্য, অভ্রান্ত, এবং শাস্ত্র-সম্মত।

"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা॥" চৈঃ ভাঃ

বালকের কাছে হারিয়া মাথা হেট করিয়া মর্ম্মাহত পণ্ডিতেরা সরিয়া পড়েন।

যত অধ্যাপক প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোনজন নাহি ধরে॥ চৈঃ ভাঃ   (ক্রমশঃ)

শ্রীবামাচরণ বসু।

ধর্ম্ম]   যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী সংবাদ।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)।

লোক-হিতৈষিনী শ্রুতি চিরদিনই আত্মার অস্তিত্ব ও একত্ব বুঝাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু মানব চিরদিনই ঐ তত্ব নিদ্ধারণে অক্ষম হইয়াছে। এমন কি সমস্ত উপনিষদ্ যুক্তিদ্বারা আত্ম-তত্বটিকে দৃঢ় সংস্থাপিত করিবার জন্য সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। আখ্যায়িকা গুলি সত্য। ইহার গুণ এই যে, ঝটিতি শ্রোতা ও পাঠকবৃন্দের মন আকৃষ্ট করে। পর-পক্ষকে বুদ্ধিবলে কোনমতে নিরস্ত করাই, তর্কের উদ্দেশ্য নহে। তর্ক—বিচার? অসার বিচারের নাম বিতণ্ডা। বিতণ্ডা, জল্প ও বাদ ত্রিবিধ তর্কের মধ্যে বিতণ্ডা নিকৃষ্ট; বাদ উৎকৃষ্ট। পরপক্ষ খণ্ডনই যাহার উদ্দেশ্য, স্বপক্ষ স্থাপন যাহার উদ্দেশ্য নহে, তাহাই বিতণ্ডা! "বাদ প্রবদতামহং" স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন 'বাদে' আছে; কিন্তু বাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্য-নির্ণয়; সত্য নির্ণয়ার্থই বাদে পরপক্ষ খণ্ডন ব্যবস্থিত।

গুরু-শিষ্য বা ছাত্রগণের পরস্পরের মধ্যে, সত্য-নির্ণয়ার্থ যে শাস্ত্রানুযায়ী বিচার, তাহারই নাম বাদ। কথোপকথন রূপ বাদ তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, তজ্জন্যই উপনিষদে আখ্যায়িকার বাহুল্য। আখ্যায়িকা গুলির মধ্যে তত্বগুলি বেশ সরল ও মনোরম ভাবে গ্রথিত থাকে। এক্ষণে বিতণ্ডাত্মক বিচার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; কারণ লিখিত-বিচারে বিতণ্ডার আধিপত্য অল্প। এখনও বাঙ্গালার নৈয়ায়িকগণের মধ্যে বিতণ্ডার তাণ্ডব নৃত্য দেখা যায়। পূর্ব্ব বঙ্গের

অনেক স্থলে বিবাদ মাত্রকেই ন্যায় হইতেছে বলা হয়। বৌদ্ধ চার্ব্বাকগণকে নিরস্ত করার জন্য সময়ে সময়ে বিতণ্ডার সার্থকতাও হইত।

একদিন বিদেহ-রাজ জনক বহু-দক্ষিণক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ একটি প্রাচীনকালের একধারে ধর্ম্ম-কার্য্য ও উৎসব। যজ্ঞে পরমেশ্বর ও দেবতাগণের তৃপ্ত্যর্থ হোম হইত, পূজা হইত, বৈদিক স্তবাদি পঠিতও হইত। এই যজ্ঞেও সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সমস্ত দেশের জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী ও পণ্ডিতগণের সমবায়ে যজ্ঞসভা অপূর্ব্ব শোভাময় হইয়া উঠিয়াছিল। এই জনক রাজই যে সীতার পিতা ছিলেন, তাহা নহে। জনক বংশীয় মিথিলার রাজার নামই ছিল জনক। অবশ্য ইনিও রাজর্ষি ছিলেন। সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'কে ব্রহ্মিষ্ঠ,' রাজা জনক এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলেন। ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কহিলেন;—"সমবেত ব্রাহ্মণ মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি আমার এই সহস্র গোধনের অধিকারী। অতএব আপনাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি এই পয়স্বিনীগুলিকে স্বচ্ছন্দে স্বগৃহে লইয়া যাইতে পারেন।"

কোন ব্রাহ্মণই আপনাকে ব্রহ্মিষ্ঠ মনে করিতে সক্ষম হইলেন না; কেহই সেই স্পৃহনীয় সহস্র গোধন লইবার চেষ্টা করিলেন না। তখন * যাজ্ঞবল্ক্য আপনার ব্রহ্মচারী ছাত্রকে আজ্ঞা করিলেন; "হে সৌম্য,! হে সামবেদাধ্যায়ী শিষ্য, এই গো সকলকে আমার গৃহে লইয়া যাও" গুরু আজ্ঞা পাইয়া ভক্ত শিষ্য গো সকলকে আচার্য্য গৃহে লইয়া যাইতে উদ্যুক্ত হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটি অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল; ক্ষমায় রুদ্ধ ব্রহ্মণ্য-তেজ গুমরিয়া গুমরিয়া জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। সকল ব্রাহ্মণেরই মনোভাব এই যে, "সকলেই সমান; যাজ্ঞবল্ক্য কেন আপনাকে ব্রহ্মিষ্ঠ মনে করিলেন?"

জনক রাজের হোতা, রাজ সম্মান-গর্ব্বিত "অশ্বলের" প্রাণে যাজ্ঞবল্ক্যের সে প্রাধান্য সহ্য হইল না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে তিরস্কার সূচক বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য, কথং ত্বং খলু ব্রহ্মিষ্ঠোঽসি।"

ঔদ্ধত্য ব্রাহ্মণের ত' লক্ষণ নহে; নিরভিমানিতাই তপস্বীর ধর্ম্ম। যাজ্ঞবল্ক্য ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "আমি ব্রহ্মিষ্ঠগণকে নমস্কার করি। গোধন আমার প্রিয়; তা'ই আমি এই গোসকল লইতে মনস্থ করিয়াছি"।

---

* "যাজ্ঞবল্ক্য" ও মৈত্রেয়ীতত্ত্ব" গ্রন্থকার প্রণীত "অবকাশ" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

তার পর হোতা "অশ্বলকে' প্রশ্ন করিলেন, জনকও তাহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। * "অশ্বল" নিরস্ত হইয়া মৌন হইয়া রহিলেন। তারপর প্রশ্ন করিলেন "জারৎকারের আর্ত্তভাগ"; যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট ও পরাজিত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। অনন্তর "কহোল কৌষীতকেয়" জিজ্ঞাসু হইলেন; তিনিও প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী গার্গী দণ্ডায়মানা হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। তর্ক ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে চলিল! অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য অকস্মাৎ গার্গীকে কহিলেন—"চুপ কর গার্গি, আর জিজ্ঞাসা করিও না। "ব্রহ্মলোক কাহাতে ওতঃপ্রোত" এ জিজ্ঞাসা আর করিও না। পুনরায় যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তোমার মস্তক-পাত হইবে!" বাচক্নবী গার্গী ভয়ে আর কথা না কহিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তাহার পর 'উদ্দালক আরুণি'ও যখন পরাজিত ও হতমান হইয়া গেলেন,—তখন যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠতা বিঘোষিত হইবার উপক্রম করিল। তখন বাচক্নবী গার্গী পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে অভিলাষিনী হইয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের অনুমতি চাহিলেন;—"ব্রাহ্মণগণ, আমি মস্তকপাত ভয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে মৌন হইয়াছি। আপনাদের অনুমতি পাইলে পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন করিব। এই প্রশ্ন দুইটির সন্তোষজনক উত্তর পাইলে, আমি তাঁহাকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিব; ইঁহার শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত হইবে।" ব্রাহ্মণগণ অনুমতি দিলে বাচক্নবী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—

"মহাবীর কাশ্য বা বৈদেহ যেরূপ 'অবতারিকজ্যাক' শরাসনে শত্রু পীড়াকর দুইটী বাণ-যুক্ত শর যোজনা করেন, আমিও তদ্রূপ দুইটী প্রশ্ন লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি। যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নদ্বয়ের সমাধান করিয়া আত্মরক্ষা করুন"।

ব্রাহ্মণগণ মহোল্লাসে গার্গীকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠতা খণ্ডিত হয়, তাহাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল।

গার্গী তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা স্বর্গের উর্দ্ধে, পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত, অথবা যাহার মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য বিদ্যমান, যাহা অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে স্থিতিশীল, তাহা কাহাতে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান।" ১ম প্রশ্ন।

---

* যাজ্ঞবল্ক্য সহ ব্রাহ্মণগণের প্রশ্নোত্তর বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য নহে।

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলিলেন,—"গার্গী, তুমি সূত্রাত্মক জগতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এই সূত্রাত্মক, নামরূপে প্রকাশিত, ব্যাকৃত, বিশ্ব-প্রপঞ্চ—নাম রূপহীন সূক্ষ্ম আকাশে ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত, জানিও। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই নামরূপ বিশিষ্ট, ব্যাকৃত দ্বৈত-প্রপঞ্চ, এই স্থূল মায়াময় পার্থিব পদার্থ অব্যাকৃত সূক্ষ্ম আকাশে কি অতীত, কি ভবিষ্যতে বিদ্যমান জানিও! "আকশে তদোতঃপ্রোতঞ্চেতি"। ১ম প্রশ্নের উত্তর।

তখন গার্গী বলিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার! আমার একটি প্রশ্নের আশাতীত উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছেন। একটি শর ব্যর্থ হইয়াছে, এইবার দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করিতেছি; আপনি সাবধান হউন!" দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল;—"এই ব্যাকৃত-বিশ্ব অব্যাকৃত-আকাশে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান; কিন্তু আবার এই অব্যাকৃত আকাশ (নামরূপ-হীন সূক্ষ্ম বিশ্ব) আর এই ব্যাকৃত নামরূপাত্মক বিশ্ব (স্থূল ব্রহ্মাণ্ড) কাহাতে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান?" ২য় প্রশ্ন।

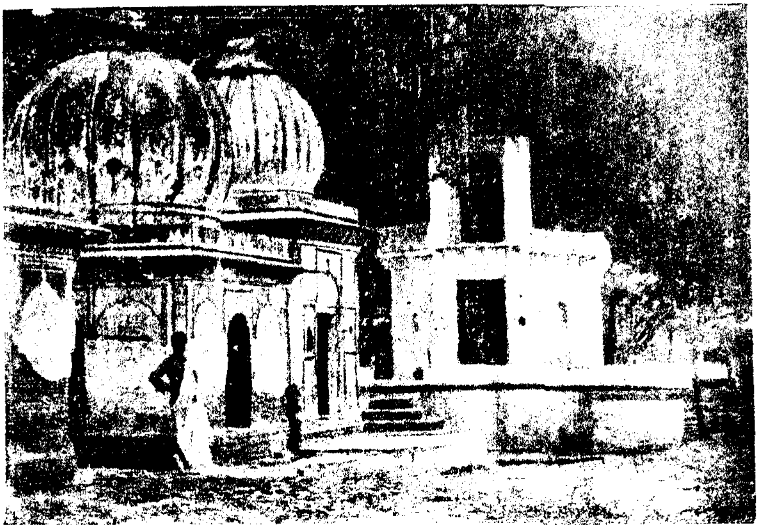
তখন যাজ্ঞবল্ক্য দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"অস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতঃপ্রোতশ্চেতিঃ" 'এই অক্ষরে বা পরম-ব্রহ্মে' অব্যাকৃত আকাশ ওতঃ-প্রোত-ভাবে বর্ত্তমান জানিও! যাহা প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হইয়াও স্বরূপতঃ পরোক্ষ, যাহা সর্ব্ববিধ গতির পরাকাষ্ঠা, যাহা সর্ব্বান্তর, সর্ব্বভূতস্থ, অশনায়াদি ধর্ম্মবিহীন, সেই নিত্য, অক্ষর, পরম-ব্রহ্মে—এই ব্যাকৃত বিশ্ব ও এই অব্যাকৃত আকাশ ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত। নামরূপ-বিশিষ্ট স্থূলের পরিণতি সূক্ষ্ম নামরূপ-হীন অব্যাকৃত তত্ত্বে; আর এই অব্যাকৃত তত্ত্বও একমাত্র পরমাত্মায় বর্ত্তমান। তিলে তৈলের মত, মণিগণে সূত্রের মত বিদ্যমান! আকাশে গন্ধর্ব্ব নগরতুল্য, শূন্যে ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া সদৃশ, মরীচিকার মরুভূমিবৎ বর্ত্তমান।

"এই অক্ষর স্থূল বা অণু নহে, দীর্ঘ বা হ্রস্ব নহে। ইহা গুণহীন স্নেহহীন। ইহা অস্থায় অতমঃ। ইহা বায়ু নহে, আকাশ নহে। রস গন্ধ, চক্ষু শ্রোত্র, বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, অন্ন—এ সকল কিছুই নহে। ইহার ছিদ্র, বাহ্য নাই। ইনি কিছুই ভোগ করেন না। বাহ্য বস্তু ইহার ভোগ্য নহে। মোট কথা গার্গী, ইহাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না।

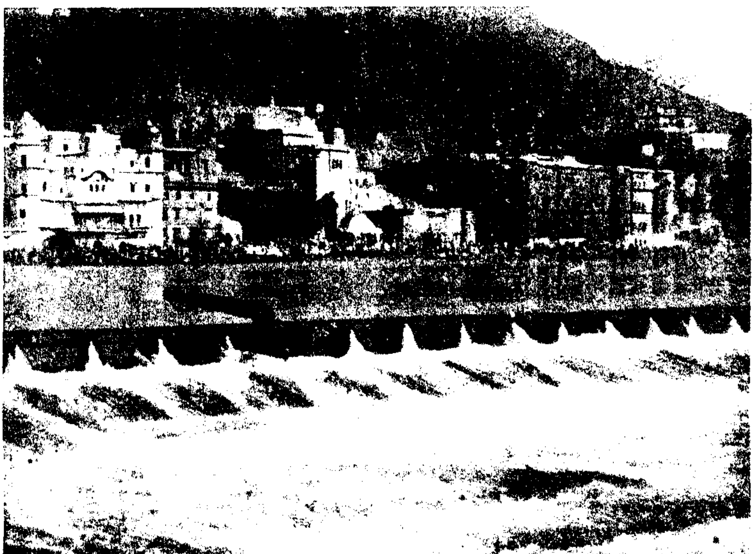
"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমলোহিতমস্নেহমস্থায়মতমঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক।

অহোরাত্রের প্রদীপস্থানীয় সূর্য্য চন্দ্র এই অক্ষরের প্রশাসনে অবস্থিত; ইঁহার প্রশাসনে স্বর্গ, মর্ত্ত্য বিধৃত; ইঁহারই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র,

পৃষ্ঠা—



[illegible]



হরিদ্বার দৃশ্য (২) ক্যানেল ও হরিদ্বার।